আনিসুল আরওয়া
রূহের বন্ধু
খাঁজা গরীব নওয়াজ
শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশতী
রহমতুল্লাহু আলায়হে

আনিসুল আরওয়াহ

[রুহের বন্ধু]

রচনায়

কুতুবুল মাশায়েখ

হযরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশতী সনজরী (রহঃ)

দলিলুল আরেফীন

[পুণ্যবানদের সনদ]

রচনায়

কুতুবুল ইসলাম

হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকী (রহঃ)

ফাওয়ায়েদুস সালেকীন

[ঐশীজ্ঞানীদের উপক্রিয়া]

রচনায়

বুরহানুল আশেকীন

হযরত খাঁজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রহঃ)

প্রকাশনায়ঃ মুহম্মদ আফতাব হোসেন চিশ্‌তী
মুহম্মদ শামসুল হক চিশ্‌তী
মুহম্মদ ফরিদ আনছারী
মুহম্মদ জয়নুল ইসলাম (বাবুল)
দারগাহে চিশ্‌তীয়া
৫১/এ, খিলগাও হাজীপাড়া, ঢাকা

প্রথম সংস্করণঃ ১লা রজব, ১৪০১
বৈশাখ, ১৩৮৮
এপ্রিল, ১৯৮১

প্রাপ্তিস্থানঃ বাংলা মিল ষ্টোর
২২৬, নওয়াবপুর রোড ঢাকা-১
হুয়াইট ট্রেডার্স
২১৫, মিটফোর্ড রোড
ডাঃ মুজিবুল হক মার্কেট, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ : আলোক চিত্রে—বশির আহ্‌মেদ চিশ্‌তী
অঙ্কনে—এনায়েত হোসেন

মুদ্রনে : বেলায়েত হোসেন চৌধুরী
জাকির আর্ট প্রেস
৪৮, জিন্দাবাহার, ১ম লেন, ঢাকা-১

হাদিয়া : একুশ টাকা

ANISUL ARWAH : [Friend of Soul]
by Hazrat Khawja Mainuddin Chisty (R.A)

DALILUL AREFEEN : [A Deed of Blessesd Persons]
by Hazrat Khawja Kutubuddin Baktiar Kaki(R.A)

FAWAEDUS SALEKEEN : [Need of Divine Philosopby]
by Hazrat Khawja Scheikh Fariduddin Ganjeshakr (R.A)

Price : Tk. 21/-

আনিসুল আরওয়াহ্

[রুহের বন্ধু]

কুতুবুল মাশায়েখ

হযরত খাঁজা শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী

রহমতুল্লাহ্ আলায়হে

অনুবাদক

কফিলউদ্দিন আহ্‌মেদ চিশ্‌তী

বারগাহে চিশ্‌তীয়া

হযরত খাঁজা বাবার ৭৬৮তম উরস উদযাপণ উপলক্ষে প্রকাশিত

আল্লাহতায়ালার বন্ধুদের শানে

কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের কয়েকটি বাণী

ফাস্‌আলুআ আহ্‌লাজ্‌ জেকরে ইনকুন্‌তুম লা তা'মালুন।

অর্থ—আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, তোমরা যা না জান, জেকেরকারিগণকে জিজ্ঞেস কর।

ইন্নানি আনাল্লাহু লা-ই-লাহা ইল্লা আনা ফাবুদ্‌নি ওয়া আকিমুস্‌ সালাতা লে জেকরি।

সূরা তাহা—১৪

অর্থ—আমিই আল্লাহ্‌ আমা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার জেকেরের জন্য সালাত কায়েম কর।

আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ্‌ লা খাওফুন আলায়হিম ওয়ালাহুম লা ইয়াহ জানুন।

সূরা ইউনুস—৬২ আয়াত।

অর্থ—সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওলীদের (বন্ধুদের) কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন দুঃখ ভাবনা নেই।

ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা ইয়ামুতুন বাল ইয়ানতাকিলু মিন দারুল ফানা ইলা দারুল বাকা। —আল্‌ হাদীস

অর্থ—নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হন ধ্বংসশীল ইহ জগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে।

আল্‌ আউলিয়া ও রায়হানুল্লাহ—(আল্‌ হাদীস) অর্থ—আউলিয়াগণ আল্লাহর সুবাস।

কারামাতুল আউলিয়াউন হাক্কুন—(আল্‌ হাদীস) অর্থ—আউলিয়াদের অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।

ইন্না আউলিয়াই তাহ্‌তা কাবাই লা ইয়ারিফুহুম গায়রী ইল্লা আউলিয়াই

—হাদীসে কুদ্‌সী।

অর্থ—নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন, আমি ভিন্ন তাঁদের পরিচিত সম্বন্ধে কেহই অবহিত নহে, আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত।

কুলুবুল ইন্‌সানে বাইতুর রহমান ওয়া কুলুবুল মুমেনিনা আরশুল্লাহ—আল্‌ হাদীস

অর্থ—মানুষের হৃদয় আল্লাহ্‌র ঘর এবং মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র সিংহাসন।

কুলুবুল মুমেনিনা মেরআতুল্লাহ্‌—(হাদীসে কুদ্‌সী) অর্থ—মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র দর্পণ।

পুস্তক পরিচিতি

আনিসুল আরওয়াহ্ পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ কাল ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে, আজ হতে প্রায় ৮ শত বছর পূর্বে। হযরত খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ (রহঃ) যখন তাঁর পীর ও মুর্শেদ, হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ)-এর সঙ্গে বিশ বছর অতিবাহিত করেন, তখন তাঁর মুর্শেদ তাঁর নিকট তরীকার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে তাঁকে বিশেষভাবে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। এ উপদেশের অমিয়-বাণীগুলো ২৮টি মজলিসে সমাপ্ত হয়। হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রহঃ) তাঁর মুর্শদের নির্দেশানুযায়ী প্রত্যেকটি মজলিসের উপদেশগুলো লিপিবদ্ধ করে নেন এবং পরে আনিসুল আরওয়াহ নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

পবিত্র কোরান ও হাদীসের বরাত সহ প্রতিটি মজলিসের অমিয়-বাণীগুলো শরীয়ত ও তরীকত পান্থীদের জন্য অমূল্য সম্পদ।

উৎসর্গ

"কুতুবুল মাশায়েখ
হযরত খাঁজা শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশতী সঞ্জরী
রহমতুল্লাহ আলায়হে
এর
পবিত্র করকমলে"

উপক্রমণিকা

পরম করুণাময় মহামহিম আল্লাহ্ জাল্লেশানহু-র অনন্ত ও অফুরন্ত দয়ায় এ উপমহাদেশের আউলিয়াসম্রাট কুতুবুল মাশায়েখ হযরত খাঁজা শায়খ মুঈন-উল-হক ওয়াল মিল্লাতে ওয়াশ্‌শরায়ে ওয়াদ্দীন হাসান চিশ্‌তী সন্জরী ছুম্মা আজমেরী কাদ্দাসাল্লাহ সার্‌রাহু-এর স্বরচিত আনিসুল আরওয়াহ এবং তাঁর সুযোগ্য সাজ্জাদা নশীন (তরীকার শাসন-ভার প্রাপ্ত) খলিফা শহীদুল মহব্বত হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন বকতিয়ার কাকী আউসী (রহঃ) বিরচিত দলীলুল আরেফীন ও তাঁর সুযোগ্য সাজ্জাদা নশীন খলিফা হযরত খাঁজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রহঃ) লিখিত ফাওয়ায়েদস্‌ সালেকীন-এর অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিমের বারগাহে শুক্‌রিয়ার সেজ্‌দা প্রদান করছি। সেই সাথে লাখোকুটি সালাত ও সালাম জানাই তাঁকে, যিনি সৃষ্টির উৎস, যাঁর নূরে নূরান্বিত এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যিনি না এলে মানব জীবনের পরিপূর্ণতা ঘটতো না। যাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি পেলো স্রষ্টার পরিচিতি, প্রেম ও দর্শন। শেষ প্রনতি আমার তার দরবারে, যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে ইসলামের আলো জ্বালিয়েছেন এ উপমহাদেশে ; যিনি রহমতুল্লিল আলামিনের নয়নমনি। যিনি শরীয়তের স্তম্ভ, তরীকতের নিদর্শন, মা'রেফাতের জলন্ত-শিক্ষা, হাকীকতের আয়না। যিনি সালেকের অন্তর, প্রেমিকের প্রেম, আরিফের রুহ্, ও কামেলদের পথপ্রদর্শক।

—

অনুবাদক হিসেবে আমি সম্পূর্ণ নতুন। শুধু যাঁর জাতের সাথে আমার অস্তিত্ব একাত্ম হয়ে মিশে আছে এবং যাঁরা আমার দিশারী তাঁদের অনন্ত অমূল্য তাছাউফের অমিয়বাণী বলেই একজন আশেক হিসেবে নব্য হয়েও অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ হয়েছি। এ ছাড়াও আর একটি বড় কারণ রয়েছে সেটাও উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের দেশের তরীকত পন্থীদের বেশীর ভাগই চিশ্‌তীয়া তরীকার দাবীদার, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা মুরীদ হলে আল্লাহর আদেশ নির্দেশের অনেক কিছুই নাকি মাফ হয়ে যায়। কিন্তু তারা জানেন না যে শরীয়তের বিধি বিধানগুলো হচ্ছে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উপকরণ। তাই এগুলো বাদ দিয়ে তাসাউফ পন্থী হওয়াতো দূরের কথা তাসাউফজগতে প্রবেশের অধিকার পাওয়াও সম্ভব নয়। চিশ্‌তীয়া তরীকার নিয়ম হচ্ছে শরীয়তের আরকান আহ্‌কাম পরিপূর্ণরূপে পালনের মাধ্যমেই অধিকার আসে তরীকতে প্রবেশ করার। এ না হলে সে কোন অবস্থাতেই তাসাউফের সাদ পাবে না। আমাদের মাশায়েখ (পীরগণ) জীবনের শুরু হতে শেষ দিনটি পর্যন্ত শরীয়তের বিধিবিধানে আবদ্ধ থেকেই প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করেছেন এবং কামালিয়াতের স্তর অতিক্রম করেছেন। যারা বলেন শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকিকত ভিন্ন ভিন্ন পথ, তাদের সেই ভুল ধারণাকে বদলিয়ে সঠিক ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর পথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসছে খাজেগানে চিশ্‌ত এর অমূল্য কিতাবগুলো।

আসুন আমরা সেই মহান করুণাময়ের দরবারে মোনাজাত করি তিনি যেন আমাদেরকে বিভ্রান্তি হতে মুক্তি দেন। আমিন। আমিন।।

প্রকাশকদের কথা

বর্তমানে বাজারে তাসাউফের কিতাব অঢেল রয়েছে, কিন্তু চিশতীয়া তরীকার মাশায়েখ রচিত কিতাব নেই বললেই চলে। যার জন্য চিশতীয়া তরীকার নামের ছায়ায় অনেকে তরীকা-বিরুদ্ধ বহু কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো এ ধরণের কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় দেখার। কিন্তু সেটার প্রকাশনার দায়িত্ব যে আমাদেরকেই নিতে হবে এমন ধারণা কখনও অন্তরে উঁকি মারেনি। এবার যখন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ খাজেগানে চিশ্‌তের রচিত কয়েকটা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য কিতাব ভারত হতে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে রাতদিন পরিশ্রম করে অতি অল্প সময়ে সব ক'টি কিতাব অনুবাদ করে ফেললেন। তখন কেন যানি বার বার আমার মনে হচ্ছিলো প্রকাশনার দায়িত্ব আমরা পেলে এ মহান কাজের কিছুটা অংশীদার হতে পারতাম। মহান ও সর্বজ্ঞ পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সে আশা পূর্ণ করেছেন।

বর্তমানে বাজারে কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই খরচ যে ভাবে বেড়েছে তাতে পুস্তক প্রকাশনা আমাদের মতো সৌখিন লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবু আমরা আশেকান ভাইদের বার বার অনুরোধে এ অমূল্য গ্রন্থ তিনটি একত্রে প্রকাশ করলাম।

হযরত খাঁজা গরীব নওয়াজের ৭৬৮ তম উরস মোবারক অতি সন্নিকটে কিন্তু আশেকান ভাইদের একান্ত ইচ্ছা বইটি উরস মোবারকের পূর্বেই বের করতে হবে। যার ফলে তাড়াতাড়ি করতে যেয়ে ছাপায় কিছু ভুল ভ্রান্তি রয়ে গেছে। যদি পাঠক-ভাইগণ এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করেন তাহলে পুনঃ মুদ্রনের সময়ে অবশ্যই তা সংশোধন হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত শামসিল আরেফীন খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেসু সেররুহুল আজীজ-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত আবি আন্নুর খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেসু সেররুহুল আজিজ-এর পবিত্র জাত ইল্‌মে শরিয়ত ও তরীকতের মধ্যে ১২ জন মহামানবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থেকে হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু হয়ে হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে?

শরীয়ত ও তরীকতের সিল্‌সিলা নিম্নরূপ

০। হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম
১। আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু
২। হযরত খাঁজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহ আলায়হে
৩। হযরত খাঁজা আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ রহমতুল্লাহ আলায়হে
৪। হযরত খাঁজা ফুজায়েল বিন আয়াজ রহমতুল্লাহ আলায়হে
৫। হযরত খাঁজা ইব্রাহিম বিন আদহাম রহমতুল্লাহ আলায়হে
৬। হযরত খাঁজা সৈয়দ বদরুদ্দীন রহমতুল্লাহ আলায়হে
৭। হযরত খাঁজা হুবাইরাতুল বসরী রহমতুল্লাহ আলায়হে
৮। হযরত খাঁজা মুমসাদউলভী দিনুরী রহমতুল্লাহ আলায়হে
৯। হযরত খাঁজা আবু ইসহাক মুহম্মদ চিশ্‌তী কুদ্দেসু সেররুহুল বারী
১০। হযরত খাঁজা নাসির উদ্দিন আবু ইউসুফ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহ আলায়হে
১১। হযরত খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহ আলায়হে
১২। হযরত খাঁজা হাজী শরীফ জিন্দানী রহমতুল্লাহ আলায়হে

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেস্থ সেররুহুল আজীজ খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের অদুরে হারুন নামক এক প্রখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ কোরান শরীফ মুখস্ত করে 'হাফেজে কোরান'-এর মর্যাদা অর্জন করেন। এরপর তিনি ধর্মীয় শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রতি দিন দু'বার করে কোরান খতম করতেন। 'জওহরে ফরিদী' কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি ৭০ বছর পর্যন্ত কঠিন সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে কখনও তিনি পেট ভরে আহার বা পান করেননি। তিনি রাত্রে নাম মাত্র বিশ্রাম নিতেন। সারা জীবনে কখনও তিনি দুনিয়ার ঐশ্বর্যের প্রতি লালায়িত ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, দুঃখ হয় ঐসব দরবেশদের জন্য যারা পেট ভরে আহার করেও দুনিয়ার ঐশ্বর্যকে কব্জা করে। কেননা, দুনিয়াদারীকে আল্লাহ ঘৃনার চোখে দেখেন। আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের উচিত নয় তারা আল্লাহ্‌র ঘৃনার বস্তুকে গ্রহণ করে। তিনি 'মুজিবুদ্দাওয়াত' ছিলেন, অর্থাৎ যে দোয়া তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে করতেন সেটা গৃহীত (কবুল) হতো সামার মজলিসে অর্থাৎ গানের মজলিসে গান শ্রবণ করে অঝরে কাঁদতেন। মজলিসে অন্য কাউকে কাঁদতে দেখলে তিনি চিৎকার করে কাঁদতেন। তিনি হামেশাই (প্রায়ই) রোজাব্রত পালন করতেন; একাধিক ক্রমে পাঁচ দিন রোজাব্রত (সিয়াম) পালন করার পর ইফতার করতেন অর্থাৎ ১২০ ঘন্টা অনাহারে (রোজা) থেকে তারপর তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন। এই অবস্থায় তিনি কারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে প্রাণ ত্যাগ করে ইল্লিন (মৃত্যুর পর পুণ্য আত্মাদের নিবাস) পৌঁছে যেতো। 'কাশফ ও কারামত, (অন্তর্দৃষ্টি ও অলৌকিক ক্ষমতা) তাঁর এতো তীক্ষ্ন ও অগাধ ছিলো যার বর্ণনা কোন লেখনীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি জাতে পাকে (পবিত্র) এলাহির কুদরতের অনির্বাণ প্রদীপ ছিলেন। তাঁর মধ্য হতে একই সময়ে আল্লাহ জাল্লে শানহুর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন ও অগণিত কারামত প্রকাশ হতো। তাঁর শান ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় মাপ কাঠি হচ্ছে জন্মগত ওলিয়ে কামেল, (আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বন্ধু), ওয়ারেসুল আম্বিয়া আলে রসুল (দঃ) [নবীদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী; হযরত রসূলে মকবুল (দঃ)-এর বংশধর] আউলিয়া সম্রাট, ইলমে শরিয়ত, তরিকত, মারেফাত ও হকিকতের প্রভাকর ও এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক সংখ্যক বিধর্মীদেরকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দানকারী, সদাদীপ্ত সেই পরশমনি খাঁজা গরীব-উন নওয়াজ শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সঞ্জরী কাদ্দাসাল্লাহ সাররাহু-এর মতো মহা-মানবকে যিনি স্বীয় মুরীদের মধ্যে পেয়েছেন; তাঁর অপরাপর কারামত ও মর্যাদা বর্ণনার প্রয়োজন রাখেনা।

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (রঃ) যখন মুরীদ হওয়ার জন্য হযরত খাঁজা হাজী শরীফ জিন্দানী (রঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর বাঞ্ছিত পীর মুর্শেদ হযরত খাঁজা হাজী শরীফ জিন্দানী (রহঃ)-এর কদম (পা) মোবারকে পড়ে বলতে লাগলেন ওসমানের খায়েশ (বাসনা) আপনার তরীকা (আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ) গ্রহণ করা। হযরত খাঁজা শরীফ জিন্দানী রহমতুল্লাহ আলায়হে তাঁকে অত্যাগ্রহে স্বীয় তরীকায় মুরীদ করে কুল্লাহ চাহার তর্কী চার টুকরা কাপড়ে তৈরী গোলটুপী, যাহা চিশতীয়া তরীকার পীরগণ কাউকে উপযুক্ত মনে করলে মুরীদ করার সময় প্রদান করতেন) স্বীয় হস্তে হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেস্ সেররুহুল আজীজকে (আল্লাহ তাঁর রহস্যকে পবিত্র রাখুন) মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং এরশাদ করলেন, হে ওসমান, যখন তুমি এ টুপী পরিধান করলে তখন তোমার উচিত এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করা বা সম্পাদন করা এবং এর হক আদায় করতে তোমার প্রথম কাজ হবে দুনিয়াদারী ত্যাগ করা ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হতে নিজেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয় কাজ হবে, লোভ-লালসা ও অহংকার বর্জন করা। তৃতীয় কাজ হলো, নফসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা। চতুর্থ কাজ হলো, রাতে এলাহির জেকেরে মশগুল থাকা এবং শয়ন না করা। আমাদের শ্রেষ্ঠ মাশায়েখ (পীরগণ) বলছেন, যে কুল্লাহ চাহার তর্কী পরিধান করে সে স্বীয় অন্তর-মনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে। হযরত খাঁজায়ে আলম (রাসুলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রথম এই 'কুল্লাহ চাহার তর্কী' জীব্রাইল আলায়হে ওয়াস্ সালাম আল্লাহ তায়ালার দিক থেকে প্রদান করেন এবং বলেন, আপনি এটা পরিধান করুন এবং যাকে খুশী দান করে খলিফা নিযুক্ত করুন। হযরত রসুলে মকবুল (দঃ) এ টুপী পরিধান করার পর দরিদ্রতা ও উপবাসকে (রোজা) সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ টুপী যখন হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু পরিধান করেছিলেন তিনি তখন হুজুর করিম (সাঃ) এর মতো দরিদ্রতা ও রোজাব্রত পালন করতেন। এভাবেই তরীকার বংশ পরম্পরায় এ টুপী তার হক অর্থাৎ দাবী নিয়ে আমার নিকট পৌঁছেছে এবং আমি তোমার নিকট পৌঁছালাম ; তুমিও পূর্বসুরীদের পথ অনুসরণ করবে। এরপর খাঁজা শরীফ জিন্দানী (রঃ) বললেন, হে ওসমান, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র এবাদতে রাতদিন মশগুল থাকবে, দরিদ্রতা ও উপবাস (রোজা) জীবন যাপন করবে এবং বস্তুজগৎ ও তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। হযরত খাঁজা ওসমান কুদ্দেস্ সেররুহুল আজিজ বললেন, আমি আপনার সমস্ত উপদেশ কবুল (গ্রহণ) করলাম। এরপর স্বীয় পীরের খানকা শরীফে তিন বৎসর উপস্থিত

থেকে এবাদত ও মুজাহেদায় (উপাসনা ও সাধনায়) নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হযরত খাঁজা শরীফ জিন্দানী (রহঃ) যখন তাঁর এ কঠোর রিয়াজত (সাধনা) অবলোকন করলেন তখন তাঁকে সাজ্জাদা নশীন (তরীকার শাসন ক্ষমতা দান করে) খলিফা নিযুক্ত করলেন এবং চিশ্তীয়া তরীকার পীরগণ কর্তৃক বংশ পরম্পরায় (সিল্‌সিলাহ-ব-সিলসিলাহ) প্রাপ্ত ইসমে আযম (আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম, যা আল্লাহর আউলিয়া ছাড়া জানেন না) হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ আঃ)-কে দান করলেন। সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালার কুদরতের জ্ঞান সমূহ তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। এরপর হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ)-এর অবস্থা এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো যে যখন তিনি নামাজ পড়তেন তখন অদৃশ্যলোক হতে আওয়াজ আসতো "হে ওসমান আমি তোমার নামাজ কবুল করলাম, তোমার যা কিছু চাওয়ার আছে চাও।" তিনি নামাজ শেষ করে প্রার্থনার মাধ্যমে বলতেন, "হে বারে এলাহি, আমি তোমার কাছে তোমার 'মা'রেফাত (পরিচয়ের জ্ঞান) চাই।" এ দোয়ার পর পুনরায় আওয়াজ হলো, "হে ওসমান, আমি তোমার দোয়া কবুল করে আমার মা'রেফাত দান করলাম; আরও কিছু চাওয়ার থাকলে চাও?" তখন হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ) সেজদাবনত হয়ে দোয়া চাইলেন, "ইয়া এলাহি তুমি আমাদের রসূলে মকবুল ও তোমার প্রিয় হাবীব (বন্ধু) হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়ে ওয়া সাল্লামের গোনাহগার উম্মতদেরকে ক্ষমা কর।" উত্তর এলো, "হে ওসমান তোমার দোয়ার সম্মানে ত্রিশ হাজার গোনাহগারদেরকে ক্ষমা করা হলো।" এ রকম ঘটনা খাঁজা ওসমান (রহঃ) এর জীবনে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ওয়াক্ত (সময়) নামাজে বিরামহীন ভাবে ঘটতো এবং যতদিন পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে এ দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলেন শেষ দিনের সর্বশেষ নামাজটিতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং তাঁর ৭০ বৎসর দুনিয়ার জীবনে সর্বমোট কত সংখ্যক গোনাহগার উম্মত তাঁর দোয়ার বরকতে ক্ষমা লাভ করেছে তা অবশ্যই অনুধাবন করার বিষয়।

তাঁর জীবনের ছোট্ট একটা কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা) হযরত খাঁজা গরীব-উন নওয়াজের মুখে শ্রবণ করুন। "আমার এক প্রতিবেশী পীর ভাই, তরীকার আইন কানুন মেনে চলতো না, হঠাৎ মারা গেলো। নিয়ম অনুযায়ী তাকে কাফন দাফন (ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৃতদেহকে নতুন পোষাকে আবৃত করে মাটির তলায় শায়িত করানো) করে প্রত্যেকে যে যার কাজে চলে গেলো। কিন্তু কৌতুহল বশতঃ আমি কবরের পাশেই দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। এমন সময় দু'জন ফেরেস্তা এসে কবরে অবতরণ করলো, দেখেই বুঝতে পারলাম এরা

আযাবের ফেরেস্তা (আল্লাহ প্রেরিত শাস্তি প্রদানকারী দূত)। কবরে নেমেই তারা আমার পীর ভাইকে শাস্তি প্রদানে উদ্যত হলো। এমন সময় আমার পীর ও মুর্শেদ খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেসু সেররুহুল আজীজ ফেরেস্তাদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "এ লোককে শাস্তি প্রদান করতে পারবে না, কারণ এ আমার মুরীদ।" ফেরেস্তাদ্বয় আল্লাহর বন্ধুর সম্মানার্থে চলে গেলো, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে বললো, হুজুর এ লোক আপনার মুরীদ একথা অবশ্যই সত্য কিন্তু এ আপনার তরীকার কর্ম হতে বিরত ছিলো।" হুজুর এরশাদ করলেন, তার কর্ম যাই হোক না, সে তার জাতকে (অস্তিত্ব) আমার নিকট সমর্পণ করায় তার কর্ম আমার কর্মের সংগে সংযুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, তার রক্ষণাবেক্ষণ আমার কর্তব্য। হুজুর ফেরেস্তাদেরকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সাথে সাথেই ফেরেস্তাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম হলো, 'তোমরা চলে এসো, তাকে শাস্তি দিওনা ; আমি আমার বন্ধুর সম্মানে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী রহমতুল্লাহ আলায়হের কাশফ, কারামত ও অন্যান্য বিষয় জানতে হলে তাঁর জীবনী পাঠ করুন।

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ আঃ)-এর অগণিত খলিফা ছিলো, তন্মধ্যে হিন্দুস্থানে প্রখ্যাত খলিফা ছিলেন চারজন এবং সমস্ত খলিফাদের মধ্যে তরিকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং তরীকার আমানত ছিলো হযরত ওয়ারেছুল আম্বিয়া খাঁজায়ে খাঁজেগান শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশতী সনজরী ওরফে খাঁজা বাবা গরীব নওয়াজ-এর উপর। হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় প্রখ্যাত খলিফা ছিলেন হযরত খাঁজা সৈয়দ মুহম্মদ তুর্ক (রহঃ), মাজার শরীফ দিল্লীর কাছাকাছি নারনোল নামক স্থানে অবস্থিত। তৃতীয় প্রখ্যাত খলিফা ছিলেন হযরত খাঁজা সাইয়্যেদি লাগোচি (রহঃ), মাজার শরীফ নারনোলে অবস্থিত। চতুর্থ খলিফা ছিলেন, হযরত খাঁজা সৈয়দ শায়খ নিজামউদ্দিন ছোগরী (রহঃ), মাজারশরীফ দিল্লীতে অবস্থিত।

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী রহমতুল্লাহ আলায়হের বেছাল মোবারক (দেহত্যাগের মাধ্যমে মহামহিমের সাথে মহামিলন) ৫ই শওয়াল ৬০৭ হিজরীতে হয়েছে। রওজা মোবারক মক্কা মোয়াজ্জেমায় 'কাবা শরীফের বায়ে জান্নাতুল মুয়া'ল্লা তে অবস্থিত। কিন্তু সেখানে ওহাবী শাসন কায়েমের পর মক্কা-মোয়াজ্জেমা ও মদীনা মনোয়ারা তথা সমগ্র সউদী আরবের একমাত্র রসূলে মকবুল (দঃ)-এর রওজা মোবারক ব্যতীত সমস্ত মাজার শরীফগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে এবং বহু স্থানে সে সব মাজারের উপর এখন প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। অতএব, পুস্তক ব্যতীত হজরত খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ)-এর মাজার শরীফের চিহ্নও সেখানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

ভুমিকা

হযরত খাঁজা বুজুর্গ ওয়ারেছুল আম্বিয়া ফিল্ হিন্দ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী ছুম্মা আজমেরী কাদ্দাসা সাল্লাহু সাররাহু তাঁর লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—

আমি দোয়া প্রার্থী, ঘৃনিত মুসলমান, অকর্মন্য ফকির, আল্লাহর গোলাম, মুঈনউদ্দিন হাসান সন্‌জরী বাগদাদ শহরে হযরত খাঁজা জোনাইদ বোগদাদী (রহঃ) -এর মসজিদে আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেছ্ সেররুল আজীজের জিয়ারত (দর্শন) ও কদমবুসি (পদচুম্বন) লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। ঐ সময়ে অনেক মাশায়েখ (পীরগণ) আমার মুর্শেদের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন যার জন্য ঐ জমীনকে আদবের স্বীকৃতি হিসেবে চুমু খেলাম। হযরত খাঁজা শায়খ ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ আঃ) আমাকে এরশাদ করলেন, "দু'রাকাত নামাজ পাঠ কর।" আমি যথার্থ ভাবে আদেশ পালন করলাম। আমার নামাজ শেষ হলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমার হাত ধরে আকাশের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন। "ইয়া এলাহি, আমি মুঈনকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম।"

অতঃপর হযরত খাঁজা ওসমান (কুঃ সেঃ আঃ) মক্কা মোয়াজ্জেমায় চলে গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গ লাভ হতে বঞ্চিত ছিলাম না। সেখানে তিনি আমাকে নাওদান (পানির নালা)-এর নীচে দাঁড় করিয়ে দোয়ায়ে খায়ের (উৎকৃষ্ট প্রার্থনা) করলেন, ঐশীলোক হতে আওয়াজ ভেসে এলো, "আমি মুঈনউদ্দিন সঞ্জরীকে গ্রহণ করলাম।" এরপর আমাকে মদীনায় নিয়ে গেলেন। যখন হযরত রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মোবারকের পার্শ্বে পৌঁছলাম তখন আমার পীর ও মুর্শেদ আদেশ করলেন, সালাম করো, আমি সালাম করলাম, রওজা মোবারক হতে আওয়াজ হলো, "ওয়া আলায়কুমুস্‌সালাম ইয়া কুতুবুল মাশায়েখ" (হে ঐশীজ্ঞান-জগতের মাশায়েখদের ধ্রুবতারা, তোমার উপর আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক)। আমার মুর্শেদ এরশাদ করলেন, তোমার কর্ম যে কামালিয়াত (পরিপূর্ণতার স্তর) পর্যন্ত পৌঁছেছে তার স্বীকৃতি পেলে। পরে মদীনা শরীফ হতে রওয়ানা হয়ে আমরা বদখ্‌শানে এসে একজন বুজুর্গের সাক্ষাৎ করলাম, যিনি হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর বয়স তখন ছিলো ১৪০ বছর, তিনি সব সময় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন, তাঁর একটা পা ছিলো না। একেবারে মূল

থেকে কাটা ছিলো। আমরা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। পা না থাকার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দীর্ঘকাল যাবৎ এ এবাদত খানায় অবস্থান করছি। নফ্‌সের ইচ্ছায় কখনও এক কদমও এ এবাদত খানার বাইরে বের করিনি। একবার এমন হলো যে নফসের প্ররোচনায় এ কর্তিত পা'টি এবাদত খানার বাইরে বের করেছি এবং অপরটি বের করে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এমন সময় অদৃশ্যলোক হতে ঐশী আওয়াজ ভেসে এলো, "হে প্রেম-প্রার্থী আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করে ভুলে গেলে?" এ আওয়াজ শুনে সাবধান হলাম এবং ওয়াদা ভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত হলাম। ছুড়ি আমার নিকট মওজুদ ছিলো তৎক্ষনাৎ খাপ থেকে বের করে যে পাটা বাইরে বের করেছিলাম সেটাকে কেটে বাইরে ফেলে দিলাম। এ ঘটনা ঘটেছে আজ প্রায় ৪০ বছর। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি অবলোকন হতে বিচ্ছিন্ন ও লজ্জিত আছি, এ জন্য যে, কাল কেয়ামতে দরবেশদের সম্মুখে মুখ দেখাবো কি করে?

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ছিলো বোখারা। সেখানকার ছোট বড় সব রকম মাশায়েখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই এমন সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলো যাঁদের প্রশংসা বর্ণনার বহির্ভূত। এমনিকরে দশটি বছর পীর ও মুর্শেদের সঙ্গে ভ্রমণ করে কাটালাম এবং পরে বাগদাদ পৌঁছলাম। বেশ কিছুদিন আমরা বাগদাদে অবস্থান করেছিলাম। তারপর আবার দশ বছরের জন্য পীর ও মুর্শেদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরুলাম। ভ্রমণ উপযোগী প্রয়োজনীয় উভয়ের আসবাব-পত্র আমি মাথায় বহন করে পথ চলতাম। ভ্রমণের দশ বছর পূর্তি হলে বাগদাদে ফিরে এলাম। এরপর হুজুর এক বিশেষ বন্দেগীর জন্য নির্জনতা বেছে নিলেন এবং আমি অধমের প্রতি নির্দেশ দিলেন, "আমি কিছু দিনের জন্য নিভৃতে (মু'তেকিফ) অবস্থান করবো, ই'তিকাফ (উপসনার জন্য নির্জন বাস) হতে বাইরে বেরোবনা, তুমি প্রত্যেক দিন একবার করে অবশ্যই আসতে থাকবে, কিছু বিশেষ কথা বলবো যা আমার অবর্তমানে তোমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। এ নির্দেশ দেওয়ার পর তিনি ই'তিকা'ফ-এ বসলেন। এ অধম প্রত্যেকদিন খেদমতে হাজির হতো এবং হুজুর জবান মোবারক হতে যা বলতেন আমি লিখে রাখতাম। এভাবেই এ ২৮টি মজলিসের অমিয়-বাণী জমা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার করুণায় নাম রাখা হয়েছে "আনিসুল আরওয়াহ"।

প্রথম মজলিস

ঈমান (বিশ্বাস)-এর আহকাম (আদেশসমূহ) সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন। এ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেস্থ সেররুহুল বারী বললেন যে, হযরত আমিরুল মু'মেনীন আব্বাছ রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ঈমান একটি উলঙ্গ জিনিস, তার পোষাক হলো, 'তাকওয়া' (সংযমশীলতা), তার পা' হচ্ছে দরিদ্রতা, তার ঘর হচ্ছে, জ্ঞান এবং তার কথোপকথন হচ্ছে আশহাদু আল-লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এরপর এরশাদ করলেন, হে দরবেশ, ঈমানের মূল কখনও বৃদ্ধিও পায়না কখনও হ্রাসও হয় না। যে বলে, যে কম-বেশী হয় সে নিজের অস্তিত্বকে (জাতকে) কষ্ট দেয়, কারণ সে মিথ্যা বর্ণনাকারী। এরপর এরশাদ করলেন, যখন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি নির্দেশ এলো যে, কাফেরদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করুন যতক্ষণ না তারা লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই) বলে। হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছেন, যতক্ষণ না তারা কলেমা পড়ে ঈমান এনেছে অর্থাৎ পবিত্র অন্তকরণে সাক্ষী দিয়েছে যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সত্য ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে নামাজ অবতীর্ণ হলে প্রত্যেকেই বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছেন। এরপর রোজার আদেশ হলো, রোজাও সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলেন। তারপর এলো হজ্ব করার হুকুম।' এর প্রতিও প্রত্যেকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অবশেষে এ সমস্ত পালন করার জন্য আদেশ হলো এবং বলা হলো সবই ঈমনের আরকান (স্তম্ভ)। নামাজ পালন করতে যেয়ে যদি নামাজের ক্ষতি বা অঙ্গহানী হয় তবে তা অতিরিক্ত (নফল) নামাজ দ্বারা পূর্ণ করতে সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা এবং এমতাবস্থায় ফেরেস্তাদেরকে বলেন, দেখ আমার বান্দারা নফল দ্বারা কিভাবে ফরজের ঘাটতি পূরণ করে নিচ্ছে। যে ফরজ এবং নফল কিছুই পাঠ করে না সে দোজখের শাস্তি ভোগ করবে। অবশ্য যদি সে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের আওতাধীন থাকে বা রসূলে মকবুল

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শাফায়াত লাভকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) অস্বীকার করে, সে কাফের। কসম (শপথ) সেই মহা পরাক্রম আল্লাহতায়ালার, কারো স্বাধীনতা নেই যে ঈমানের বিষয়গুলো হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলতেন, ঈমান একটা নুর যা কলবে অবস্থান করে। যদি কোন ব্যক্তি নেক কাজ করে তাহলে তার অন্তরে তখন শুভ্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নেক কাজ তার মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সম্পূর্ণ অন্তর সাদা হয়ে যায়। এরূপ স্থলে ঈমানের স্বাদ অর্জিত হয়। এ ঈমান বিশেষ ভাবে বন্ধুত্ব লাভের জন্য। নিফাক (কপটতা) হলো অন্ধকার বস্তু, যখন কোন মু'মেনের অন্তরে প্রবেশ করে তখন সেখানে কালিমার সৃষ্টি করে। গুনাহের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে হৃদয়ের কালিমাও প্রসারিত হয়। গোনাহ কর্মে দৃঢ়তা অবলম্বন করলে সম্পূর্ণ অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে মোনাফেকে (অবিশ্বাসী) পরিণত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত হতে বঞ্চিত হয়। এরপর এরশাদ করলেন, হে দরবেশ, যদি মো'মেনের দিল চেরা যায় তাহলে দেখবে সেখানে শুভ্রতা ভিন্ন কালোর চিহ্নও পাবেনা। তারপর বললেন, আমি আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাঁজা হাজী শরীফ জিন্দানী কুদ্দেসু সেররুহু-র মুখে শুনেছি যে, হযরত আনিস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন যে, প্রকৃত ঈমান কম বেশী হয় না। কিন্তু এর ১০১টা হদ (ধাপ বা পরিধি) আছে। যে ব্যক্তি এর মধ্যে কম বা বেশী বর্ণনা করবে সে ব্যত্যয় বা প্রভেদ সৃষ্টিকারী। এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে লা-ই-লাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এর 'হদ' বা পরিধি হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। যানাবাত (সহবাস)-এর গোসলও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি অধিক নেকি করবে সে অধিক ছওয়াব (প্রতিদান) পাবে এবং যে বিমুখ থাকবে সে কোন প্রতিদান পাবে না বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, কিয়ামতের' দিন বারিতায়ালা মু'মেনদেরকে তাদের 'আমল' (কর্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ঈমান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবেনা এবং কাফেরদেরকে, ঈমান সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মু'মেনদের ঈমান ধ্বংস হয় না কিন্তু কাফেরদের ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। নামাজ ত্যাগকারী এবং অস্বীকারকারী (মুনকির), নিম্নোক্ত হাদিসের নির্দেশে কাফের হয়ে যায়। হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

এরশাদ করেছেন, 'মান তারাকাস্‌সালাতা মুতা'আম্মেদান ফাকাদ কাফারা' অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুঝিয়া শুনিয়া নামাজ ত্যাগ করে সে কুফর (অবিশ্বাস) করে এবং কাফের হয়ে যায়। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহে আলায়হের মজহাবে এমন ব্যক্তিকে কতল (হত্যা) করা ওয়াজেব।

এ অতুলনীয় ও অমিয়-বাণী বর্ণনার পর হযরত খাঁজা নিশ্চুপ হলেন এবং স্বীয় কর্মে বিভোর হলেন। এ অধম তার যায়গায় চলে এলো। আলহাম্দু লিল্লাহ্ আলা জালেক।

দ্বিতীয় মজলিস

হযরত আদম আলায়হেস্‌ সালাম-এর মোনাজাত সম্বন্ধে হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ) আলোচনা আরম্ভ করলেন। বললেন, আমি হযরত খাঁজা নাসিরউদ্দিন মওদুদ চিশ্‌তী কাদ্দাসাল্লাহু সাররাহু হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি "তাম্বীহ আল গাফেলীন" পুস্তকে লেখা দেখেছি যে হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু,হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন, আল্লাহ্ জাল্লে কাদেরহু তাঁর পাক কালামে এরশাদ করেছেন, "ফাতালাক্কা আদামা মেররাব্বিহি কালেমাতিন ফাতাবা আলায়হে।"

যখন হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেস্তী পোষাক তাঁর অপরাধের জন্য খসে পড়েছিলো যার কারণে তিনি বেহেশ্তের মধ্যে এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম, আমার নিকট হতে পালাচ্ছ কোথায়? হযরত আদম (আঃ) উত্তরে বললেন, হে খোদা, তোমার নিকট হতে কে পালাতে পারে এবং যাবেইবা কোথায়? আমি আমার ভুলের কারণে লজ্জিত হয়ে পড়েছি। অপরাধ স্বীকার করায় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে কলেমা শিখালেন, যার উছিলায় তিনি তওবা করলেন এবং পরম করুণাময়ের দরবারে তা গৃহীত হলো।

পরবর্তী পর্যায়ে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে কিছু জটিল তথ্য প্রদান করলেন। হযরত এবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর বরাত দিয়ে বললেন যে, তিনি হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন যখন মানুষের মধ্যে গুনাহের পরিমান বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে হুকুম করেন চন্দ্র ও সূর্যকে ধরে ফেলো এবং কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে আলো বন্ধ করে দাও, যাতে সৃষ্টি সাবধান হয়। এরপর এরশাদ করলেন, যখন

মহররম মাসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় সে বছর অনেক 'বালা' (দুঃখ) অবতীর্ণ হয়, ফেতনা (গণ্ডগোল) বৃদ্ধি পায়, বুজুর্গদের উপরে বিনা কারণে অপবাদ ঘটে। সফর মাসে গ্রহণ হলে বৃষ্টি কম হবে, নদী শুকিয়ে যাবে। রবিউল আওয়াল মাসে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলে কঠিন আকাল পড়বে, যার ফলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। রবিউস সানি মাসে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে দেশের শষ্যভাণ্ডার ভরে উঠবে কিন্তু বুজুর্গদের মৃত্যু অধিক হবে। জমাদিউলআউয়াল মাসে গ্রহণ ঝড়, বৃষ্টি ও তুফান হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যাবে। জমাদিউস সানি মাসে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রহণ হলে সুফল ফলবে। সে বছর ফসল খুব ভাল হবে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে ও ঐশ্বর্য বেড়ে যাবে। রজব মাসে যদি সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ, নতুন চাঁদের প্রথম শুক্রবারে হয়, তাহলে দুঃখ-দুর্ভিক্ষ মানুষের প্রতি অত্যধিক বেড়ে যাবে। আকাশ হতে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে। শা'বান মাসে গ্রহণ হলে মানুষ সুখ শান্তিতে থাকবে। এরপর হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি রমজান মাসের প্রথম শুক্রবারে দিনে অথবা রাতে সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হয় তাহা হলে দেশে অনেক বিপদাপদ নেমে আসবে এবং অনেক লোক মারা যাবে। শওয়াল মাসে গ্রহণ হলে হাওয়ার গতি অত্যধিক বেড়ে যেয়ে অনেক গাছ উপড়িয়ে ফেলবে। জিলকদ মাসে গ্রহণ হলে অনেক রোগ অবতীর্ণ হবে। জিলহজ মাসে গ্রহণ হলে মনে করবে দুনিয়ার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, ফেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে, আয়েব (দোষ) ঢেকে রাখার লোক মরে যাবে, অপরের দোষ বলে বেরাবার লোক অধিক হবে, বাইরের সাজ-সজ্জা বেড়ে যাবে, আখেরাত (পরকাল) ধ্বংস হবে। দুনিয়ার প্রেম বেড়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষ পরকালের চিন্তা পর্যন্তও ছেড়ে দিবে। মানুষ মোনাফেকদের সম্মান করবে, দরবেশদেরকে দীন-দুঃখী মনে করে ঘৃণা করবে। সে সময় তাদের প্রতি আল্লাহতায়ালা এমন একটা বিপদ প্রতিষ্ঠিত করবে যার কারণে তাদের সুখ বিনষ্ট হবে।—নাউজুবিল্লাহ।

হযরত খাঁজা এ অমিয়-বাণী বর্ণনা করার পর তিনি স্বীয় কাজে মশগুল হলেন। আমি আমার বিজন স্থানে চলে এলাম।—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালেক।

তৃতীয় মজলিস

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেসু সেররুহুল আজীজ শহরের অপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করলেন। বললেন, শেষ জমানায় শহরে অধিক গোনাহের কারণে শহর নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যখন আমার পীরের সঙ্গে একসাথে সমরকন্দ

সফর করছিলাম তখন হযরত খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহ আলায়হে-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, হযরত ইমামুল আশ্‌রাইন মদিনাতুল উলুম ওয়াল মুতালেব আলী এবনে আবু তালিব করমুল্লাহু ওয়াজহু এরশাদ করেছেন, যখন এ আয়াত নাজেল হলো, "ওয়া ইমমিন্‌ কার্‌ইয়াতিন ইল্লা নাহ্‌নু মুহলেকুহা কাবলা ইয়াওমিল কেয়ামাতে আও মু'য়াজ্জেবুহা আজাবান শাদীদা। কানা জালেকা ফিল কিতাবি মাসতুরা" অর্থাৎ এমন কোন শহর নেই যেখানে কেয়ামত আসার পূর্বে দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা অবতীর্ণ হবেনা এবং এমন কোন শহর নেই যেটা ধ্বংস ও নষ্ট হবেনা। একথা 'লোহে মাহফুজে' লিখা আছে। এরপর এরশাদ করলেন, হাবশীগণ (আবিসিনিয়ার অধিবাসী, নিগ্রো) মক্কাকে বিরান (জনশূন্য) করবে। মদিনা দুর্ভিক্ষের কারণে জনশূন্য হবে, বিপদাপদ অবতীর্ণ হবে, লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে। আমাদের দেশ (খোরাসান, বর্তমান ইরাক) "রিয়া" (কপটতা)-এর কারণে ধ্বংস হবে। শ্যাম দেশ (সিরিয়া) বাদশাহের জুলুমের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আকাশ হতে এক প্রকার ফসল ধ্বংসকারী পোকা (টিড্‌ডি) জমিনে পতিত হবে। রোমের ধ্বংস হবে সমমৈথুনের কারণে। বলখ্‌ দেশ ব্যবসায়ী বন্ধুত্বের কারণে ধ্বংস হবে। মুসলমানগণ সুদ গ্রহণ করবে এবং নরখাদক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী (রহঃ) আরও বললেন যে, ভবঘুরে ও তাদের সঙ্গীদের রঙ্গ-রস ও মদ্য পানের কারণে শহর ধ্বংস হবে। সিস্তান দেশ ভূমিকম্প ও অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রলয়ে পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং সেখানকার অধিবাসীগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মিশর ও দামেস্কে মেয়েদের উপর অত্যাচারের মাত্রা এতো বৃদ্ধি পাবে যে, যার কারণে তাদের মৃত্যুও ঘটবে এবং অনেকে বলবে, এ হচ্ছে ফাতেমা (নবীদুলালী)-নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং এটাই হবে উক্ত দেশ দু'টোর ধ্বংসের কারণ। ইরান এবং সিন্ধু ধ্বংস হবে হিন্দুস্থানের কারণে। হিন্দুস্থান ধ্বংস হবে ফ্যাছাদ, জিনা ও শরাব পানের কারণে। এরপর আল্লাহ তায়ালা হাওয়াকে হুকুম করবেন দুনিয়ার অবশিষ্ট লোক ও দেশকে নিঃশেষ করো। এরপরও যারা বেঁচে থাকবে তাদের মাঝে তখন মুহম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ আত্মপ্রকাশ করবেন। সারা দুনিয়ায় তখন ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর হযরত ইসা (আঃ) আসমান হতে অবতরণ করবেন। ঐ সময় সমস্ত জগতে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। এ অমিয়-বাণী পেশ করার পর হুজুর আল্লাহ্‌তে মশগুল হলেন। আমিও আমার জায়গায় ফিরে এলাম। আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

চতুর্থ মজলিস

এ মজলিসে স্ত্রীলোকদের স্বীয় স্বামীর আনুগত্য ও গোলাম মুক্ত করার ফজিলত (উপকারিতা) সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াস সালাম হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন যে, হযরত (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে নারী স্বীয় স্বামীর ইচ্ছায় তার কাছে না যেয়ে দূরে দূরে থাকে তার সমস্ত নেকি এমন ভাবে ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যায়, যে ভাবে সাপ তার খোলস ত্যাগ করে আলাদা হয়ে যায় এবং জঙ্গলের বালুর পরিমাণ গুনাহ তার আমলনামায় লেখা হয়। যদি সে স্ত্রীলোক এমতাবস্থায় মারা যায় তবে সে দোজখ ভোগ করবে। দোজখের সত্তরটি দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে নারীর স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকাকালীন অবস্থায় ইন্তেকাল করে, সে তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ বেহেস্তে স্থান লাভ করে। বেহেস্তের সত্তরটি দরজা উন্মুক্ত করে তার কবরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। ইমাম আবুল লায়ছ সমরকন্দি (রহঃ) স্বীয় কিতাব ''তাম্বীহ''-তে লিখেছেন, যে নারী স্বীয় স্বামীর নিকট রাগের সঙ্গে উপস্থিত হয় তার আমলনামায় আকাশের তারকা-রাজীর সম পরিমাণ সংখ্যক গোনাহ লেখা হয়। এরপর এরশাদ করলেন, যদি স্বামীর শরীরে কোন স্থান হতে পুঁজ অথবা রক্ত প্রবাহিত হয় এবং স্ত্রী সেগুলো সাফ করার অভিপ্রায়ে মুখ দিয়ে চাটে, তবুও স্বামীর পূর্ণ হক আদায় হবেনা। তারপর বললেন, হে দরবেশ, যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদাহ করার হুকুম থাকতো তাহলে আল্লাহতায়ালা অবশ্যই প্রথমে স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে সেজদাহ করার হুকুম প্রদান করতেন।

পরবর্তী আলোচনা গোলাম আযাদ করার ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে এক দরবেশ হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জমিনে চুমু খেলেন। হুজুর তার জন্য দোয়া-খায়ের করলেন। এরপর এরশাদ করলেন, রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন গোলামকে আযাদ করে দেয় তার আমলনামায় আজাদকৃত গোলামের শরীরের শিরা-উপশিরার সম পরিমাণ সংখ্যক নেকি লেখা হবে এবং যে পর্যন্ত সে একজন নবীর প্রাপ্ত পুণ্যের সম পরিমাণ সওয়াবের সৌভাগ্য অর্জন না করবে সে পর্যন্ত সে এই ধ্বংসশীল পৃথিবী হতে

বিদায় দেবে না। এ ছাড়াও কেয়ামতের দিন সে নিজের মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে হতে ৭০ জনকে ক্ষমা করাতে পারবে এবং তার শরীর হতে তার দেহের লোমের সম পরিমাণ নূর উদ্ভাসিত হবে। আসমানে তার নাম অলি-আল্লাহ, (আল্লাহর বন্ধু) বলে উচ্চারিত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বললেন, গোলাম আযাদকারী ব্যক্তি যে পর্যন্ত না নিজের যায়গা বেহেস্তে দেখবে সে পর্যন্ত সে মারা যাবে না এবং প্রাণবায়ু বের করার সময় এ কাজে নিযুক্ত ফেরেস্তা (মালেকুল মউত) তাকে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ প্রদান করবে। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি বন্দী বা দাসকে মুক্তি দিবে সে এ নশ্বর পৃথিবীতে যে পর্যন্ত বেহেশ্‌তের সুধা (শারাবুন তহুরা) পান না করবে সে পর্যন্ত সে নিজেকে মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করবে না। মৃত্যু যন্ত্রণাও তার জন্য সহজ করা হবে। কিয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া পাবে এবং বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাবে। এরপর এরশাদ করলেন, আহ্‌লে সলুকগণ দুনিয়াকে দোজখের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে, কারণ দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করলে পথভ্রষ্ট হতে হয়; যার তুলনা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। যেমন, কোন পথিক যদি অন্ধকারে পথ চলতে যেয়ে পথ হারিয়ে ফেলে তাহলে পুনরায় পথ খুঁজে পেতে তাকে খুবই কষ্ট করতে হয়। অনেক সময় এমনও ঘটে, যে পথে ফিরে আসার পূর্বেই তাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং সেই ক্ষমতাবান, যে নিজের সত্তাকে এই দুনিয়ায় মৃত্যু ঘটিয়ে রাখে। যে দুনিয়াদারীতে নিজেকে না জড়িয়ে এ আবর্জনা হতে মুক্ত থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতম স্তরে বা মাকামে পৌঁছে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এরপর এরশাদ করলেন, আহ্‌লে সলুক, 'দাসগণকে' হাজার প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ক্রয় করে মুক্ত করেছে যেন কিয়ামতের দিন সে ঐ ওসিলায় (কারণে) দোজখ হতে মুক্তি পায়। যখন হযরত খাঁজা এ অমিয়-বাণী বর্ণনা শেষ করলেন, তখন স্বীয় কর্মে বিভোর হলেন। এ দোয়াপ্রার্থী বিদায় নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। • আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আলা জালেক।

পঞ্চম মজলিস

হুজুর সদকা সম্বন্ধে কথা শুরু করলেন, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়াহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট আরজ করা হয়েছিল, কর্মের (আমলের) মধ্যে কোন কর্ম আফজল (শ্রেষ্ঠ)? উত্তরে তিনি এরশাদ করেছিলেন 'সদকা' (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করা)। পুনরায় আবেদন করা হলো, 'সদকা কি জিনিস'? উত্তরে

বললেন, কারও অভাব দূর করা। সদকা প্রদানকারীর আশেপাশের ৭০ হাজার লোক কিয়ামতের ভয় হতে নিরাপদ থাকবে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা হাসান বসরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সদকা দেয়া শ্রেষ্ঠ, না কোরান শরীফ তেলাওয়াৎ করা? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে হতে বর্ণিত আছে যে, এক টুকরা রুটি বা একমুঠো খেজুর দান করা হাজার বার কোরান শরীফ খতম করার চেয়েও উত্তম! এরপর সদকা সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করলেন হযরত খাঁজা হাসান বসরী (রহঃ)। বললেন, একবার এক ইহুদীকে দেখলাম বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক ক্ষুধার্থ কুকুরকে রুটি খাওয়াচ্ছে। তাকে বললাম, তোমার এ নেকি কবুল হবেনা, কারণ তুমি ইসলামের বহির্ভূত সম্প্রদায়ের লোক। ইহুদী উত্তরে বললো, "হে খাঁজা (মহামান্য ব্যক্তি), যদি নেকি কবুল (গৃহীত) না হয় না হবে, কিন্তু খোদা তো দেখেন এবং জানেন। এ ঘটনার বহুদিন পর আমি কাবা ঘর জিয়ারতের জন্য গিয়েছিলাম, তওয়াফের সময় দেখলাম এক বৃদ্ধা কাবা ঘরের নর্দমার নীচে সেজদাবনত হয়ে 'রাব্বি' 'রাব্বি' (আমার রব, আমার রব) বলছে, হঠাৎ গায়েবী আওয়াজ হলো, 'লাব্বায়কা আবদি' অর্থাৎ—হে আমার এবাদতকারী, এইতো আমি উপস্থিত। আমি তওয়াফ শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট গেলাম। বৃদ্ধা সেজদাহ্ হতে মাথা উত্তোলন করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে মাননীয়, আমায় চিনতে পেরেছেন? আমি সেই ইহুদী, যে বসরার বাজারে কুকুরকে রুটির টুকরো খাওয়াচ্ছিলো এবং আপনি নিষেধ করেছিলেন। এবার আপনি দেখলেন তো করুণাময় আমার পূণ্য গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছেন। হে মহামান্য হাসান, আল্লাহ্‌র কুদরতকে কেউই সম্পূর্ণ জানে না এবং এটাও বুঝতে পারে না যে, কোন কাজের পরিণাম কি হবে!

অতপরঃ হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দেস্থ সেররুহুল আজীজ এরশাদ করলেন, আমি সলুকের কিতাবে লেখা দেখেছি যে, খাঁজা ইব্রাহীম বিন্ আদহম (রহঃ) বলেছেন, এক বছর বন্দেগীর চেয়ে ১ দিরহাম (টাকা) সদকা দেয়া উত্তম এবং একজন গোলাম আজাদ করা সারা রাত্রি বন্দেগী করার চেয়ে উত্তম। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু হযরত রসূলে খোদা (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোরান শরীফ' তেলাওয়াৎ করা উত্তম না সদকা দেয়া? হুজুর করিম (সাঃ) এরশাদ করলেন, "সদকা দেয়া"। কেননা সদকা দোজখের আগুন হতে মুক্ত করে। এরপর বললেন, সদকা অন্তরে নুর পয়দা করে এবং

হাজার রাকাত নামাজ অপেক্ষা অধিক প্রতিদান আনয়ন করে। এরপর বললেন, সদকা প্রদান করা নফল নামাজ হতে উত্তমতর। আরও বললেন, যারা সদকা দেয় এবং নামাজ পাঠ করে তাদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন সূর্য যখন মাথা থেকে সোয়া বল্লম পরিমাণ উপরে অবস্থান করবে তখন সদকা প্রদানকারী ব্যক্তি আরশে আযীমের নীচে ছায়ায় স্থান লাভ করবে এবং ঐ সদকা তার মাথার উপর গম্বুজ হয়ে যাবে। সদকা বেহেশতের পাথেয়। সদকা প্রদানকারী কখনও আল্লাহর করুণা হতে বঞ্চিত হবে না। এরপর আরও বললেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "দাতা বা দানকারিগণ আমার বন্ধু এবং দানকারীদেরকে কবর বা কেয়ামত-এর কোন আযাবই করা হবে না। এসব লোককে নিয়ে পৃথিবীও গর্ববোধ করে। এরা যখন পদ চলে তখন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য একটি করে প্রতিদান আমলনামায় লেখা হয়। দানশীল ব্যক্তিগণ এক হাজার বছর পূর্বে বেহেস্তের সুঘ্রাণ গ্রহণ করবে এবং প্রতিদিন তাদের আমলনামায় একজন পয়গম্বর (আঃ)-এর পূণ্য লেখা হয়।

পরবর্তী বক্তব্য পেশ করলেন আউলিয়া (রহঃ)-র সম্বন্ধে এরশাদ করলেন আল্লাহর বন্ধুগণ (আওলিয়া আল্লাহ) দশ দশটি পর্যন্ত নিজেদের নফসের বাসনা পূরণে বিরত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত খাঁজা আবু তোরাব নহ্শী, যিনি অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের বুজুর্গ ছিলেন, তাঁর ২০ বছর যাবৎ বাসনা ছিলো, ডিম সহকারে মোরগের মাংস দিয়ে রুটি খাবেন, কিন্তু নফসের এ ইচ্ছাকে তিনি কোনদিন পূরণ করেননি। ২০ বছর পর তাঁর ইচ্ছা হলো আজ নফসের ইচ্ছা পূরণ করা দরকার এবং সেই অনুসারে সন্ধ্যার ইফতারের ব্যবস্থা করলেন। সেই দিন ঘটলো একটা বিভ্রাট, তিনি যোহরের নামাজের জন্য নতুন ওজু করতে বিজন বনের দিকে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পথিমধ্যে এক বালক দৌড়ে তাঁর হাত ধরে বলতে লাগলো, "কাল তুমি আমার জিনিস পত্র চুরি করে নিয়ে গেছো, আজ আবার কি চুরি করতে এসেছ?" লোকজন 'চোর-চোর' আওয়াজ শুনে জমা হয়ে গেলো, ঘটনাচক্রে বালকটির পিতাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো। সে ছেলের নিকট থেকে সব শুনে হযরত খাঁজাকে ধরে বিশটি ঘুষি মারলো। এমন সময় হযরত খাঁজা তোরাব নহ্শী (রহঃ)-এর এক পরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে এ অচিন্তনীয় ঘটনা অবলোকনে হকচকিয়ে গেলো। সে তখন উপস্থিত জনতাকে লক্ষ করে বললো উনি চোর নন, উনি মহামান্য ও মাননীয় তোরাব নহ্শী (রহঃ)। এ বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত জনতা স্তিমিত হয়ে গেলো এবং নিজেদের ভুলের জন্য

অনুশোচনা করতে লাগলো এবং বললো, হুজুর আমরা আপনাকে চিনিনি, আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করে দিন। তিনি জনতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে ঐ পরিচিত ব্যক্তির সাথে তার বাড়ীতে মেহমান হলেন। ইফতারীর সময় সে লোক তাঁর জন্য মোরগের গোস্ত, ডিম, ও রুটি পরিবহণ করলো। ইফতারের নফসের চাহিদা অনুযায়ী আহার্য দেখে তিনি বলে উঠলেন, "এগুলো জলদি এখান থেকে দূর করো, আমি এসব জিনিস আহার না করে শুধু আহারের বাসনা পোষণ করার জন্য লাভ করেছি বিশ দুরি, আর যদি এসব আহার করি তাহলে না জানি কোন ধরনের বিপদে আবদ্ধ হই। পরের ঘটনা হলো তখন তিনি ওগুলো খেলেনই না বরং বাকি জীবনেও তিনি আর নফসের কোন বাসনাই পূরণ করেননি।

এ পর্যন্ত বলা শেষ করে হুজুর আল্লাহতে মশগুল হলেন এবং আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

ষষ্ঠ মজলিস

শরাবখোর বা মদ্যপায়ীদের সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করলেন। হযরত আমিরুল মো'মেনীন ওমর রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন, শরাব (মদ বা সূরা) সম্পূর্ণরূপে "হারাম।" পরিমাণে কম হোক অথবা অধিক হোক সর্বপ্রকার পরিমাণই হারাম (নিষিদ্ধ)। কিন্তু আঙ্গুরের রস বের করে পান করা হারাম নয়। অবশ্য যদি সে রস রেখে দিয়ে পরে পান করে তাহলে নাজায়েজ (অনুচিত)। এরপর এরশাদ করলেন রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ হচ্ছে লা'নত (অভিশাপ) সেই ব্যক্তিদের উপর যারা 'শরাব' পান করে অথবা বিক্রি করে অথবা বিক্রীত মূল্য দ্বারা নিজের কর্ম সমাধা করে। এরপর বললেন, এ সব কথা হচ্ছে হুকুম বা আদেশের ব্যাপার এবং এ জিনিস পান না করা খুব কঠিন কোন কাজ নয়ঃ কেননা প্রথম থেকে অভ্যাস না থাকলেই তো হলো। কিন্তু যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তাদের জন্য ত্যাগ করা কষ্টের ব্যাপার হলেও ত্যাগ অবশ্য কর্তব্য। সলুকের পথে এমন এমন মহাপুরুষ (বুজুর্গ) গত হয়ে গেছেন যাঁরা নিজের নফসকে হালাল (বৈধ) পানিও পান করতে দেয়নি। উপমা স্বরূপ হযরত

খাজা ইউসুফ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহ আলায়হের ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক রাতে তাঁর ইচ্ছা হলো হাজার রাকাত নামাজ পাঠ করবেন। কিন্তু তাঁর নফস বিরুদ্ধাচরণ করায় পড়তে পারেননি। সকালে চিন্তা করতে লাগলেন নফসের বিরুদ্ধাচরণের কারণ কি? বহু অনুসন্ধানের পর তাঁর মনে হলো রাতে এক কোঁজা (পানি পান করার পাত্র) পানি অধিক পান করে ফেলেছেন এবং সমস্ত ফাসাদ (গণ্ডগোল) ঐ পানিকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। অতঃপর শপথ করলেন, 'যত দিন জীবিত থাকবো নফসকে (নিজেকে) তার ইচ্ছা মতো পানি পান করতে দেবনা বরং পিপাসার্ত থাকবো। পরিশেষে তিনি তাই করেছিলেন, যত দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কখনও আর পেট ভরে বা চাহিদা অনুযায়ী পানি পান করেননি। হুজুর এ পর্যন্ত বর্ণনা করে মশগুল হলেন। আমিও স্বীয় কুটিরে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

সপ্তম মজলিস

আজকের বক্তব্য ছিলো মু'মেনদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) দুঃখ দেয়া সম্বন্ধে। হুজুর এরশাদ করলেন, হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ করেছেন, মুসলমানদেরকে দুঃখ দিও না। কারণ, এদের সিনার (বক্ষের) মধ্যে সত্তরটি পর্দা রয়েছে এবং প্রতিটি পর্দার উপর একজন করে ফেরেস্তা অবস্থান করছেন। যে ব্যক্তি কোন মুমেন-মুসলমানকে দুঃখ দেয় প্রথমতঃ সে যেন কোন ফেরেস্তাকে কষ্ট দেয় অর্থাৎ যন্ত্রণা প্রথমে ফেরেস্তাগণের মধ্যেই অনুভূত হয় এবং পরে মোমেন উপলব্ধি করে। যে ব্যক্তি মোমেনকে কষ্ট দেয়, ৭০টি কবীরাহ গুনাহ (মদ্যপান, জেনা অথবা এধরনের নিষিদ্ধ কোন কর্মের অপরাধকে কবীরাহ গোনাহ বলা হয়) তার কর্মফলের (আমলনামায়) সাথে যোগ হয় এবং তার জন্য দোজখের মধ্যে একটা শাস্তির ঘর তৈরী করা হয়। মোনাফেক (প্রবঞ্চক, ভণ্ড, কপট) ব্যতীত কেউ মো'মেনদের অন্তরে কষ্ট দেয় না।

পরবর্তী বক্তব্য ছিলো সুন্নত ও নফল নামাজ নিয়ে। বললেন ফরজের পরেই সুন্নত ও নফলের স্থান। আমাদের মশায়েখ (পীরগণ) রহমতুল্লাহ আলায়হে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে চার রাকাত নফল নামাজ প্রথমে পাঠ করে এবং কোরান শরীফের মধ্য হতে যা তার স্মরণে আসে সুরা ফাতেহার

সঙ্গে সংযুক্ত করে (অর্থাৎ সুরা ফাতেহার শেষ অক্ষরটির উপরে পেশ দিয়ে পরবর্তী সুরা বা আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে) পড়বে সে এই দুনিয়াতে বেহেস্তের সুসংবাদ পাবে এবং মৃত্যুর পর ৭০ হাজার ফেরেস্তা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন উপহার নিয়ে আসবে এবং দাফনের পরে তার কবরে নূরের তবক বিছিয়ে দেয়া হবে। হাশরের দিন ঐ ফেরেস্তাগণই তাকে কবর থেকে উত্তোলন করবে এবং ৭০ প্রকার বেহেস্তী পোশাক পরিধান করাবে। আল্লাহুম্মা আরজেকনা মেনহু (হে আল্লাহ আমাদেরকে উহা হতে রেজেক দান কর)। এরপর এরশাদ করলেন, যোহরের সুন্নতের পূর্বে যে ব্যক্তি চার রাকাত নফল নামাজ পাঠ করবে এবং এ নামাজের জন্য যে সব সুরা-কারাত নির্ধারিত আছে তা সঠিকভাবে অনুসরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার হাজার বাসনা পূর্ণ করবেন। প্রত্যেক রাকাতের বিনিময়ে এক হাজার বছর এবাদতের ছওয়াব পাবে। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি আসরের ৪ রাকাত সুন্নতের পূর্বে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়বে সে তার প্রতি রাকাতের বিনিময়ে বেহেস্তে একটি করে প্রাসাদ (মহল) পাবে। ঐ রওয়ায়েত হযরত আবু হুরায়রা (রাদিঃ) হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি মাগরেবের নামাজের পরে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়বে, সে ব্যক্তি রোজ হাশরে আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাবে। যে ব্যক্তি মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে চার রাকাত নামাজ পাঠ করবে আল্লাহতায়ালা তাকে সমস্ত বালামুসিবত হতে মুক্ত রাখবেন এবং বিনা হিসাবে তাকে বেহেস্ত প্রদান করবেন। এ ছাড়াও প্রত্যেক রাকাত নামাজের বিনিময়ে এক একজন নবী (আঃ)-দের ছওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তি এশার নামাজের পরে ৪ রাকাত সুন্নত নামাজ পাঠ করবে সে আল্লাহ তায়ালার বারগাহে (দরবারে) গৃহীত হবে এবং বিনা হিসাবে বেহেস্তে স্থান পাবে। এই সমস্ত নামাজ আল্লাহ তায়ালার বন্ধুগণ ব্যতীত কেউ পাঠ করেন না। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি অধিক নামাজ পাঠ করে, তার অর্জিত ছওয়াবের পরিমাণ সংখ্যক ছওয়াব, ফেরেস্তাদের এবাদতও হতে তার অর্জিত ছওয়াবের সঙ্গে তাকে দান করা হয়।

এরপর বললেন, মো'মেনদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া সম্বন্ধে। আহলে সলুকগণ অপরের সঙ্গে কথা বলা এই জন্য বন্ধ করে দেয় যাতে কথা বলতে যেয়ে কোন মুসলমান ভাইয়ের অন্তরে দুঃখ না দেয়া হয়। আহলে সলুক শুধু ভয় পায় এই ব্যাপারকেই এবং এ জন্যই তারা নিজেদেরকে বোবা ও বধির করে রাখে। এই পর্যন্ত বলার পর হুজুর আল্লাহতে মশগুল হলেন এবং আমি আমার নির্ধারিত স্থানে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

গালি দেয়া সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। এরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে গালি দেয়ার অপরাধের মানদণ্ডটি দাঁড়ায়, স্বীয় মা বোনের সঙ্গে "জেনা" (নিষিদ্ধ সহবাস) করার সমতুল্য। ফেরাউনের সাহায্যকারীদের মধ্যে তার নাম লিখা হয়ে যায়। [ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-কে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার অগ্রনায়ক ছিলো।] এরপর এরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে গালি দিলে তার দোয়া ১০০ দিন পর্যন্ত কবুল হয় না এবং সে যদি বিনা তওবায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে দোজখে হবে তার বাসস্থান। পরে এরশাদ করলেন, এক সময় হযরত খাঁজা নাসিরউদ্দিন আবু ইউসুফ কুদ্দেস্থ সের রুহুল আজিজ -এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইলমের বাহাস (জ্ঞানের বিতর্ক) চলছিলো। একব্যক্তি খুব বাকপটুত্ব দেখাচ্ছিলো এবং উচ্চস্বরে কথা বলছিল। খাঁজা আবু ইউসুফ চিশ্‌তী (কুঃ সেঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, আস্তে কথা বল। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি চুপ হয়ে গেলো এবং নিজের জিহ্বাকে এমনভাবে চিবালো যে, একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গেলো। অবশেষে নিজের নফসের দিকে খেয়াল করে বলতে লাগলো, তোর এই অযথা কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল? মজলিস হতে নিশ্চুপে উঠে বেরিয়ে গেলো। পরবর্তীতে সে দশ বছর পর্যন্ত এই অপরাধের জন্যে নির্জনে এবাদতে মশগুল ছিলো।

এরপর খাবার দেয়া হলো। দস্তরখান সাদা ছিলো। তিনি বললেন, লাল দস্তরখান নিয়ে এসো, তার উপর খাবার রেখে খাওয়া হবে। কেননা হযরত রসুলে মকবুল (সঃ) খাঞ্চার (Tray) মধ্যে রেখে খুব কম সময়েই আহার করতেন; যদি মেহমান আস্‌তো এবং মেহমানদারি করা হতো, তা হলেও লাল দস্তরখান ব্যবহার করা হতো। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দস্তরখানও লাল ছিলো এবং সেটা আসমান হতে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে আহার করবে তার প্রতি লোকমা (গ্রাস)-এর প্রতিদানে একশ' করে ছওয়াব পাবে এবং বেহেস্তের ১০০টি দরজা তার জন্য নির্ধারিত হবে। সে ব্যক্তি বেহেস্তের মধ্যে সব সময়ই হযরত ঈসা (আঃ) ও অন্য নবীদের হাজার হাজার সালাম ও আশীর্বাদ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে কোন গরীব-দুঃখীকে আহার করাবে তার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিদান তার আমলনামায়

লিখা হবে এবং যখন রুটি খাওয়া শেষ হবে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার পুঞ্জিভূত গোনাহ্কে মাফ করে দেবেন। এরপর এরশাদ করলেন, লাল দস্তরখানে খাবার খাওয়া হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ (আঃ)-এর সুন্নত এবং এই সুন্নত অন্য আম্বিয়াদেরও ছিলো। হযরত মুসা (আঃ) কখনও লাল দস্তরখানে খাবার না রেখে আহার করতেন না। এরপর হযরত কসম খেয়ে বর্ণনা করলেন, কসম সেই খোদার যার কুদরতের হাতে নিহিত আমার প্রাণ; যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে রুটি খাবে সে এক ওমরা হজ্জের ছওয়াব পাবে এবং এক হাজার ক্ষুধার্থকে পেট ভরে আহার করানোর ছওয়াব পাবে। সে ব্যক্তি এতো বেশী ছওয়াব লাভ করবে যেন আমার উম্মতের মধ্যে হাজার বন্দীকে মুক্ত করালেন। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি সব সময় লাল দস্তরখানে আহার করতে থাকে রোজ হাশরে জিব্রাইল (আঃ) তার জন্য বেহেস্তী পোশাকসহ বোরাক নিয়ে আসবে, বোরাকের উপরে উপবেশন করিয়ে এবং পোশাক পরিয়ে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কোন মেহমানকে লাল দস্তরখানে আহার করাবে, যে প্রতিটি দানা, যা সে মেহমানকে ভক্ষণ করাবে, প্রতিদানে সে হাজার হাজার নেকি পাবে। এরপর এরশাদ করলেন, আমি আমার পীর হযরত খাঁজা হাজী শরীফ জিন্দানী (রঃ)-এর মুখে শুনেছি, বলছিলেন, যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে খানা খাবে এবং খাওয়াবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রহমতের নজরে দেখেন এবং হাজারটি বেহেস্তের প্রকোষ্ঠ দান করবেন। হযরত খাঁজা যখন এ বর্ণনা শেষ করে মশগুল হলেন, তখন দোয়াপ্রার্থী নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

নবম মজলিস

বৃত্তি বা পেশা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। বললেন, হযরত রসূলে মকবুল (সঃ)-এর নিকট একবার জানতে চাওয়া হয়েছিলো ব্যবসা করা কেমন? জবাবে তিনি বলেছিলেন "আলকাসেবু হাবিবুল্লাহ" অর্থাৎ যারা ব্যবসা করে তারা আল্লাহ্‌র বন্ধু। ঐ সময় মজলিসের মধ্য হতে একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ্, আপনি আমার পেশা সম্বন্ধে কি বলেন? রাসূলে (সঃ) এরশাদ করলেন, তোমার পেশা কি? সে বললো, আমি দর্জির কাজ করি। তিনি বললেন, তোমার পেশা খুব উত্তম, যদি তুমি সততা অবলম্বন কর, কাল কেয়ামতে ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে তোমার হাশর হবে। এরপর আর একজন লোক দাঁড়িয়ে

বললেন, আমার পেশা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি জিজ্ঞাস করলেন তোমার পেশা কি? তিনি উত্তরে বললেন আমি 'হারছী' (শস্য দানা)-র ব্যবসা করি। তিনি উত্তর দিলেন এ ব্যবসাও উত্তম। হযরত জিব্রাইল আঃ হযরত আদম (আঃ)-কে এই পেশা শিখিয়েছিল। যদিন মিথ্যা না বল এবং চুরি না কর তাহলে হাশরের দিন আদম (আঃ)-এর সঙ্গে তোমাকে উঠানো হবে এবং উত্তম বেহেস্ত দান করা হবে এবং তার প্রতিবেশী হবে। এরপর আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলল্লাহ,, আপনি আমার পেশা সম্বন্ধে কি আদেশ করেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পেশা কি? তিনি উত্তর দিলেন আমার পেশা (ব্যবসা) 'কস,তকারী' (শব্জি তরকারি) তিনি বললেন, তোমার ব্যবসা অত্যন্ত ভাল, হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এরও এই পেশা ছিলো। "আল্লাহ, তায়ালা মঙ্গলকরুন এবং সুফল প্রদান করুন" হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এই পেশা অবলম্বনকারীদের জন্য দোয়া করেছিলেন। হাশরের দিন আমার সাথে তাদের হাশর হোক এবং আমার প্রতিবেশী হোক। এবার অন্য একজন দাঁড়িয়ে বললেন আমার পেশা শিক্ষকতা। তিনি জবাবে বললেন, এই পেশাধারীকে আল্লাহ্ তায়ালা বন্ধু মনে করেন, আরও বললেন, হাশরের দিন আমার সঙ্গে তোমার হাশর হবে এবং তুমি আযরে আজীম (শ্রেষ্ঠ প্রতিদান) লাভ করবে। যদি পড়াবার সময় নির্ভুল ও মনোযোগ সহকারে পড়াও তাহলে ফেরেস্তা তোমার জন্য আস্তাগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে। এরপর আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন আমার পেশা তেজারত (ব্যবসা)। তিনি এরশাদ করলেন, এটাও ভাল পেশা যদি সততা বজায় রাখ তাহলে লোকমানের বেহেস্তে স্থান পাবে। এরপরে তিনি বললেন, হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তালাবাল হালালে ফারিজাতুন আলা কুল্লে মুসলেমেও ওয়া মুসলেমাতিন। অর্থাৎ হালাল রুজি প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ। এরপর এরশাদ করলেন, "আলকাসেবু সাদিকুল্লাহ।" অর্থাৎ পেশা অবলম্বনকারী আল্লাহ্র সাদেক অর্থাৎ বন্ধু। অন্যত্র বলেছেন আল কাসেবু হাবিবুল্লাহ অর্থাৎ পেশা অবলম্বনকারী আল্লাহ,তায়ালার বন্ধু। এরপর এরশাদ করলেন, বৃত্তি অবলম্বনকারীর উচিত, যে পেশার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে তার উপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত, পেশা শুধু পেশার জন্যই। এতে অন্য কোন উপকার নেই। তাকে অবশ্যই ফরজ নামাজ, রোজা, ও রসুলে খোদা (সাঃ)-এর সুন্নতসমূহকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে এবং এগুলো সমাধা করার পর পেশায় নিয়োজিত হতে হবে। আল্লাহ, তায়ালার করুণা লাভের জন্য নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। আহ,লে আশেকীদের মধ্যে

যদি কেউ চিন্তা করে যে পেশার মাধ্যমে রুজি আসে তাহলে সে সাথে সাথে কাফের হয়ে যায়। কেননা রিযিকের ব্যাপারে হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) বলেছেন, রিজিক দানের অধিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ, রাব্বুল আলামিন স্বয়ং। যদি কেউ বলেন, "ম্যায় আন্ধিবানকে কাম করতে হায় আওর বিবি বনকে খাতে হ্যাঁয়" অর্থাৎ আমি অন্ধ সেজে কাজ করি এবং বিবি সেজে খাই, তাহলে এ প্রবচনকারীও কাফের হয়ে যায় এবং এরূপ আরও অনেক খারাপ প্রবচন আছে যা আমরা ব্যবহার করি কিন্তু যার পরিণতি জানি না। এরপর এরশাদ করলেন, আমি 'উমদাহ,' কেতাবে লেখা দেখেছি হযরত আবু দরদা (কুঃ সেঃ) প্রথম দিকে দোকানদারীর পেশায় একযুগ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন এবং পরে হঠাৎ করে ছেড়ে দিলেন। লোকজন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন আমার কাছে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমার এ দোকানদারী মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলনা, আমার দ্বারা এ কাজের মাধ্যমে মুসলমানের প্রাপ্য সম্পূর্ণ আদায় হচ্ছিলনা বরং কমে যাচ্ছিল। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রঃ) কোন এক লোকের নিকট কিছু টাকা পেতেন। তিনি যখন তার কাছে টাকা ফেরত চাইতেন তখন সে প্রত্যেক দিনই পরিশোধ করার শপথ করতো। পরে একদিন সে সাত দিনের সময় চাইলো তিনি তাকে সময় দিলেন। সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন কাজ সমাধা করতে শাম দেশে চলে গেলো, কিন্তু ফিরে এলো এক বছর পরে। তিনি আবার তাকে তাগাদা দিলেন, সে আবার সাতদিনের সময় চাইল। তিনি এবারও তাকে সময় দিলেন কিন্তু পূর্বের মত এবারও সে অন্য কোথাও চলে গেলো এবং এক বছর পর ফিরে এলো। এমনিভাবে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-তাকে সাতবার সময় দিলেন এবং সাত এবারই অন্যত্র যেয়ে এক বছর পর দেশে ফিরে আসতো। কিন্তু এজন্য ইমাম সাহেব কখনও তার প্রতি কটুবাক্য ব্যবহার করেননি। শেষ বার যখন সে ফিরে এলো তখন সে বলতে লাগলো, আপনার মজহাব-এর আদর্শ দেখে দুঃখ হয় যে, এত পরিচ্ছন্ন আদর্শ দেখেও মানুষ গ্রহণ না করে থাকতে পারে কি করে? সে আবেদন করলো, হযরত আপনি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। হযরত তাকে ইসলামে দীক্ষা দিলেন। এই ঘটনা বলা শেষ করে হযরত খাজা ওসমান হারুণী (রহঃ) বলতে লাগলেন যে, ঐ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল যার জন্য ইমামকে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি মেহেরবান করে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন লোকটি তাঁর মেহেরবানীর মর্যাদা মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে প্রদান করলো। এই পর্যন্ত বলা শেষ করে তিনি আল্লাহ্‌তে মশগুল হলেন। আমি ফিরে এলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ আলা জালেক।

আলোচনা মুসিবত সম্বন্ধে শুরু হলো। খাঁজা ওসমান হারুণী কুদ্দেস সেররুহুল আজীজ বললেন, হযরত আবদুল্লাহ আনসারী রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন মুসিবত (বিপদাপদ, দুঃখ-দুর্ঘটনা)-এর সময় যে বিলাপ ও চিৎকার করে সে কাফের। তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাঁর নাম মুনাফেকদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। আল্লাহ্‌তায়ালার লা'নত (অভিশাপ) তার উপর অবতীর্ণ হয়। মুসিবতে চিৎকার করা ইবলিশ (শয়তান)-এর কাজ। যে বিপদ-আপদে ক্রন্দন বা চিৎকার করে তার শত বছরের সুকর্মফল নষ্ট হয়ে যাবে এবং শত বছরের গুনাহ তার আমল-নামায় লেখা হয়। এই সময়ের মধ্যে তওবা (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) না করে মৃত্যু হলে দোজখে ইবলিশের সঙ্গে স্থান হবে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা ইব্রাহিম বিন আদহম বলখী (কুঃ সেঃ) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে পিছন দিক হতে ক্রন্দন ও চিৎকার শুনতে পেলেন। পিছনে পিছিয়ে যেয়ে বিলাপকারীর দেখা পেলেন। তিনি তাকে দেখে ফিরে চলে এলেন এবং এসে এধরনের কৌতুহলের জন্য নিজের নফসকে এমন শাস্তি দিলেন যে ২০ বছর পর্যন্ত এ ধরনের দৃশ্য দেখা ও শোনা থেকে বিরত রইলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের কানের মধ্যে সীসার গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে শ্রবণপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি মুসিবতে ক্রন্দন করে আল্লাহ তায়ালা হাশরের দিন তাকে রহমতের নজরে দেখবেন না এবং দোজখের মধ্যে তার কঠিন শাস্তি হবে। অন্যত্র বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং বিলাপ করে হাশরের দিন তার উভয় আবরণের মধ্যেই লেখা থাকবে, এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমতকে বিশ্বাস করতো না'। পুনরায় বললেন, যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টের সময় নিজের মুখ কালো করে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য দোজখের মধ্যে একটা প্রকোষ্ঠ তৈরী করা হবে এবং তার কোন এবাদত কবুল হবে না। এ ছাড়াও ৭০ জন মুসলমান হত্যার গুনাহ তার আমলনামায় (কর্মফলে) লিখা হয়। আসমান ও জমিনের ফেরেস্তাগণ তার উপর লা'নত (অভিসম্পাত) দেয়।

অতঃপর পিপাসার্তকে পানি পান করানোর বিষয়ের উপর আলোকপাত করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি পিপাসার্তকে পানি পান করাবে সে গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়, যেন সদ্যজাত শিশু, মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ট হয়েছে। যদি ঐ দিন তার মৃত্যু হয় তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আরও এরশাদ করলেন, যদি কেউ কারও পিপাসা নিবারণে শরবত পান করায় আল্লাহ তায়ালা তার হাজারো বাসনা পূর্ণ করেন এবং সে দোজখের অগ্নি হতে মুক্তি পাবে ও বেহেস্ত লাভ করবে।

পরের বক্তব্য ছিলো কন্যা সন্তান সম্বন্ধে। তিনি এরশাদ করলেন, কন্যা সন্তান আল্লাহর নিকট হতে বান্দাদের জন্য উপহারস্বরূপ। প্রত্যেকের উচিত কন্যা সন্তানকে মর্যাদা দেয়া। যে ব্যক্তি কন্যাদের মর্যাদা রক্ষা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুখ-শান্তিতে রাখেন। যার ঘরে দুটো কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকলে ৮০টি হজের সওয়াব প্রদান করা হয়। তার মর্যাদা ঐ ব্যক্তির মর্যাদার চেয়েও উচ্চে যে ব্যক্তি ৭০ জন গোলামকে (ক্রীতদাস) মুক্ত করেছে। যার ঘরে একজন কন্যা সন্তান আছে আল্লাহ তায়ালা দোজখকে তার নিকট হতে পাঁচ শত বছরের রাস্তার দূরত্বে রাখে। এরপর এরশাদ করলেন, আমাদের নবী করিম (সাঃ) কন্যা সন্তানকে বন্ধু মনে করতেন এবং তিনিও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতেন যারা কন্যা সন্তানকে বন্ধু মনে করে। যখন হযরত খাজা (রহঃ) বক্তব্য শেষ করে আল্লাহতে মশগুল হলেন তখন দোয়া প্রার্থী নিজের যায়গায় ফিরে এলো।

আলহামদুলিল্লাহে আলা জালেক।

একাদশ মজলিস

এবার বক্তব্য শুরু করলেন পশু জবাই করা সম্বন্ধে। এরশাদ করলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিঃ) হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ) হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন, যে ব্যক্তি ৪০টি গাভী জবাই করে, একটা খুন বা হত্যার অপরাধ তার নামে লেখা হয় এবং যে ব্যক্তি ১০০টি ছাগল জবাই করে, তার নামেও একটা খুনের অপরাধ লেখা হয়। যে নফসের প্ররোচনায় পশু বধ করে তার অবস্থা এমন হবে যেন সে কা'বা শরীফ ধ্বংস করতে সাহায্য করলো। কিন্তু এগুলো সেই কারণেই জবাই করা উচিত যে সব কারণে জবাই করার বিধান রয়েছে।

এরপর এরশাদ করলেন, আমি আমার পীরের মুখে শুনেছি তিনি আবদুল্লাহ মোবারক নামের এক বুজুর্গের কথা বলতেন, যাঁর বয়স ৭০ বছরের মতো ছিলো। তিনি বলতেন, আমার ৭০ বছরের জীবনে কখনও কোন পশু জবাই করিনি। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) বলেছেন,—কোন পশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা উচিত নয় কারণ আগুন আল্লাহর আযাব। যদি কোন ব্যক্তি পশুকে আগুনে নিক্ষেপ করে তার প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) হলো, একজন কৃতদাসকে মুক্ত করে দেয়া অথবা ৬০ জন মিসকীন (দীন-দুঃখী)-কে আহার করানো অথবা ৬০টি রোজা রাখা। যে ব্যক্তি এ প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারা আদায় করবেনা সে কেয়ামতের দিন হকতায়ালার আযাবে পতিত হবে। এরপর এরশাদ করলেন পয়গম্বর (সাঃ) বলেছেন পশুকে আগুনে ফেলোনা। আল্লাহ্‌তায়ালা এই ধ্বংসশীল দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবকে ভয় করো। পশুকে আগুনে নিক্ষেপ করলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখতে হবে। কেননা পশুকে আগুনের মধ্যে ফেলা এমন গুনাহ, যেমন মায়ের সঙ্গে জেনা করা।

এরপর হুজুর নামাজ সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, এ রাস্তায় এমন অনেক শক্তিধর মহাপুরুষ আছেন যাঁরা নামাজের রুকু সেজদাতে আল্লাহর নিকটক হতে লাব্বায়েক আবদি (অর্থাৎ হে আমার বান্দা আমি উপস্থিত) না শোনা পর্যন্ত রুকু ও সেজদাহ, হতে মাথা উত্তোলন করেন না। আমি সলুকের কিতাবে লিখা দেখেছি যে, একবার খাঁজা জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) এবং শায়ক শিবলী (রহঃ) নতুনভাবে ওজু করার জন্য দজলা নদীতে যেয়ে 'ওজু করতে বসলেন এমন সময় এক কাঠুরিয়া পিঠ থেকে কাঠের বোঝা নামিয়ে 'ওজু করতে লাগলেন। হযরত শিবলী এবং জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) 'ওজু শেষ করে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেন কাঠুরিয়াকেও কিন্তু একজন উঁচুদরের বুজুর্গ (আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি) বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর 'ওজু শেষ হলে এরা দু'জনে তাকে পেশ ইমাম হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি নামাজ পড়ান। তিনি নামাজ আরম্ভ করলেন, কিন্তু রুকু ও সেজদাতে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নামাজ শেষ হলে এরা উভয়ে তাঁকে রুকু ও সেজদাতে এত দীর্ঘ সময় ব্যবহার করার কারণ কি জানতে চাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি রুকু ও সেজদাতে প্রত্যেকটি তসবীহ পাঠ করার পর যতক্ষণ না লাব্বায়েক 'আবদি' শুনতাম ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় তকবীর বলতাম না। এটাই ছিলো রুকু ও সেজদাতে দেরী করার কারণ। এ কথা শ্রবণ করার

পর উভয় বুজুর্গের চোখেই অশ্রু দেখা দিলো এবং কেঁদে ফেললেন। শেষে একে অপরজনকে বললেন, এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রেমিক ও আল্লাহতায়ালার নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের নিদর্শন। যে পর্যন্ত হুজুরী কলবে (সমস্ত জাগতিক চিন্তা বিবর্জিত অবস্থায়) নামাজ না হবে সে পর্যন্ত তাঁরা সেটাকে নামাজের মধ্যেই গণনা করেন না। এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা ইউসুফ চিশ্‌তী কুদ্দেসু, সের রহুল আজীজের জীবিত সময়ে আমি তাঁর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, তিনি বলতেন –

হর বার কে দর নামজ মশগুল শোয়াম
চুঁ দোস্ত হুজুর নিস্ত আনিস্ত নামাজ

অর্থ প্রত্যেকবার আমি নামাজে বিলীন হই।
যখন বন্ধু উপস্থিত থাকে না, উহা নামাজ নয়।

এরপর এরশাদ করলেন, খাঁজা ইউসুফ চিশ্‌তী (রহঃ)-এর রসম বা রীতি ছিল নামাজে যখন দাঁড়াতেন তখন ১০০০ বার তকবীর (আল্লাহ আকবার) বলতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে নামজের উপযোগী মনে না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আরম্ভ করতেন না এবং যখন ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাসতায়ীন পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন এ আয়েতকে কয়েকবার পাঠ করে তারপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করতেন। এরপর এরশাদ করলেন, খাঁজা শামসিল আরেফীন বড় বুজুর্গ ছিলেন। একবার তিনি রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর রওজা মোবারকে পৌঁছে সালাম নিবেদন করলেন, "আস্‌-সালামু আলায়কুম ইয়া সায়্যেদুল মুরসালিন" রওজা মোবারকের অভ্যন্তর হতে আওয়াজ এলো, ওয়া আলায়কুমুস্‌সালাম ইয়া শামসিল আরেফীন" এরপর হতেই তিনি শামসিল আরেফীন নামে সর্বত্র পরিচিত হয়ে গেলেন। প্রত্যেকেই তাকে তখন হতে শামসিল আরেফীন বলে ডাকতেন। এরপর এরশাদ করলেন অনুরূপ ঘটনা হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর সঙ্গেও ঘটেছে যখন তিনি ঐশী পরশে আপ্লুত হয়ে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মোবারকে গমন করে সালাম আবেদন করলেন, "আস্‌ সালাতু আস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া সায়্যেদুল মুরছালিন" উত্তরের শব্দ ভেসে এলো, "আলায়কা আস্‌সালাম ইয়া ইমামুল মুসলেমিন।" এ সময় হতেই তিনি ইমামুল মুসলেমিন অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এরপর, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)-এর উপাধি লাভের ঘটনা বর্ণনা করলেন। একদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে হযরত বায়েজীদ (রহঃ) যখন বালাখানায় (উপর তলার কক্ষে)

গমন করলেন তখন চন্দ্র কিরণে ধরণী ছিলো আপ্লুত এবং বিশ্ব ছিলো ঘুমিয়ে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হচ্ছিলো অম্বরে। তিনি এ দৃশ্য অবলোকন করে বললেন, "আফসুস! এ মধুময় ও আনন্দঘন ক্ষণে মানব সন্তানগণ নিদ্রায় নিমগ্ন।" মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠলো এবং ভীত হয়ে পড়লেন। ইচ্ছা জাগলো দোয়া করতে যাতে মানুষ এ স্বপ্নরাজ্য হতে বাস্তবে ফিরে এসে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো, এ রকম ভয় পাওয়ার তার উচিত নয়, কারণ এ কাজ খাঁজায়ে আলম (সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত মহাপুরুষ) হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর শাফায়াতের স্তরে নিবদ্ধ, এখানে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং আমার উচিত নয় তাদের জন্য দোয়া চাওয়া। এ চিন্তা করার সাথে সাথেই ঐশী আওয়াজ ভেসে এলো, হে বায়েজীদ, আমার হাবীবের (বন্ধুর) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আমি তোমাকে "সুলতানুল আরেফীন" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। আমি স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

দ্বাদশ মজলিস

সালাম করার বিষয়ে জ্ঞান দান করলেন। বললেন, যখন মজলিসে প্রবেশ করবে, সালাম করে প্রবেশ করবে এবং যখন মজলিস ত্যাগ করবে তখন সালাম করে তারপর বেরুবে। কেননা সালাম গোনাহের কাফফারা (পাপের প্রায়শ্চিত্ত) হিসেবে পরিগণিত হয়। ফেরেস্তাগণ সালাম প্রদানকারীর জন্য ক্ষমা চায় এবং আল্লাহতায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হয়। তার পূণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা ইউসুফ চিশ্‌তী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি মজলিসে সালাম করে প্রবেশ করে এবং সালামের সাথে নির্গত হয় হাজার নেকী তার আমল নামায় লেখা হয়, আল্লাহ তায়ালা তার হাজার বাসনা পূর্ণ করেন এবং গোনাহ হতে এমন ভাবে পবিত্র হয়, যেন সে সদ্য মাতৃ জঠর হতে ভূমিষ্ঠ হলো। এ ছাড়াও এক বছরের এবাদত এবং শত ওমারাহ হজের সওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়। ও হাজার হাজার লোকের সম্মানের পাত্র হয়। এরপর এরশাদ করলেন যখন হযরত আদম (আঃ)-এর দেহ মোবারকে রুহ এলো তিনি তখন চিৎকার করে উঠলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) সামনে উপস্থিত ছিলেন তিনি তখন সালাম

দিলেন। এ সময় হতেই সালাম সমস্ত আম্বিয়া (আঃ)-দের সুন্নত। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি ছোট বেলা হতেই হযরত রসুলে খোদা (সাঃ)-এর খেদমতে আছি। সব সময়েই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম যে, কখন আমি তাঁকে সালাম নিবেদন করবো এবং তিনি তার জবাব দিবেন। কিন্তু কখনও সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি সালাম দেওয়ার পূর্বেই তিনি সালাম দিতেন এবং আমাকে তার উত্তর দিতে হতো।

এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর হযরত খাজা (রহঃ) যখন তন্ময় হলেন তখন আমি বিদায় নিয়ে স্বীয় স্থানে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহি আলা জালেক।

ত্রয়োদশ মজলিস

"কাজা" ও বাতিল নামাজের কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে আলোচনা শুরু করতে যেয়ে বললেন, হযরত আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন, যে ব্যক্তির নামাজ যোকামীর জন্য ফওত (মৃত্যু) হয় এবং সে জানে না যে কিভাবে 'ফওত' হয়েছে তাহলে তার উচিত সোমবার রাতে ৫০ রাকাত নামাজ পাঠ করা। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস একবার পাঠ করে নামাজ শেষে ১০০ বার আস্তাগফার পাঠ করবে এবং পূর্বের নামাজের কাফ্ফারা হিসেবে এ নামাজকে কবুল করার জন্য দোয়া চাইবে। আল্লাহ তায়ালা এই নামাজের বরকতে তাঁর সমস্ত কাজা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নামাজকে পুনর্জীবিত করেন। ১০০ বছরের কাজা হলেও পুনর্জীবিত হয়। এরপর এরশাদ করলেন, রাত্রি জাগরণ অতি উত্তম। সাধারণতঃ মানুষ রাতে শোয়ে থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেন, আগামী রাত পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে ২০ রাকাত নামাজ প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর একবার সূরা ইখলাস মিলিয়ে পাঠ করবেন আল্লাহ তায়ালা তাকে হাশরের দিন সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে উত্তোলন করবে এবং প্রতি রাকাতের জন্য বেহেস্তে একটি মহল দান করবেন। এছাড়াও পুলসেরাত পার হওয়ার জন্য মশাল দান করবেন। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি রাতে উটের এক নিঃশ্বাস পরিমাণ সময় পর্যন্ত এবাদত করে সে ৬০টি ওমরাহ হজ্বের সওয়াব পাবে। রহমতের

দরজা তার উপর প্রসস্ত করা হয়। এরপর এরশাদ করলেন, যখন আমি খানা কাবাতে ছিলাম তখন একজন বুজুর্গের সাথে দেখা হয়েছিলো, যিনি ঐশী আলোকে আলোকিত ছিলেন, প্রতি রাতে ফজরের পূর্বে দু'বার করে কোরান শরীফ খতম করতেন। এরপর এরশাদ করলেন, সমরকন্দে আবদুল ওয়াহেদ সমরকন্দী নামে এক বুজুর্গের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো তিনি অতি উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন যে ব্যক্তি রাতে বন্দেগী করেনা তার ঈমানই নষ্ট হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি দিনে রোজা রাখেনা তার অবস্থাও প্রথম ব্যক্তিরই অনুরূপ। দিনে রোজা রাখা এবং রাতে বন্দেগী করা ঈমানের পরিপূর্ণতায় অত্যন্ত ফলোদয়ের কারণ ঘটায়। এরপর এরশাদ করলেন, কিয়ামে শব (রাতে দাঁড়িয়ে থাকা) এক প্রকার নূর। দুনিয়ায় সে নূর লাভ করতে পারলে আখেরাতের ঠিকানা নির্দ্ধারণ করা যায়। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত থেকে বন্দেগী করে, সে ব্যক্তি মুস্‌তাজাবুদ্দাওয়াহ্ (যার দোয়া গৃহীত হয়) হয় এবং বেহেশত তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আশা পোষণ করে। আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট ও রাজি থাকেন। এরপর এরশাদ করলেন, ভ্রমণের পথে বোখারায় আমার সঙ্গে আরও একজনের সাক্ষাৎ হয়েছিলো তাঁর বুজুর্গী ও মর্যাদা ছিলো বর্ণনাতীত। বেশ কিছু দিন তাঁর সোহবতে (সঙ্গে) ছিলাম কোন রাতও তিনি কিয়াম (দাঁড়িয়ে এবাদত করা) হতে বিরত থাকতেন না। তিনি সুদীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত এমন ভাবে দাঁড়িয়ে এবাদত করেছেন যার ফলে মাটি তাঁর হাতের স্পর্শ পর্যন্ত পায়নি। হযরত এ অমিয়-বাণী পেশ করার পর মশগুল হলেন। আমি চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ অলা জালেক।

চতুর্দশ মজলিস

সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস সম্বন্ধে কথা শুরু করলেন। হুজুর এরশাদ করলেন হযরত খাঁজা শায়খ ইউসুফ চিশ্‌তী কুদ্দেসু সেররুহুল আজিজ তাঁর রচনায় বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস তিনবার করে পাঠ করে হাশরের দিন আল্লাহ তাঁয়ালা তাকে আমার উম্মতের মর্যাদা দান করে উত্তোলন করবেন পয়গম্বরদের পরে সেই ব্যক্তি বেহেস্তে প্রবেশ করবে এবং তার আগে আর কেউ যেতে পারবে না। তাছাড়াও বেহেস্তে সে হযরত ইসা (আঃ)-এর প্রতিবেশী

হিসেবে স্থান পাবে। এরপর এরশাদ করলেন খাঁজা আবু মুহম্মদ মিরাশ (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি তিনবার করে এখলাস এবং ফাতেহা পড়বে তার সমস্ত গুনাহ্ এমনভাবে দূর হয় যেন সদ্যজাত ভূমিষ্ট শিশু। এরপর এরশাদ করলেন হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) লিখেছে হযরত ইবনে ওমর (রাদিঃ)-এর হতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি শোয়ার সময় সূরা কাফেরুন পাঠ করে হাজারো ফেরেস্তা তার বেহেস্তী হওয়ার সংবাদ প্রদান করেন। এরপর এরশাদ করলেন, এক সময় আমি আমার পীর ও মুর্শেদের সঙ্গে বদখ্শানের পথে চলছিলাম, একজন বুজুর্গের সাথে আমাদের দেখা হলো, যিনি অত্যন্ত বিলয়প্রাপ্ত ছিলেন। আমি তাঁর নিকট শুনেছি যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পর দু' অথবা চার রাকাত নামাজ পরে সে ওমরাহ হজ্বের সওয়াব লাভ করে। আরও বললেন, রসুলে মকবুল (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পর ২ অথবা ৪ রাকাত নামাজ পাঠ করে তার মর্যাদা পৃথিবীর সমস্ত রত্নভাণ্ডার বিলিয়ে দেয়ার চেয়ে কম নয়।

এখানেই হুজুর তাঁর কথা শেষ করে আল্লাহ্‌তে বিলীন হলেন। আমি আমার কুটিরে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

পঞ্চদশ মজলিস

আহলে জান্নাত (বেহেশ্‌ত্‌বাসী)-দের প্রশংসা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলেন। তিনি এরশাদ করলেন যে, তফছীরে ইমাম শা'ফী-তে বর্ণিত আছে যে হযরত রসুলে খোদা (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করা হয়েছিলো, "আপনি আমাদেরকে বেহেশ্‌ত্‌বাসীদের খাওয়া-পড়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করুন।" হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এরশাদ কলেন, কসম সেই জুল্‌জালে ওয়াল একরাম (শপথ সেই মহামহিম ও মহানুভব)-এর যিনি আমায় রসুল বানিয়েছেন, বেহেস্তে মানুষ ১০০ বার করে প্রতিদিন আহার করবে এবং ১০০ বার স্বীয় পরিবারের সঙ্গলাভ করবে। মজলিস হতে একজন বিনয়াবণত হয়ে বললেন, "ইয়া (হে) রাসুলাল্লাহ, এধরণের খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী কাজায়ে হাজত (মলমূত্র ত্যাগ-করা) -এর প্রয়োজনও দেখা দিবে কি? হুজুর বললেন না, এধরনের কোন অবস্থার সৃষ্টি হাবনা বরং খাওয়ার পরে পেট হতে বায়ু নির্গত হয়ে পেট খালী হয়ে

যাবে, যার সুগন্ধ মৃগনাভীর (মুশক) সুগন্ধকেও হার মানাবে। এরপর এরশাদ করলেন, বেহেস্তবাসীগণ অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবে কখনও মরবেনা, চির-যৌবন লাভ করবে কখনও বৃদ্ধ হবেনা। চিরকাল প্রফুল্ল থাকবে কখনও দুঃখিত হবেনা। নিত্য নতুন নেয়ামতও লাভ করবে। যে ব্যক্তি এ পুরস্কার লাভ করতে চায়, তার উচিত জুমা'র দিন জুমা'র নামাজের পর ১০০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করা। তাহলেই সে এ অনুদান লাভ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি প্রতি জুমাতেই এই আমল করবে তার সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত রসূলে খোদা (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লোক নিজের মা বাবাকে সেখানে দেখতে পাবে কি পাবে না। তিনি জানালেন দেখতে পাবে এবং সাক্ষাৎও করতে পারবে। পরে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "জান্নাতু আদনিয়্যাদখুলুনাহা ওয়া মান ছালাহা মিন আবা-য়েহিম ওয়া আজওয়াজিহিম ওয়া জুররিয়াতেহিম ওয়াল মালায়েকাতু ইয়াদখুলুনা আলাইহিম কুলে বাব। অর্থাৎ থাকার বাগান আছে সেখানে, প্রবেশ করবে পুণ্যবান লোক মাতা-পিতা, সন্তান ও স্ত্রীগণ এবং ফেরেস্তা প্রতি দরজা দিয়ে তাদের নিকটে আসবে। এরপর এরশাদ করলেন, একজন অপরজনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ঘোড়ায় চড়ে তাদের মহলে যেতে পারবে। হযরত খাঁজা এ পর্যন্ত বলে বিলয়প্রাপ্ত হলেন। আমিও প্রত্যাবর্তন করলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

ষোড়শ মজলিস

কথা বললেন মসজিদ সম্বন্ধে। হুজুর এরশাদ করলেন, যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন প্রথমে ডান ও পরে বাম পা প্রবেশ করাবে এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে — বিসমিল্লাহে ওয়া তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহে আউজুবিল্লাহে মিনাশ, শায়তোয়ানের রাজিম। এ দোয়া হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) হযরত আলী (কঃ)-কে শিখিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার নামাজ কবুল করেন এবং তার প্রতি রাকাত নামাজের জন্য ৭০ রাকাত নামাজের সওয়াব প্রদান করেন এবং প্রতি পদক্ষেপের জন্য বেহেস্তে প্রাসাদ দান করবেন। এরপর এরশাদ করলেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার সময় আউজুবিল্লাহে মিনাশ, শায়তোয়ানের রাজিম পাঠ করে তখন ইবলিস দুঃখ করে বলে যে, এ লোক আমার

পিঠ ভেঙে দিয়েছে। ঐ দোয়া পাঠকারীর আমলনামায় ১ বছর এবাদতের ছওয়াব প্রদান করা হয়। বাহির্গমনের সময়ও যদি উক্ত দোয়া পাঠ করে তাহলে বেহেস্তে তার জন্য ১০০টি দরজা তৈরী করা হবে এবং শরীরের লোমের পরিমাণ সংখ্যক সওয়াব লাভ করবে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত ইমাম জিশ্‌তোসী (রহঃ) স্বীয় পুস্তকে বর্ণনা করেছেন মুমেন যখন মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা প্রথমে প্রবেশ করায় তখন ফেরেস্তাগণ বলতে থাকে যে, হে আল্লাহ্ একে চিরস্থায়ী-বেহেস্তে স্থান দিও। বেরুবার সময় যখন সে বাম পা প্রথমে বের করে তখন ফেরেস্তাগণ বলতে থাকে যে, হে এলাহি এর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও।

এ পর্যন্ত বলেই তিনি আল্লাহ্‌তে বিভোর হলেন। আমি আমার নিজ যায়গায় ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ্ আলা জালেক

সপ্তদশ মজলিস

হুজুর এবার কথা বললেন দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পত্তি সঞ্চয় করা সম্বন্ধে। এরশাদ করলেন, প্রথমে যানা উচিত দুনিয়া কি জিনিস এবং এর মাল সঞ্চয় করার অর্থ কি? দুনিয়ার প্রতি কোন ক্রমেই কোন পুণ্যাত্মা অথবা প্রেমিকের উচিত নয় আশক্ত হওয়া বরং তার উচিত যা কিছু তার কাছে আছে তা যেন সে খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দেয়। কোন অবস্থাতেই কোন বস্তুর মোহে আবিষ্ট হওয়া তার উচিত নয়। এরপর বললেন, হযরত খাঁজা ইউসুফ চিশ্‌তী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি তিনি বলছেন, "মালের কৃতজ্ঞতা (শুকুর) প্রকাশ করা হয় দুনিয়া ত্যাগের মাধ্যমে এবং ইসলামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন বললে"। যে ব্যক্তি সর্বাবস্তায় আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন বলে সে ইসলামের প্রাপ্য প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি জাকাত দেয় সে মালের (শুকুরানা) কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

পরে বললেন বালকদের খারাপ অভ্যাস সম্বন্ধে। এরশাদ করলেম, কান্নার সময় বাচ্চাদেরকে মারতে নেই। কারণ ঐ সময় শয়তান তার কান মলে, ভয় দেখায় ও কষ্ট দেয়। এ অবস্থায় তার পিতা-মাতা অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি তাকে মারবে তার জন্য তাকে গোনাহগার হতে হবে। এরপর এরশাদ করলেন হাদীস

শরীফে উল্লেখ আছে যে, যখন বাচ্চা কাঁদে তখন বাচ্চাকে মারা অন্যায় বরং তার কানে লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যেল আযীম শুনাও, কেননা এতে তার কান্না বন্ধ হবে এবং শয়তান পালিয়ে যাবে। তিনি এ সমস্ত বাণী বর্ণনা করে বিলয়প্রাপ্ত হলেন এবং আমিও বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

অষ্টাদশ মজলিস

হযরত হাঁচি সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, যখন কোন মুমেন বান্দা হাঁচি দিয়ে আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন বলে তখন আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন এবং ঐ বান্দার জন্য বেহেস্তে একটা প্রাসাদ তৈরী করেন, যার মধ্যে একটা গাছ থাকবে এবং সে গাছের উপর সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী একটা পাখী বসে থাকবে। একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার ছওয়াবও এরসঙ্গে তার আমলনামায় লেখা হবে। এরপর সে যদি দ্বিতীয় হাঁচি দিয়েও আল্‌হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন বলে তাহলে খোদাতায়ালা তার পিতা-মাতার সমস্ত গোনাহও ক্ষমা করে দেন। যদি সে তৃতীয়বার হাঁচি দেয় তাহলে ভাববে এটা সর্দির প্রতিক্রিয়া। মোসলমানদের জেনে রাখা উচিত যে হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) করা হয় এবং আত্মিক উন্নতিও ঘটে। যে ব্যক্তি হাঁচির জবাবে দিবে রোজ হাশরে সে নবী (আঃ)-দের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং বেহেস্তে হাজার হুর লাভ করবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তির প্রথম হাঁচি আসে, সে হচ্ছেন হযরত আদম আলায়হেস্‌ সালাম এবং যে ব্যক্তি প্রথম হাঁচির জবাব দেন, তিনি হচ্ছেন হযরত জিব্রাইল (আঃ)। হযরত আদম (আঃ) যখন আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন বললেন, তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললেন। এরপর এরশাদ করলেন, আতিয়া নামে একটা পর্দা দোজখের মাঝে আগুনকে আড়াল করে রেখেছে। যখন কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় তখন সে ঐ পর্দার নিকটবর্তী হয় এবং যখন হাঁচির 'শুকুর' আদায় করে তখন সে ঐ পর্দা হতে বহুদূরে সরে আসে।

এ অমিয়-বাণী বলা শেষ করে হুজুর আল্লাহতে বিলীন হলেন এবং আমি আমার কুটিরে চলে এলাম।

উনবিংশ মজলিস

আযান সম্বন্ধে হুজুর তাঁর অমিয়-বাণী পেশ করলেন, বললেন হযরত আমিরুল মুমেনীন আলী (রাঃ) এরশাদ করলেন যে, আমি হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) হতে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জেনেছি তিনি বলেছেন, "হে আলী যে ব্যক্তি আযান দেয় তার ছওয়াব সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই ভাল অবগত আছেন। আযানের অর্থ এই যে, যখন মুয়াজ্জেন আল্লাহু আকবর বলে, তার অর্থ হলো আল্লাহতায়ালা অত্যন্ত মহান। (উদ্দেশ্য) হলো, আমি তার সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত কর্ম হতে বিমুক্ত হয়ে তোমার নামাজের জন্য উপস্থিত হয়েছি। আশহাদু আল লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে "হে উম্মতে মুহম্মদ (সাঃ জেনে রাখ আমি ফেরেস্তাদেরকে সাক্ষী মনোনীত করছি এবং তোমাদেরকে খবর দিচ্ছি আমাদের সময়ে নামাজ হতে উত্তমতর কিছুই নেই। যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ বলে তখন উপলব্ধি করতে হবে যে, হে উম্মতে মুহম্মদ (সাঃ) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল এবং প্রেরিত হয়েছেন সত্যকে সঙ্গে নিয়ে। যখন হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ বলে, তার অর্থ হলো হে উম্মতে মুহম্মদ (সাঃ) তোমাদের উপর আমি প্রচার করে দিয়েছি, এখন তোমাদের উচিত আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রসুলের অনুগত হওয়া। কেননা নামাজের প্রতিদানে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেন, কারণ নামাজ ধর্মের স্তম্ভ। এরপর হাইয়্যা আলাল ফালাহ, ; যার অর্থ হে উম্মতে মুহম্মদ বেহেস্তের দরজা খোলে দেওয়া হয়েছে উঠ এবং নিজের ভাগ্য নির্ণয় কর এবং আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত হাসেল কর। এ কাজ দুনিয়া ও আখেরাতের চেয়ে উত্তম। যখন আল্লাহু আকবর বলে তখন বুঝবে যে স্বীয় আত্মার উপর করুণা বর্ষিত হয় এবং এ হতে উত্তম বস্তু কিছুই নেই। যে ব্যক্তি নামাজ আদায় না করে সে দুর্ভাগাদের অন্তর্গত হয়। যখন লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে তখন বুঝবে যে সাত আসমান জমিনের আমানত তোমার (মুয়াজ্জেনের) গর্দানের উপর বোঝা স্বরূপ; যদি এ আযান কবুল হয় তাহলে মুক্তিপেলে।

নামাজ পাঠ করলে গোনাহের কাফফারা এবং আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য স্বীকার করা হয়। যার আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য মঞ্জুর হয়েছে সে মসজিদে যেয়ে নামাজ আদায় করে। পরকালে সিদ্দিক ও শহীদের সঙ্গে একসাথে থাকার অধিকার লাভ করে এবং বেহেস্তে হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্য হয়।

এরপর এরশাদ করলেন, মুয়াজ্জিনের আযানের জবাব দেয়া কিয়ামতের দিনে মুক্তির সনদ স্বরূপ। যে ব্যক্তি জামাতে নামাজ পাঠ করে তার প্রতি রাকাতের জন্য ৩০০ রাকাত নামাজের সওয়াব পাবে এবং উত্তম বেহেস্তে সংখ্যাতীত মহল লাভ করবে। হযরত খাঁজা এ সব বর্ণনা করে আল্লাহ্‌তে মশগুল হলেন। আমি বিদায় নিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ্ আলা জালেক।

বিংশ মজলিস

মুমেনদের হকিকত (যথার্থতা) সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, মুমেন তাকেই বলা চলে যে তিনটি জিনিসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে—(১) দরবেশী (২) অসুস্থতা (৩) মৃত্যু। যে ব্যক্তি এ তিনটি জিনিসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে ফেরেস্তাগণও তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় করুণা দ্বারা আবৃত করবে এবং তার বাসস্থান হবে উত্তম বেহেস্তে। এরপর এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা মুমেনদেরকে বন্ধুত্ব দান করেন এবং মুমেনগণও আল্লাহ্‌কে বন্ধু মনে করেন। এরপর এরশাদ করলেন হযরত আনিস বিন মালিক (রাদিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির নিকট ৬০,০০০ দিরহাম আছে, সে ধনীদের মধ্যে গণ্য হয় এবং যার কাছে এর চেয়ে কম আছে সে মুফলেসীন (গরীব)। যে ব্যক্তির নিকট কিছুই নেই তার উচিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ সে হযরত আয়ুব (আঃ)-এর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে গণ্য হয়। এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে হাশরের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা তিনটি দলকে রহমতের নজরে দেখবেন এবং তারা আরশে আযীমের নীচে ছায়ায় থাকবে।

প্রথম দল : যাদের চোখ সব সময় অশ্রুতে ভেজা থাকে।
দ্বিতীয় দল : ঐ সব স্ত্রীলোক যাদের প্রতি তাদের স্বামীরা পরিতৃপ্ত।
তৃতীয় দল : ঐ সব লোক যারা দরবেশ ও মিসকিনদের আহার করায়।

এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে খুশী রাখবে সে ব্যক্তি বেহেস্তে হযরত রসূলে মকবুল (সঃ)-এর প্রতিবেশী হবে এবং যে ব্যক্তি প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিবে সে অভিশপ্ত (মাল'উন)। যে ব্যক্তি নবী করিম (সাঃ)-এর আহ্‌লে বয়াত (পরিবারবর্গ)-কে বন্ধু মনে না করে সে মুনাফিক (প্রবঞ্চক)। এরপর এর-

শাদ করলেন আমলের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে নামাজ তারপর সদকা (দান) তারপর কোরান শরীফ পাঠ করা।

হযরত খাঁজা বর্ণনা শেষ করে মশগুল হলেন। আমিও স্বস্থানে চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

একবিংশ মজলিস

অভাব পূরণের ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণ করে আল্লাহতায়ালা তাকে বন্ধুত্ব ও বেহেস্ত দান করেন। যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে সম্মান দেয় তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পথের কাঁটা এই নিয়েতে পরিষ্কার করে যে, কোন মুসলমানের পায়ে বিঁধলে কষ্ট পাবে, আল্লাহ তায়ালা হাশরের দিন তাকে সিদ্দিকীন ও শহীদগণের সঙ্গে উত্তোলন করবেন। এরপর এরশাদ করলেন, আমদের শ্রেষ্ঠ মাশায়েখ হতে বর্ণিত আছে যদি কেহ ওজিফাতে মশগুল থাকে এবং তখন কোন অভাবগ্রস্ত লোক তার কাছে আসে তাহলে তার উচিত ওজিফা ছেড়ে দিয়ে তার প্রতি মনযোগ দেয়া এবং নিজের সামার্থানুযায়ী তার অভাব পূরণ করার চেষ্টা করা। আল্লাহতায়ালা তাকে এর প্রতিদানে আশাতীত ফল দান করবেন।

এখানে পৌঁছেই হুজুর নিশ্চুপ হলেন। আমি আমার কুটীরে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

দ্বাবিংশ মজলিস

আখেরী জমানা বা শেষ জমানার অবস্থা সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আখেরী জমানায় লোক আমার দলভুক্ত আলেমদেরকে প্রাণে মেরে ফেলবে ; যেভাবে চোর এবং ডাকাতদেরকে মারা হয়। ঐ সময় লোক আলেমদেরকে মুনাফেক এবং মুনাফেকদেরকে আলেম মনে করবে। সে সময়ের জীবন মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্টতর হবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে (জন্যে) জ্ঞান অর্জন করবে সে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং কিয়ামতের ময়দানে হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ)-এর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এরপর এরশাদ করলেন, জ্ঞান বিস্তারের জন্য শিক্ষার

পথে শিক্ষার্থীকে এক টাকা দান করা হাজার বছর এবাদতের চেয়েও উত্তম। সে হাজার বছরের এবাদতের সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য এক পা অগ্রসর হয় আল্লাহতায়ালা তার জন্য বেহেস্তে ১০০টি ঘর দান করেন এবং ১০০টি হুরও অনুদান পাবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানের পুস্তক প্রণয়ন করে আল্লাহতায়ালা হুকুম দেন তার নাম আমার জুব্বার নীচে অবস্থিত আউলিয়াদের দফতরে (খাতায়) লিখে নাও। ফেরেস্তা তখন তার নাম আউলিয়াদের দফতরে লিখে নেয়। হযরত এ অমিয়-বাণী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌তে বিলীন হলেন। আমি চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

ত্রয়োবিংশ মজলিস

মৃত্যু-চিন্তা করার বিষয়ে জ্ঞান দান করলেন। বললেন হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন মৃত্যুকে স্মরণ করা দিবা-রাত্র বন্দেগীর চেয়ে উত্তম। এর-পর বললেন যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ করে সে তার কবরকে বেহেস্তের বাগানের মতো একটা বাগান হিসেবে পাবে। উত্তম কাজ হচ্ছে সব সময় মৃত্যু চিন্তা করা ও আম্বিয়া আলায়হেস্‌ সালামের প্রতি দরুদ পাঠ করা। যে ব্যক্তি এরূপ আমল করে আল্লাহতায়ালা তার গোণাহ মাফ করে দেন, যদি সে গোণাহ বনের বৃক্ষ হতেও অধিক হয় এবং তার জন্য দোজখ হারাম করে দেন। আল্লাহতায়ালা বেহেস্তে নবীদের সম্মুখে তার ঘর করে দিবেন।

বক্তব্য এখানে শেষ করে হুজুর মশগুল হলেন। আমি এজাজত (আদেশ) নিয়ে চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

চতুর্বিংশ মজলিস

মসজিদে আলোদান (চেরাগ) সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, আমিরুল মো'মেনীন হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) আছে, যে ব্যক্তি এক রাত্রির জন্য মসজিদে বাতি প্রদান করে আল্লাহতায়ালা তার ৭০ বছরের গোণাহ মাফ করে দেন এবং তার আমল নামায় ৭০ বছরের নেকী লেখা হয়। এছাড়াও

বেহেস্তে তাকে একটা প্রাসাদ দেয়া হবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বাতি দেয়া অব্যাহত রাখে আল্লাহতায়ালা তার দেহকে দোজখের আগুনের জন্য হারাম করে দেন এবং বেহেস্ত তার জন্য উন্মুক্ত হয়। সে তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পথ দিয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে এবং যে পর্যন্ত সে নিজের যায়গা বেহেস্তে অবলোকন না করবে সে পর্যন্ত মৃত্যু তার জন্য হারাম হয়ে যায়? এ ছাড়াও বেহেস্তে তাকে নবী (আঃ)দের বন্ধু বলে সম্বোধন করা হবে।

হুজুর এখানেই বলা শেষ করে আল্লাহতে নিমগ্ন হলেন। আমি নিজের ঘরে চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

পঞ্চবিংশ মজলিস

দরবেশদের সম্বন্ধে আলোচনায় বললেন, যে ব্যক্তি দরবেশদেরকে মেহমান রাখেন তার জন্য বেহেস্তের একটা দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং আখেরাতে সে ধনী হয়। যে ব্যক্তি, এ পথে টাকা-পয়সা খরচ করে অর্থাৎ দরবেশদের ভরণপোষণ করে এবং ঐ দানকে গোপন রাখে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এরপর এরশাদ করলেন তিনটি দল বেহেস্তের সুগন্ধও ভোগ করতে পারবে না। প্রথমঃ যে দরবেশ মিথ্যা কথা বলে। দ্বিতীয়ঃ যে ব্যবসায়ী অপরের ধন আত্মসাৎ করে। তৃতীয়ঃ যে ধনী কৃপণ। যখন দরবেশ মিথ্যা বলবে, ধনী কৃপণতা করবে এবং ব্যবসায়ী অপরের আমানত আত্মসাৎ করবে তখন আল্লাহতায়ালা জমিন হতে বরকত তুলে নেন। এ পর্যন্ত বলা শেষ করে হুজুর মশগুল হলেন এবং আমি নিজের আবাসে ফিরে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

ষষ্ঠবিংশ মজলিস

সালোয়ার (পাজামা, পিরহন (জামা) ও আস্তিন-এর ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, হযরত আমিরুল মু'মেনীন আলী করমুল্লাহ, ওজেহু হতে বর্নিত আছে যে, পাজামার পা লম্বা করা মোনাফেকের নমুনা। পাজামার পা যদি কোন ব্যক্তি পায়ের পাতা পর্যন্ত বড় করে তাহলে বুঝবে

যে, সে মুনাফেক এবং তার জায়গা হবে দোজখে। এরপর এরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তি পাজামার পা যদি পায়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি করে তাহলে চলার সময় সে অভিশাপ লাভ করে। ফেরেস্তাগণ আসমান জমীন হতে তাকে অভিসম্পাত করে। তার শরীরের লোমের সংখ্যা পরিমাণ দোজখে শাস্তির ঘর তৈরী করবে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাদিঃ) হতে রওয়ায়েত আছে, "যে ব্যক্তি লম্বা পাজামা পরিধান করে সে মোনাফেক এবং যার জামার আস্তিন বড় সে মালউন (অভিশপ্ত)।" এরপর এরশাদ করলেন, দু'টো দল সব সময় আল্লাহতায়ালার লা'নতের (অভিশাপের) শিকার হয়। প্রথমতঃ যারা লম্বা পাজামা পরিধান করে, দ্বিতীয়তঃ যারা জামার আস্তিন বড় রাখে। যে ব্যক্তি এ দু'টো কর্ম করে সে নিজের জন্য দোজখে ঘর তৈরী করে। এরপর এরশাদ করলেন, লম্বা পাজামা পরিধান করা এবং জামার আস্তিন বড় রাখা মেয়েদের জন্য জায়েজ (অনুমোদিত) আছে। এ সব বক্তব্য পেশ করার পর হুজুর মশগুল হলেন। আমি নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

সপ্তবিংশ মজলিস

হুজুর এরশাদ করলেন, আখেরী (শেষ) জামানার (কালের) আলেম ও আমির সম্বন্ধে হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ) বলেছেন যে, শেষ জমানার দলপতি (আমির)-গণ স্বেচ্ছাচারী হবে এবং আলেমগণ দুনিয়াকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে এবং ফেতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি করবে সুতরাং সে সময় জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম হবে। কেননা মুমেনগণ তখন বিলাসে নিমজ্জিত হবে অর্থাৎ আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকবে। এরপর এরশাদ করলেন, যখন আমির হবে যথেচ্ছারী এবং আলেম হবে দুনিয়ার বন্ধু তখন আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার বুক থেকে বরকত তুলে নিবেন। রোগ, ব্যাধি ও অন্যায় করার প্রবণতা মানুষকে গ্রাস করবে। শহর বিরান (বিজন) হবে এবং পৃথিবীর বুকে ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়বে। এরপর এরশাদ করলেন, আখেরী জমানার অধিকাংশ আলেম মদ্যপায়ী ও সমকামী হবে। সুতরাং অবশ্যই জানবে যে, তারা দোজখের কাষ্ঠ-খণ্ড। এরপর সদকা সম্বন্ধে বললেন 'যে, সদকা (দান) দরবেশদেরকে দেয়া দরকার। যে ব্যক্তি নিজের দরবেশীকে ঢেকে রাখে সে দশগুণ সওয়াব বেশী লাভ করে। দরবেশদের সদকা নিজের

আত্মীয়স্বজনকে দেয়া উচিত; কারণ, এতে বহু সওয়াব রয়েছে এবং এ কাজের জন্য তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। আত্মীয়স্বজনের পরে সদকার হকদার হচ্ছে আলেমগণ, এদেরকে ১৲ টাকা দান করলে ৬ হাজার টাকার সওয়াব লাভ করা যায়। এরপর সদকার হক হচ্ছে পুণ্যাত্মা ও ভাল লোকদের। যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মে সদকা প্রদান করে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন এবং বেহেস্তে উৎকৃষ্ট অট্টালিকা দান করেন।

এ জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর হুজুর মশগুল হলেন এবং আমি বিদায় নিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

অষ্টবিংশ মজলিস

তওবা ও আলেমদের সম্বন্ধে আলোচনায় বললেন, হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, "মৃত্যুর পূর্বে তওবা কর"। মৃত্যুর পর অনুনয় বিনয়ে কোন কাজ হবেনা। এরপর এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কোরান মজিদ ও ফোরকানে হামিদের মধ্যে বলেছেন, "ইয়া আয়্যু হাল্লাজিনা আমানু তুবু এলাল্লাহ তাওবাতুন নসুহা"। অর্থ—হে ঈমানদার আল্লাহর নিকট তওবা কর, তওবাতুন নসুহা। অর্থাৎ সেই রকম তওবা যে রকম তওবার হক বা দাবী রয়েছে এবং তা করবে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আদম (আঃ) যখন বেহেস্ত হতে দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন তিনি দোয়া করলেন, "হে করুণাময়, ইবলিসকে তুমি আমার উপর বিজয়ী করেছো, আমার কোন ক্ষমতা নেই যে নিজ হতে আমি তাকে পরাস্ত করতে পারি, কিন্তু তুমি যদি ক্ষমতা দাও তাহলে কোন অসুবিধা হবেনা"। ঐশী আওয়াজ ভেসে এলো, "হে আদম, যখন তোমার আওলাদ (সন্তান-সন্ততি) হবে, তখন আমার দয়া তাদের সঙ্গে থাকবে, তারা সতর্ক থাকলে তাদের উপর ইবলিসের আক্রমণ কার্যকরী হবে না। হযরত আদম (আঃ) দ্বিতীয়বার আবেদন করলেন, "হে এলাহি তোমার দয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি কর"। পুনরায় আওয়াজ এলো, "আমি তাদের জন্য তওবা ফরজ করলাম, সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মূহূর্তে তওবা করলেও আমি গ্রহণ করবো"। এরপর এরশাদ করলেন, "আহলে সলুক, মুসলমান হওয়ার জন্য তওবা করা ফরজ মনে করে। প্রত্যেকের উচিত মৃত্যুর পূর্বেই তওবা করা"। তারপর

বললেন, আল্লাহতায়ালা পশ্চিমে তওবা নামক একটা দরজা তৈরী করেছেন তার বিস্তৃতি ৭০ বছরের পথ এবং উচ্চতা ৪০ বছরের পথ। মানব সৃষ্টির পর হতে আজ পর্যন্ত সেটা খোলা আছে এবং যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় না হবে ততদিন পর্যন্ত খোলাই থাকবে।

এরপর এরশাদ করলেন, যে সমস্ত আলোচনা বা বক্তব্য পেশ করা হলো মনে করবে এগুলো তোমার পূর্ণ-পরিপূর্ণতার বা পরিপূর্ণ-কামালিয়াতের জন্য। তোমার উচিত আমি যা কিছু বললাম সেগুলো পালন করবে, যাতে কেয়ামতের দিন লজ্জিত না হও। এরপর এরশাদ করলেন, সেই মুরীদই পীরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী যে তার পীরের নিকট হতে যা শোনে তা স্মরণ রাখে এবং মনপ্রাণ দিয়ে তা মেনে চলে। তাঁর বক্তব্য শেষ করে তিনি পবিত্র মুছল্লা (জায়নামাজ), খিরকা (লম্বা দরবেশী জামা) আছা (লাঠি) মোবারক দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন এ আমানত (গচ্ছিত মাল) খাঁজেগানে চিশ্‌ত রাদিআল্লাহু আনহু হতে আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। আমি তোমার নিকট পৌঁছালাম এবং গচ্ছিত রাখলাম। এখন তোমার উচিত, তোমার পরে যাকে তুমি উপযুক্ত মনে করবে তাকে দান করে জিম্মাদার করবে। তাঁর কথা শেষ হলে এ গোলাম মাথা জমিনে রাখলো। তিনি আমাকে স্নেহের পরশে উত্তোলন করে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহি আঁলা জালেক।

দলিলুল আরেফীন

কুতুবুল আকতাব

হযরত খাঁজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী আউশী

রহমতুল্লাহ আলায়হে

অনুবাদক ঃ

কফিল উদ্দিন আহ্মেদ চিশ্তী

বার্গাহে চিশ্তিয়া

নারায়ে চিশতিয়া
ইয়া গরীব নওয়াজ

উৎসর্গ

কদম পাকে

হযরত খাঁজা বুজুর্গ হিন্দুল ওলি, আতায়ে রসুল,
কুত্বে বাররুল বাহার, আশরাফুল আউলিয়া
নূরে চশমে আরেফীন, শাম্মায়ে চিশতীয়া,
রওশন জামির, গওসে সামদানী, বোরহানুল আশেকীন,
সদরে আউলিয়া, মেশকাতুল মুহেব্বীন,
লুম্মায়ে রেছালাতে মা'ব, আওলাদে সাহেবে
লাওয়া লাক, খলিফায়ে সুলতানে লাতানহার,
নকীবে আছফিয়া, সাহেবে কুন ফা ইয়াকুন,
সাহেবে এছমে আ'যম, সাহেবে নজরে কিমিয়া,
বাহ্‌রে এরফান, কাশিফে রুমুজে হাবীবে ইলাহ,
সাহেবে ওহদাতুল ওজুদ, ইমামুল মুয়াহেদীন,
আহলে তাসার্‌রুফ, মুহিয়ে সুন্নাতে নববী,
আহলে ছামা, নুকতায়ে ইশক্ ও উলুম,
আল ইনসানুল কামেল, সায়্যেদি, কেবলায়ি
কাবাই, মুহতারেমি, মুয়াজ্জেমী, মঈনুল হক
ওয়াদ্‌দীন সৈয়দেনা শায়খ মুঈন উদ্দিন
হাসান চিশ্‌তী সনজরী ছুম্মা আজমেরী কুদ্দুসে
সের রুহুল আজীজ,—রুহী ওয়া কল্‌বী ফিদাহ।

কছীদা

ইয়া সাহেবোল জামালে, ইয়া সাইয়্যেদুল বাশার
মিন ওয়াজহিকাল মুনীর লাকাদ নুরাল কামার,
লা ইয়াম্‌কেন ছানায়ে কামা কানা হাক্কাহু
বাদে আজ খোদা বুজুর্গ তুহই কিচ্ছা মুখতাছার।

O

ইয়া রাছুলুল্লাহ উনজুর হালেনা,
ইয়া হাবীব আল্লাহ এছমা কালেনা।
ইন্নানা ফি বাহ্‌রে গামমুন মুগাররেকুন,
খুজ ইয়াদী ছাহলুন এশকালেনা।

O

এমদাদে কুন এমদাদে কুন
আজ রাঞ্জেগাম আজাদ কুন
দর দ্বীন ও দুনিয়া শাদে কুন
ইয়া শাহান শাহে আজমেরী।

O

বাগের দাফে বালা উফ্‌তা দে কিস্তি
জম্নিফানো শেকোস্তারা তে পুস্তি
বে হাক্কে হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী
মদদকুন ইয়া খাঁজা মূঈনউদ্দিন চিশ্‌তী।

আল্লাহতায়ালার বন্ধুদের শানে
কোরান শরীফ ও হাদীছ শরীফের বানী

আলা-ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাওফুন আলায়হিম ওয়ালাহুম লা ইয়াহ জানুন।
সূরা ইউনুস-৬২

অর্থ—সাবধান ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলিদের (বন্ধুদের) কোন ভয় নেই এবং তাঁদের কোন দুঃখ ভাবনা নেই।

ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা ইয়ামুতুন বাল ইয়ানতাকিলু মিন দারুল ফানা ইলা দারুল বাকা—আল, হাদীস

অর্থ—নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহ জগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে।

আল্ আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ—(আল্ হাদীস) অর্থ- আউলিয়াগণ আল্লাহর সুবাস।

কারামাতুল আউলিয়াউন হাক্কুন—(আল, হাদীস) অর্থ—আউলিয়াদের অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।

ইন্না আউলিয়াই তাহ,তা কাবাই লা ইয়ারিফুহুম গায়রী ইন্না আউলিয়াই
—হাদীসে কুদ,সী।

অর্থ- নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন, আমি ভিন্ন তাঁদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেহই অবহিত নহে, আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত।

কুলুবুল ইন্ছানে বাইতুর রহমান ওয়া কুলুবুল মুমেনিনা আরশুল্লাহ,- আল, হাদীস
অর্থ—মানুষের হৃদয় আল্লাহ,র ঘর এবং মুমিনের হৃদয় আল্লাহ,র সিংহাসন।

কুলুবুল মুমেনিনা মেরআতুল্লাহ,—(হাদিছে কুদ,ছি) অর্থ—মুমিনের হৃদয় আল্লাহ,র দর্পণ।

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লিহি আলা রাছুলিহিল করিম।

পুস্তক পরিচিতি

দলিলুল আরেফীন

মূল গ্রন্থটি কুতুবুল আকতাব হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকী আউসী ছুম্মা দেহেল্‌বী কুদ্দুসে সেররুহুল বারী কতৃক ফার্সীতে প্রণীত এবং ফার্সী হতে মওলানা গোলাম আহমদ উর্দুতে অনুবাদ করেন। আমরা যে উর্দু পুস্তকটি হতে বাংলায় অনুবাদ করেছি সেটি ১৩১০ হিজরীতে দিল্লী হতে প্রকাশিত।

হযরত খাঁজা কুতুবুল আকতাব, হযরত খাঁজা বুজুর্গ গরীব-উন্‌-নওয়াজ মুঈনুল হক ওয়াল মিল্লাতে ওয়াশ শারায়ে' ওয়াদ্দ্বীন, হাসান চিশ্‌তী সনজরী ছুম্মা আজমেরী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুর সাজ্জাদা নশীন অর্থাৎ গদী নশীন খলিফা ছিলেন। হযরত গরীব-উন-নওয়াজ বিভিন্ন সময়ে ওলি দরবেশ, মাশায়েখ (পীরগণ) ছুফি, মুরিদান ও ভক্তদের নিয়ে মজলিস করতেন এবং সেই সব মজলিসে এল্‌মে তাসাউফের (আল্লাহ প্রাপ্তির জ্ঞান) বিভিন্ন দিক কোরান ও হাদীসের আলোকে আলোকপাত করতেন। যার মধ্য হতে ১২টি পবিত্র বিশেষ মজলিসের অমিয়বাণী এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় স্থান লাভ করেছে।

এ অমূল্য ও পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত তাসাউফের মূল বিষয়গুলি এত প্রাঞ্জল ও বিষদভাবে উল্লেখিত হয়েছে যা তরীকত পন্থীদের বহু আকাংখিত ও অজানা প্রশ্নের সমাধান করতে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাছুলিহি মুহাম্মাদেও ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া আহ্‌বাবেহি ওয়াল আউলিয়ায়ে উম্মাতিহি আজমায়িন।

বাংলায় অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে কম নয়। কিন্তু ইল্‌মে তাসাউফের উপর যে ক'খানি পুস্তক অনুদিত হয়েছে তার সংখ্যা অতি নগণ্য। বিশেষ করে চিশ্‌তীয়া তরীকার বুজুর্গানে দ্বীনদের মাত্র কয়েকটা জীবনী ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পুস্তক, যেমন মকতুবাত (চিঠি) মলফুজাত (অমিয়বাণী) আধ্যাত্মিক বিধিবিধান সম্বলিত রচনা ও প্রবন্ধের (তাসনিফাত ও রেছালা) সংখ্যা শুন্যের কোঠায়। অথচ আমাদের দেশের তাসাউফ পন্থীদের অধিকাংশই চিশ্‌তিয়া তরীকার দাবীদার। চিশ্‌তিয়া তরীকার মাশায়েখ অর্থাৎ পীরগণ বাংলায় এ ধরণের কিতাবের অভাব অনুভব করেন কিনা জানিনা, করে থাকলেও নিশ্চয়ই তারা চোখ বন্ধ করে আছেন। আমরা আশা করছি অচিরেই তাঁরা এ অভাব মেটাবার প্রচেষ্টা চালাবেন।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আমি এ ধরণের লিখিয়ে বা অনুবাদক নই এবং এ দুরূহ কাজ আমাকে করতে হবে তা কল্পনারও অতীত ছিল। শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম শিরাজী আল্‌কাদরী এর বিশেষ অনুরোধে এবং মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবুবকর ফরহাদ ফারুকী আবুল উলাই ও প্রিয় ভ্রাতা মাওলানা মুহাম্মদ আবু সালেহর সক্রিয় সহযোগীতা না পেলে অনুবাদের কিছুটা অঙ্গহানি অবশ্যই ঘটতো। কারণ উভয়েই আরবী ফার্সীর অনুবাদে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, যার জন্যে আমি এদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

দলিলুল আরেফীনের অনুবাদের অনুবাদ করতে যেয়ে প্রতি মুহূর্তেই হোঁচট খেয়েছি। কারন আরবী ফার্সীর বহু প্রতিশব্দই বাংলাতে নেই। আমি আদ্য প্রান্ত মূল গ্রন্থের ভাবার্থ গ্রহণ না করে প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের অঙ্গহানী না ঘটায়ে বাংলা হতে ঠিক উপযুক্ত প্রতিশব্দ বেছে নিয়ে বাক্যের সৌন্দর্য রক্ষা করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু তবুও খাপ ছাড়া ও অসংলগ্ন বাক্য 'মূল'কে রক্ষা করতে যেয়ে একেবারে এড়াতেও পারিনি। নতুন ও অনভিজ্ঞ হিসেবে এ অনুবাদকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে ধন্য হব। সর্বোপরি, যদি এ পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলো প্রিয় পাঠকগণ গুরুত্ব সহকারে ভক্তি ও মহব্বতের সাথে, পবিত্র, প্রসন্ন ও স্বচ্ছ অন্তকরণে গ্রহণ ও আমল করেন, তবে ভাবব এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করেছেন।

—অনুবাদক

সমস্ত প্রশংসা মহামহিম আল্লাহ্ জাল্লেশানুহুর বারগাহে কিবরিয়ায় এবং বেএনতেহা তাহিয়া, ছালাত, ছালাম, দরুদ স্থলতানে লাতানহার আঁ হযরত নূরে মুজাচ্ছাম মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) এর বারগাহে নবুবীতে।

সুদীর্ঘ দিনের একটানা প্রত্যাশা এবং আকাঙ্খার অবসানে হিন্দুল অলীর শুভদৃষ্টিতে বাংলা ভাষাভাষী তাছাউফমোদী আহলে চিশতের রুহানী খোরাক ঐশী অবিধান সরূপ মলফুজাতে খাজেগানে চিশত-এর বংগানুবাদ প্রকাশনার দিকে এগিয়ে চলছে। অধুনা এলমে ছুলুক ও এরফানের উপর যথেষ্ট রেছালা আমাদের নজরে পড়লেও তাছাউফের প্রকৃত ও নির্ভেজাল পরশ পাথরের অভাবে এদেশের তরিকত জগৎ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর এরই শুন্যতা পূরণে ঐশী অভিপ্রায়ে ''বারগাহে চিশতীয়ার'' কফিলউদ্দিন আহমেদ চিশতী পবিত্র দাস্তমুবারকে চিশতীয়া তরিকার কোরআনে ছানী (দ্বিতীয় কোরআন) তুল্য মলফুজাতে খাজেগানে চিশত-এর সরল অনুপম বংগানুবাদ প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে তরিকত পন্থীদের জন্যে মুজাচ্ছাম নেয়ামত বুশরা (খোশ খবরী) বললে অত্যুক্তি হবেনা। বারগাহে চিশতীয়ার পক্ষ থেকে মুহতারেম অনুবাদককে মোবারকবাদ।

বর্তমানে কাগজের মূল্য, ছাপা ও বাঁধাই খরচের আধিক্যে পুস্তক প্রকাশনা খুবই দুরুহ ব্যাপার। তা সত্বেও আমরা বিশুদ্ধ তাসাউফের গ্রন্থসমূহ প্রকাশনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

পর্যায়ক্রমে মলফুজাতে চিশতের যে পাঁচটি রেছালা প্রকাশ করতে যাচ্ছি সেগুলি হলো।

১। আনীসুল আরওয়াহ—খাঁজা গরীব নওয়াজ (রাঃ), প্রকাশিত।
২। দলিলুল আরেফীন—খাঁজা কুতুবুল আকতাব (রাঃ) প্রকাশিত।
৩। ফাওয়ায়েদুছ ছালেকীন—শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রাঃ)।
৪। রাহাতিল কুলুব—খাঁজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রাঃ)।
৫। রাহাতিল মুহেব্বীন—হযরত খাঁজা ওমর খসরু তুতীয়ে দেহলী (রহঃ)।

পরিশেষে পাক্ ভারত উপমহাদেশের বেলায়েতের সম্রাট আমাদের আকা, মওলা তাজেদার কাবায়ে হিন্দ গরীব নাওয়াজ (রাদিঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে তাঁরই পথানুসরণ করে তাঁরই মহান আদর্শে উপমহাদেশের তরিকত পন্থীরা পথের সন্ধান পাবে এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি। আল্লাহুম্মা আমিন।

—প্রকাশক

হজরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হজরত খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ বুরহানুল আশেকীন, সেরাজুস্ সালেকীন, মুরাদিল মুসতাকিন, শামছিল আরেফীন, আতায়ে রসুল, সুলতানুল আওলিয়া, রোশনজামীর, খাঁজায়ে খাঁজেগান, পীরে পীরান, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সোবহানী, হযরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী সুম্মা আজমেরী (রাঃ) হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) এর পৌত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশধর। হযরত খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজের পিতার নাম হযরত গিয়াস উদ্দিন হাসান সন্‌জরী। সঞ্জরের অন্তর্গত সিস্তান নামক গ্রামে হযজরত খাঁজা বুজুর্গ জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব ও বাল্যকাল সিস্তানেই অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর বয়স ১৫ বৎসর তখন তাঁর আব্বা পরলোক গমন করেন। মরহুম আব্বার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ যা তিনি পেলেন, তার পরিমান ধনী হওয়ার জন্য কম ছিলনা। এক দিন খাঁজা বুজুর্গ উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া আঙ্গুর বাগানে কাজ করছিলেন, এমন সময় খাঁজা ইব্রাহিম (রঃ) নামের এক মজ্‌জুব (আল্লার প্রেমে উদাস) বুজুর্গ) তাঁর আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। হযরত খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ মজ্‌জুবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর একগুচ্ছ তাজা আঙ্গুর তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। হযরত খাঁজা ইব্রাহিম অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আঙ্গুর ভক্ষণ করলেন এবং ঝুলির মধ্য হতে কয়েকটা দানা বের করে স্বীয় দাঁত দিয়ে ভেঙ্গে হযরত খাঁজা বাবাকে খেতে দিলেন। তিনি দানা কয়টি খেয়ে নিলেন। খাওয়ার পরপরই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল এবং দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা-জেগে উঠলো। এরপর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি খোদার রাস্তায় দান করে দিলেন এবং সত্যের সন্ধানে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে বোখারায় চলে গেলেন। সে সময় বোখারা জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র ছিল। সেখানে যেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ কোরান শরীফ মুখস্ত করে ফেললেন। অর্থাৎ হাফেজে কোরানের মর্যাদা অর্জন করলেন। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথের পথিকদের অনুসন্ধানে বের হলেন। ইরাকের অন্তর্গত নিশাপুর তখন ধর্মীয় ও

বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র ছিল এবং এই নিশাপুরেই তখন প্রখ্যাত কামেল বুজুর্গ হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দুসে সেররুহুল বারী-এর খান্‌কাহ শরীফ ছিল। হযরত খাঁজা বাবা এই কামেল বুজুর্গের নিকট বয়াত গ্রহণ করে ধন্য হলেন। মুরীদ হওয়ার পর ২০ বৎসর তিনি স্বীয় পীরের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ১২ বার তাঁর মুর্শেদের সাথে দেশ ভ্রমণ করেন। তখন পায়ে হেটে চলা ব্যতীত অন্য কোন ভ্রমণ উপযোগী বাহন ছিল না, যার জন্য সব ভ্রমণগুলিই তাঁরা পায়ে হেটে সম্পূর্ণ করেছেন। প্রত্যেক ভ্রমণের সময়েই মুর্শেদের প্রয়োজনীয় মাল-পত্র স্বীয় মস্তকে বহন করে নিয়ে যেতেন। খেলাফত প্রাপ্তি ও সাজ্জাদা নশীন হওয়ার পর স্বীয় মুর্শেদ হতে বিদায় নিয়ে বাগদাদের আলিয়া মাদ্রাসায় উপস্থিত হলেন। পরে সরকারে দোজাহান হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ) এর নির্দেশে ৪০ জন সঙ্গীসহ হিন্দুস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সময়ে হিন্দুস্তানে হিন্দুরাজাদের রাজত্ব এবং হিন্দু বসবাসকারীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল নাম মাত্র। হযরত খাঁজা হিন্দুস্তানে প্রবেশ করে প্রথমে লাহোরে দাতা গঞ্জেবক্‌স্ (রঃ)-এর মাজার শরীফে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে সরাসরি তিনি দিল্লীতে আগমন করেন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় হতেই তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন ধর্মবলম্বীদের প্রতি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানান। হিন্দুদের নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দেখা দেয়। তারা এ প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং খাঁজা বুজুর্গের ক্ষতি সাধনে মনোনিবেশ করে। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ যার সহায় মানুষ তার কি করতে পারে? হিন্দুদের মধ্য হতে একজন শক্তিশালী যুবক হুজুরকে শহীদ করার জন্য মাহ্‌ফিলে প্রবেশ করে। সংগে তার তীক্ষ্ণধার এক ছোরা লুকিয়ে রেখে সামনে এগিয়ে এসে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। হুজুর তার মনোভাব বুঝতে পেরে সুধামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "চুপ চাপ আছ কেন? ছোরা বের করে নিজের কাজ সমাধা কর; অন্যথা সময় নষ্ট করে লাভ কি?" এ কথা শুনার সাথে সাথেই সে ভীত হয়ে পড়ল এবং খাঁজা বাবার এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য হুজুরের পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো। খাঁজা বুজুর্গ তাকে ক্ষমা করলেন। তখন সে অত্যন্ত পবিত্র অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলো। পরবর্তী সময়ে সে নিজেকে খাঁজা বাবার গোলামীতে আবদ্ধ করার সংকল্প ঘোষণা করলো। এ সংবাদ অতি দ্রুত

হিন্দু সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ফলে দলে দলে বিধর্মীরা এসে হুজুরের নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। (আল্‌হামদুলিল্লাহ)।

হিন্দুরাজাদের মধ্যে তখন পৃথ্বীরাজ ছিল খুব শক্তিশালী এবং তার রাজধানী ছিল আজমীরে। খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ তাই দিল্লী ছেড়ে আজমীর অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং যথাসময়ে আজমীর পৌঁছে প্রথমেই পৃথ্বীরাজকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য তার ললাটে ছিলনা। তাই সে ঈমানও আনল না; বরং পাল্টা আক্রমন, নির্যাতন ও নানা প্রকার অসুবিধায় ফেলার জন্য যা যা করা দরকার তার কোন কিছুই বাকি রাখল না। প্রথম প্রথম ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে কাজ না হওয়ায় পড়ে শাদী দৈত্যকে খাঁজা বাবার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল এবং শাদী দৈত্য বিরাট বিরাট পাথর পাহাড়ের উপর থেকে খাঁজা বাবার মজলিসের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু খাঁজা বাবার ইশারায় পাথরগুলি দূরে যেয়ে পড়তে লাগলো। শাদী দৈত্য কোন ক্ষতি সাধনই করতে পারলো না। এত বড় শক্তিশালী দৈত্যকে নিয়োগ করেও যখন রাজা কোন সুবিধা করতে পারলো না তখন হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর স্বীয় ভ্রাতা জয়পাল যোগীকে ডেকে পাঠালো। জয়পালের ছোট হতে বড় বড় সব যাদু যখন বিফল হলো তখন সে তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদু প্রয়োগ করলো কিন্তু তবু কোন কাজ হলোনা। জয়পাল অস্থির হয়ে উঠল এবং চিন্তা করতে লাগল এ লোক কোন শক্তির অধিকারী, যার জন্য এ বিদেশীদের সামান্যতম ক্ষতিও সে করতে পারলোনা, তখন জয়পালের স্থির বিশ্বাস হলো খাঁজা বুজুর্গ নিশ্চয়ই অলৌকিক-ঐশী শক্তির অধিকারী যা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা সে জানতো যে সারা ভারতবর্ষে এমন কোন শক্তিধর যোগী-তাপস নেই যে তার একটি মাত্র যাদুর মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। যার অগ্নিবান নিক্ষেপে পাথর পর্যন্ত জ্বলে যায়, অথচ এ কোন শক্তি বলে বলিয়ান যার কাছে সমস্ত যাদুই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেলো! সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে জয়পাল গরীব নওয়াজের মজলিসে প্রবেশ করলো এবং খাঁজা বাবার কদম মোবারকে মস্তক রেখে ইসলামের নিকট আত্ম সমর্পন করলো। ইসলাম গ্রহণ করার পরে জয়পাল আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করে নিজেকে খাঁজা বুজুর্গের একজন প্রধান খাদেম হিসেবে নিয়োজিত রাখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। জয়পালের যোগ-সাধানার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল অমরত্ব লাভ করা। খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ তার মনের অভিপ্রায় জানতে পেরে রাব্বুল আলামিনের দরবার হতে তার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে আনলেন। তখন হতে

তার মর্যাদা হলো "খিজিরে বিয়াবান" (বন জঙ্গলের খিজির) এবং বিয়াবান শব্দটি নামের সাথে যুক্ত হয়ে নাম হলো আবদুল্লাহ বিয়াবানী। এরপর হতে তিনি আবদুল্লাহ্ বিয়াবানী নামেই খ্যাত। ভারতের অন্তর্গত মধ্যপ্রদেশের কুরুপাণ্ডবে অবস্থিত একটা পাহাড়ী জঙ্গল, (সেটা এখন আবদুল্লাহ বিয়াবনের জঙ্গল নামে পরিচিত) সেখানে তাঁর আস্তানাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ফাল্গুনে বিরাট মেলা বসে এবং প্রথম বৃহস্পতিবার ফাতেহা হয়।

পৃথ্বিরাজের সমস্ত লোকজন ঈমান আনলেও পৃথ্বিরাজ কিন্তু ঈমান আনল না। অবশেষে খাঁজা বুজুর্গ দুঃখিত হয়ে পৃথ্বিরাজকে লিখে পাঠালেন, "মাতে রা জিন্দাহ মুসলমানানে সপরদেম।" অর্থ—জীবিত বন্দী অবস্থায় তোমাকে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করলাম।" এ চিঠি দেওয়ার পরপরই সুলতান শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর সাথে পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ জীবিত বন্দী হয়। পরে তাকে হত্যা করা হয়।

খাঁজা বাবা জীবনের চল্লিশটি বছর হিন্দুস্তানের মাটিতে স্রষ্টার সৃষ্টিকে সঠিক পথে নিয়োজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। লক্ষ লক্ষ বিধর্মী নরনারী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলামের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে হযরত খাঁজা বুজুর্গকে পাওয়ার আশায় তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলামের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে এবং হযরত খাঁজা বাবার গোলামী লাভ করে গৌরবান্বিত হয়েছে।

৬৩৩ হিজরীর ৬ই রজব রোববার দারুলখায়ের, আজমীর শরীফে হযরত খাজা বুজুর্গ ইহলোক বর্জন করেন (তাঁর বেসাল শরীফ অর্থাৎ মহা মহিমের সাথে মহামিলন ঘটে)। রুহ মোবারক দেহত্যাগ করার পর তাঁর পেশানী মোবারকে (ললাটে) নূরের অক্ষরে লিখা ছিল "মাতা হাবীবুল্লাহ ফি হুব্বিল্লাহ" অর্থাৎ খোদার প্রেমে খোদার বন্ধু বিদায় নিল।

রওজা মোবারক আজমীর শরীফের দারুলখায়রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দর্শনপ্রার্থীদের জন্য আজ ও উন্মুক্ত রয়েছে।

আল হামদুলিল্লাহ আলা জালেক

ম্যায় গোলাম খাঁজাকা

তলব কি রাহমে হাম জিস্‌ত্‌ কা সামাঁ সমঝতে হাঁায়
দ্বারে খাঁজা কো বাবে মনজিলে ইরফান সমঝতে হাঁায়
খোদাওন্দে জাহাঁ কে লুত্‌ফ্‌ছে খাঁজা ইয়ে দিওয়ানে
তোমহারে নামকোভি মুরিছে ইমাঁ সমঝতে হাঁায়
নিগাহোঁ মে তোমহারি হায় হাদীসে মুস্তফা খাঁজা
তোমহারি গোফ্‌তোগো কো শারহে কোরাঁ সমঝ্‌তে হাঁায়
হামে খাঁজা ছে উলফাত হায় গোলামে সনজরী হাম হাঁায়
হর এক মুশকিল কো আপনি জিস্‌ত মে আসাঁ সমঝ্‌তে হাঁায়
ইয়ে মানা, আয়ে মুঈনউদ্দিন! তুমছে দূর হাঁায়, লেকিন
তোমহে হর ওয়াক্ত আপনে দিল মে হাম মেহমাঁ
সমঝ্‌তে হাঁায়।

—মনসুর আজমেরী

আমি খাঁজার গোলাম

অনুসন্ধানের পথকে আমি জীবন-উপকরণ মনে করি
খাঁজার দরবারকে পরিচয়ের ঠিকানা মনে করি।
খোদার জগতে প্রেমে, খাঁজা আমি দিওয়ানা
তোমার নামকেও ঈমানের মূল মনে করি।
তোমার দৃষ্টিতে আছে মোস্তফার হাদীস, হে খাঁজা,
তোমার প্রবচনকে কোরানের সারমর্ম মনে করি।
প্রেমিক আমি খাঁজার গোলাম সনজরীর
দুঃখ কষ্ট প্রতিটিকে, তোমার স্মরণে সহজ মনে করি।
মানি, আছি আমি তোমা হতে বহু দূরে হে মুঈনউদ্দিন, কিন্তু
মেহমান তুমি অন্তরে সতত।

রসূলে দোজাহান সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হিজরতের ৬১৩ বৎসর পর ৫ই রজব, বৃহস্পতিবার হযরত খাঁজা কুতুব উদ্দিন বখ্তিয়ার কাকী রহমতুল্লাহ আলায়হে নিজের বয়াত সম্বন্ধে বলছেন, উপরোল্লিখিত তারিখে আমি বাগদাদ শহরের আবুল লায়ছা সমরকন্দি (রঃ)-এর মসজিদে উপস্থিত হয়ে গৌরবোজ্জ্বল হযরত খাঁজা বুজুর্গের হাতে বয়াত গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি। তিনি তাঁর দয়াদ্র-প্রেম ও করুণা দ্বারা আমায় স্বীয় তরীকাভুক্ত করে ''কুল্লাহ চাহার তর্কী'' দান করলেন। (কুল্লাহ চাহার তর্কী অর্থ চার টুকরা কাপড়ে নির্মিত এক ধরণের টুপী যেটা চিশ্তীয়া তরীকার মাশায়েখ (পীরগণ) কোন ব্যক্তিকে মুরীদ হওয়ার উপযুক্ত মনে করলে তাকে মুরীদ করার পর ইহা দান করেন। এই ধরণের টুপী প্রথম হযরত জিব্রাইল (আঃ) বেহেশ্ত হতে এনে হযরত রসূলে খোদা (সাঃ)-কে দিয়ে বলেন আপনি পরিধান করুন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে খলিফা নিযুক্ত করুন। হযরত রসূলে করিম (সাঃ) নিজে ইহা পরিধান করেন এবং চারটি খণ্ডের তিনটি, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওসমান গণি (রাঃ) এবং হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুকে দান করেন। এই চার খণ্ডে তৈরী টুপীর চার অংশের ব্যখ্যায় হযরত খাঁজা আবদুল্লাহ সহল তশতরী বলেছেন প্রথম অংশ দ্বারা নুর ও রহস্যের স্তর, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মহব্বতের স্তর, তৃতীয় অংশ দ্বারা ইশক এর স্তর, চতুর্থ অংশ দ্বারা সন্তুষ্টি ও সমর্পণের স্তর নির্দেশ করে)।

উক্ত দিবসের মোবারক মজলিশে শায়খ শিহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) শায়খ দাউদ কিরমানী, শায়খ বুরহান উদ্দিন মুহাম্মদ চিশ্তী (রহঃ), শায়খ তাজউদ্দিন মুহাম্মদ সোফ্‌াহানী (রঃ) এবং আরও অনেক শ্রেষ্ঠ ছুফীগণ উপস্থিত ছিলেন। নামাজ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাঁজা হুজুর এরশাদ করলেন নামাজ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় না। হযরত রসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন ''আসসালাতু মিরাজুল মো'মেনীন''—আল্ হাদিস। অর্থাৎ নামাজ মুমেনদের মিরাজ। আরও

বললেন "বিল তাহ্‌কিক" অর্থাৎ নামাজ একটা গোপন তথ্য বা রহস্য, যার মাধ্যমে বান্দা স্বীয় পরওয়ারদীগারের নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং যাহারা 'হুজুরী কলবে' বা 'এতমিনান কলবে' অর্থাৎ তন্ময়তার সাথে অন্তর-মনকে যতটাতে যতটুকু বিলীন করে দিয়ে নামাজে অবস্থান করে, ঠিক সেই অনুপাতেই পরওয়ারদীগারের নৈকট্য লাভ হয়। কেননা গোপন তথ্য শ্রবণ করার জন্য ঐ পর্যন্ত নিকটে পৌঁছতে হয় যে পর্যন্ত ঐ রহস্যের উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজন হয়।

হযরত রসুলে মকবুল (সঃ) এরশাদ করেছেন, "আল মুছাল্লি ইউনাজী রাব্বাহু" অর্থাৎ নামাজীরা পরওয়ারদীগার হতে রহস্য গ্রহণ করে। এর পর আমাকে উদ্দেশ্য করে খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ বললেন, "যখন আমি হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দুসে সেররুহুল বারী-এর খেদমতে ছিলাম, ২০ বৎসর পর্যন্ত এমন ভাবে খেদমত করেছি যে দিনকে দিন মনে করিনি রাতকেও রাত মনে করিনি। রাত্রদিন সব সময়ে সবিনয়ে খেদমতে হাজির থাকতাম। যখন কোথাও তিনি ভ্রমণে বেরুতেন আমি তাঁর ভ্রমণের জিনিষপত্র নিজের মাথায় বহন করে নিয়ে যেতাম। আমার এ অহর্নিশি খেদমত যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন তিনি করুণা করে তাঁর দয়ার ভাণ্ডার আমার জন্য খুলে দিলেন। মনে রাখবে কষ্ট ও সেবা ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। যে যা কিছুই লাভ করেছে তা খেদমত ও মেহনত দ্বারা হাসিল করেছে। মুরীদের উচিত মুর্শেদের সামান্যতম নির্দেশ যেন অমান্য বা অবহেলা না করে। প্রত্যেক আমল বা অজিফা যা কিছু তিনি নির্দেশ দিবেন সে নির্দেশের প্রতি যেন মুরীদ সব সময় সবিশেষ যত্নবান হয়। পীর মুরীদের জন্য 'কনে' সাজানোর মত কাজ করে থাকেন। মুর্শেদের প্রতিটি নির্দেশ যথাযত ভাবে পালন করাই মুরীদের একমাত্র কর্তব্য। আমার পীরভাই শায়খ শিহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবস্থা ও ঠিক আমারই মতো। সেও ১০ বৎসর পর্যন্ত ভ্রমণ ও অবস্থানে সব সময়ে পীরের খেদমতে নিয়োজিত ছিলো। যখন ভ্রমণ করত মুর্শেদের সফরের জিনিষপত্র নিজের মাথায় বহন করে চলতো। এ খেদমতের বিনিময়ে সে যে মহা অমূল্য বস্তু লাভ করেছে তা বর্ণনার উর্দ্ধে। এরপর এরশাদ করলেন হযরত ইমাম আবু লায়ছ সমরকন্দী (রাঃ) প্রণীত 'তাম্বিহ' কিতাবে বর্ণিত আছে প্রতি দিন আসমান হতে দু'জন ফেরেস্তা জমিনে অবতরণ করেন। একজন কাবা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন "ওহে বনি আদম ও বনি যান, এ নির্দেশ ভাল ভাবে শুনে নাও, যারা আল্লাহর ফরজ আদায় করেনা তারা দায়িত্ব পালন না করার জন্য দায়ী হবে।"

দ্বিতীয় ফেরেস্তা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বড় কোঠার উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "যারা রসুলে মকবুল (সাঃ)-এর সুন্নত আদায় করেনা তারা কিয়ামতের দিন তাঁর শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, আমি একবার বাগদাদের কংকরী মসজিদে আউলিয়াদের সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম, আলোচনা চলছিল ওজুর সময়ে হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাঁকসমূহে পানি প্রবেশ করানো সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে রসুলে মকবুল (সাঃ) সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, যারা ওজুর সময়ে হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাঁকসমূহ ধৌত করবে, হকতায়ালা তাদের আঙ্গুলগুলোকেও শাফায়ত (সুপারিশ) হতে কখনও বঞ্চিত করবেন না। এরপর এরশাদ করলেন হযরত খাঁজা আযল শিরাজী (রঃ)-এর সাথে এক সঙ্গে বসেছিলাম। সন্ধ্যার নামাজের সময় হলে খাঁজা আযল শিরাজী (রঃ) ওজু করতে গিয়ে হাত-পায়ের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাঁকসমূহ ধৌত করতে ভুলে গেলেন। সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ হলো, "হে আযল আমার হাবীবের প্রেমের দাবীদার এবং উম্মতে মুহম্মদী হওয়া সত্যেও কেন তাঁর সুন্নাত পালনে ত্রুটী করলে"? খাঁজা আযল (রঃ) আমাকে বলছিলেন যখন থেকে আমি এ আওয়াজ শুনলাম তখন থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম যেন ভবিষ্যতে আর সুন্নতের খেলাফ না হয়। তারপর থেকে খাঁজা আযল (রঃ) যত দিন জীবিত ছিলেন আর কখনও নবীজীর (সঃ) সুন্নাত পালনে বিচ্যুত হন নি। এর কারণ খাঁজা আযল (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন যদি আমি সুন্নাতে রেসালাতের প্রতি অমনোযোগী হতাম তাহলে কাল হাশরের ময়দানে রহমতুল্লিল আলামিন (সাঃ) এর সম্মুখে মুখ দেখাতাম কি করে? অতপর বললেন, 'ছালাতে মাসউদ' কিতাবে বর্নিত আছে যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক ওজুতে তিনবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা সুন্নাত এবং এই নিয়ম অন্যান্য আম্বিয়াকেরামদেরও ছিল। রসুলে খোদা (সাঃ) বলেন প্রত্যেক ওজুতে তিন তিন বার করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা আমার সুন্নাত। এর বেশী করা আমার সুন্নাতের উপর জুলুম সরূপ। এরপর খাঁজা ফুজায়েল বিন আয়াজ (রাহঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি একবার ওজুর সময়ে হাত ধৌত করতে যেয়ে তিনবারের স্থলে দু'বার ধুয়ে ছিলেন। রাতে হুজুর করিম (সাঃ) স্বপ্নে তাঁকে বললেন, 'হে ফুজায়েল তুমি নিশ্চয়ই যান আমার সুন্নাতে অবহেলার অর্থ কি? হযরত ফুজায়েল (রঃ) বললেন, স্বপ্ন দেখার পর আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালাম এবং নতুন করে ওজু করলাম এবং ঐ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১ বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন ৫০০ রাকাত করে

নামাজ পড়া অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে রেখেছিলাম। এরপর এরশাদ করলেন আল্লাহর প্রেমিকদের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা ওজুর সাথে শয়ন করে। আল্লাহ তায়ালা এদের জন্য একজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেন, ঐ ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত সে দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে, ''হে আল্লাহ, যে পবিত্রতার সাথে শয়ন করেছে তার গুণাহ্, মাফ করুন''। অতপর বললেন 'শরহে আরেফান' কেতাবে বর্ণিত আছে যখন কোন বান্দা অজু করে শয়ন করে তখন আল্লাহ জাল্লে শানহু তার রুহকে আর্‌শে আজীমের নীচে আরোহণ করান। তখন আল্লাহ ঘোষণা করেন এই রুহকে নতুন বেহেস্তী পোষাকে (খিলওয়াত) ভূষিত কর। তখন রুহ 'খিলওয়াত' পরিধান করে সেজদা করে। অতপর আল্লাহ বলেন এই নেক বান্দার রুহকে যথা স্থানে রেখে আস। যারা অপবিত্র অবস্থায় শয়ন করে তাদের রুহকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হলে বলা হয় এ রুহ আর্‌শে কিবরীয়ার নীচে আরোহণ করার উপযুক্ত নয়, একে ফেরৎ নিয়ে যাও। এরপর এরশাদ করেন, রসুলে খোদা (সাঃ) বলেন, 'আল-ইয়ামিনু লিল ওয়াজহি আল-ইয়াছিরু লিল মুক'য়িদ'' অর্থাৎ ডান হস্ত মুখের জন্য, বাম হস্ত গুহ্যদারের জন্য। আরও এরশাদ করেন মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা প্রবেশ করানো সুন্নত এবং বেরুবার সময় প্রথমে বাম পা বের করা সুন্নত। এ প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার হযরত খাঁজা সুফিয়ান (রঃ) মসজিদে প্রবেশ করার সময় ভুল বসতঃ বাম পা প্রবেশ করান, সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ হলো, হে ছওরী (ষাঁড়) এ রকম বে-আদবীর সাথে কখনও মসজিদে প্রবেশ করতে নেই। এই দিন থেকে হযরত খাঁজা সুফিয়ান (রঃ) আল্লাহর দেওয়া 'ছওরী' অর্থাৎ ষাঁড় নামটি নিজের নামের সাথে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জোড়ে দিয়ে হযরত খাঁজা সুফিয়ান 'ছওরী' হলেন। এরপর আরেফীনদের অবস্থা ও অবস্থান (আহওয়াল এবং মাকামাত) সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন। আরিফ তাদেরকেই বলে যাদের উপর প্রত্যহ সহস্র বার আলমে গায়েব (অদৃশ্য জগত) হতে জ্যোতি বিচ্ছুরণ হয় এবং প্রতি মূহূর্ত নুরে এলাহির নূরে তারা আপ্লুত হয়। পরম করুণাময় আল্লাহর নূর ব্যতীত আর কিছুই তারা দেখতে পায়না। আরিফ সম্বন্ধে আরও বলেন, যে ব্যক্তি সমস্ত জ্ঞানের ধারক ও পরিচয় লাভকারী সেই আরিফ। সে ঐশী জ্ঞান দ্বারা সজ্জিত এবং হাজার হাজার কথার সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে সক্ষম। মহব্বত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে সঠিকভাবে পাওয়া যায়। নির্ভুল উত্তর প্রদানের জন্য সে অর্থ-সমুদ্রের অতল

তলে পৌঁছে 'আনওয়ারে এলাহির' মারেফাতের মহা ভাণ্ডার হতে সঠিক অমূল্য রত্নটি (অর্থটি) সংগ্রহ করে মুর্শেদের নিকট পেশ করার পর যদি মুর্শেদ সন্তুষ্ট হন তখন প্রমাণিত হবে যে সে সত্যি আরিফে এলাহি বা আল্লাহর আরিফ। পরে এরশাদ করলেন আরিফ সদা সর্বদা প্রভুর প্রেমের উন্মত্ততায় উন্মাদ থাকে। যদি দাঁড়ান থাকে, তবে বন্ধুর প্রেমেই দাঁড়িয়ে থাকে, যদি বসে থাকে তাহলে বন্ধুর স্মরণেই বসে থাকে, আর শুয়ে থাকলেও প্রেমাস্পদের খেয়ালেই বিভোর থাকে। জেনে রাখ, আহ্‌লে আশেক যখন ফজরের নামাজ শেষ করে তখন সে ঐ জায়নামাজে বসেই এশরাকের নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে; তার উদ্দেশ্য বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে কবুলিয়াত (গ্রহণযোগ্যতা) হাসেল ও পরম করুণাময়ের জ্যোতি ও জাতে তাজাল্লিয়াতে অবগাহন করা। এরশাদ করলেন যদি কোন ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর ঐ জায়নামাজে বসেই এশরাকের নামাজের জন্য অপেক্ষা করে তবে হকতায়ালা তাঁর একজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেন। সে তার পাশে বসে দোয়া-খায়ের ও মাগফেরাত কামনা করতে থাকে, যাতে লোকটি এশরাকের নামাজ হতে বিরত না হয়। সৈয়দুত্‌তায়েফা জুনাইদ বোগদাদী (রঃ)-এর একটি বর্ণনা। ''ওমদাহ'' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, রসুলে খোদা (সাঃ) একদিন শয়তানদের সর্দার (ইবলিশ)-কে দেখলেন যে, সে জীর্ণ-শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হুজুর করিম (সাঃ) শয়তানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার এ দুরাবস্থার কারণ কি? উত্তরে শয়তান বলল, ''আমি আপনার উম্মতদের চারটি কাজের জন্য বড় কষ্ট পাচ্ছি। প্রথম কাজ মোয়াজ্জেনের আজান। সে যখন সময় মত নামাজে আসার জন্য আজান দেয়, তখন শ্রোতারা আজানের জবাবে মশগুল হয় এবং নামাজে আসার জন্য তৈরী হয়। ফলে আজান প্রদানকারী ও শ্রোতা উভয়েই পুরস্কৃত হয়। দ্বিতীয় কাজটা গাজীদের ধর্মযুদ্ধ। তারা যখন ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে আল্লাহু আকবার তকবীর বলতে বলতে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সম্মানিত হন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষণা করেন তোমাদেরকে তোমাদের বংশধরসহ পুরস্কৃত করলাম। তৃতীয় কাজটা দরবেশদের 'কসবে হালাল' (ধর্মানুমোদিত শ্রম)। দরবেশগণ নিজেদের কসবে হালাল হতে অন্যদেরকেও দান করেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর এ বন্ধু দরবেশদের উছিলায় অন্যদেরকেও ক্ষমা করে দেন। চতুর্থ কাজটা যারা ফজরের নামাজ পড়ে একই জায়নামাজে বসে থেকে এশরাকের নামাজ আদায় করে, তাদের জন্যই আমার কোমরটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। কেননা আমি যখন ফেরেস্তাদের মধ্যে ছিলাম সেই সময় একটা সহিফায় (আল্লাহ

প্রদত্ত ছোট কিতাব যা কোন নবীদের উপর নাজেল হয়) লেখা দেখেছিলাম, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করে ঐ জায়নামাজে বসে থেকে সূর্য উঠার পর এশরাকের নামাজ আদায় করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে ৭০,০০০ হাজার লোককে ক্ষমা করে দেন। খাঁজা বুজুর্গ এরপর এরশাদ করেন আমি "ফেকাউল আকবর" কিতাবে দেখেছি হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক কাফন চোর যে তার জীবনের চল্লিশটি বছর কাফন চুরির পেশায় নিয়োজিত ছিল, তার মৃত্যু হলে তাকে বেহেস্তে দেখা গেলো। তার এমন গুরুতর অপরাধের পরও বেহেস্ত লাভ কি করে সম্ভব হলো জিজ্ঞেস করায় সে উত্তরে বললো একমাত্র নামাজ ব্যতীত অন্য কোন সৎকর্ম আমার ছিলো না। আমি প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকতাম এবং এশরাকের নামাজ সমাপ্ত করে উঠতাম। পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমার ঐ এশরাকের নামাজকে কবুল করে নিয়ে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন এবং বেহেস্ত এনায়েত করেছেন। এরপর গরীব-নওয়াজ (রাঃ) এরশাদ করলেন আরিফ এক সময় এমন এক স্তরে পৌঁছে যখন এক কদমে হেযাবে আযমত হতে হেজাবে কিবরীয়া পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপে ফিরে আসতে পারে। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা (রাঃ)-এর চোখে পানি এসে গেলো এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন এটাই আরিফদের নিম্নতম স্তর। কামালিয়াতের স্তর এর বহু উর্দ্ধে যার সঠিক নির্ধারণ খোদা তায়ালাই ভাল জানেন। কামেলগণ এক পদক্ষেপে কোথা হতে কোথায় যান এবং কোথা হতে কোথায় ফিরে আসেন তা শুধু আল্লাহ তায়ালা এবং কামেলগণই ভাল জানেন। এ পর্যন্ত বলার পর হুজুর আল্লাহতে মশগুল হলেন এবং মজলিস শেষ হলো।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক

দ্বিতীয় মজলিস

বৃহস্পতিবার। আমার কদমবুসি নসিব হলো। উপস্থিত মজলিসে মওলানা বাহাউদ্দিন বোখারী ও মওলানা শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ বোগদাদী খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। জানাবাত ও নাপাকী (সহবাস ও অপবিত্রতা) সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন সহবাসের অপবিত্রতা মানুষের লোমের গোড়া পর্যন্ত প্রবেশ করে। প্রত্যেকের উচিত এমতবস্থায় গোসলের সময় প্রতিটি লোমের গোড়ায় পানি পৌঁছানো এবং সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ ও লোমগুলি ভালভাবে ভিজিয়ে নেওয়া, যাতে একটা লোমও শুকনো না থাকে। যদি কোন একটি লোমও শুকনো থাকে তাহলে তার ফরজ গোসল শুদ্ধ হবেনা এবং হাশরের দিন শরীর তার সাথে শত্রুতা করবে অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে চলে যাবে। ''ফতুয়ায়ে জহিরা'' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মানুষের মুখ কখনও নাপাক হয় না বরং সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকে। নাপাক অবস্থায় কেউ পানি পান করলে অবশিষ্ট পানি নাপাক হয় না। কেউ পবিত্র থাকুক অথবা অপবিত্র থাকুক, মুমেন হোক অথবা কাফের হোক, সকলের মুখই সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকে। একদিন আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ''ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যদি কোন লোক নাপাকী অবস্থায় গরমের সময়ে রাস্তায় চলে এবং অপবিত্র গায়ের পছিনা (ঘাম) কাপড়ে লাগে তবে কাপড় নাপাক হবে কি? নবীয়ে দোজাহান (সাঃ) উত্তর দিলেন, 'না', নাপাক হবে না এবং তার থুথুও নাপাক হয় না। অর্থাৎ নাপাকীর থুথুও যদি কাপড়ে লাগে তবু কাপড় নাপাক হবে না। হযরত খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন আমি হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কুদ্দস্‌সু সেররুহু-এর মুখে শুনেছি যে, হযরত আদম (আঃ)-কে অপবিত্রতার অপরাধে বেহেস্ত হতে দুনিয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং দুনিয়ায় ক্ষমা লাভের পর যখন সে বিবি হাওয়া (আঃ)-এর সঙ্গে সহবাস ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তখন জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হয়ে তাঁকে গোসল করার জন্য উপদেশ দেন। হযরত আদম (আঃ) গোসল করায় তৃপ্তি পেলেন এবং বললেন ওহে ভাই জিব্রাইল এই গোসলের অন্য কোন ফায়দা বা বখশীস আছে কি? জিব্রাইল (আঃ) উত্তরে বললেন এর বিনিময়ে বহু সওয়াব (পূণ্য) আছে। প্রথমতঃ আপনার শরীর মোবারকে যত গুলো লোম আছে প্রত্যেকটি

লোমের জন্য এক এক বছরের ছওয়াব পাবেন। দ্বিতীয়তঃ ফরজ গোসলের এক এক ফোটা পানি হতে খোদা তায়ালা এক একজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করবেন, যারা কাল কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থেকে এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকবে এবং ঐ সব ফেরেস্তাদের এবাদত বন্দেগীর ছওয়াব আপনি পাবেন। পরে হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ওহে ভাই জিব্রাইল এ ছওয়াব কি শুধু বিশেষ ভাবে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন না পরবর্তী সময়ে যারা আমার আওলাদ হবে তারাও এ ধরনের কাজের পুরস্কার এভাবেই পাবে? উত্তরে জিব্রাইল (আঃ) বললেন আপনার আওলাদের মধ্যেও যারা ঈমানদার এবং মুসলমান হবে তারা যদি এমনি করে পবিত্রতার গোসল অর্থাৎ ফরজ গোসল নিয়মানুযায়ী করে তবে তারাও এর ছওয়াব এমনি ভাবেই পাবে, যে ভাবে আপনাকে দেওয়া হলো। এ ঘটনা বলতে বলতে খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ (রাঃ)-এর চোখ দুটো অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পুনরায় বললেন এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত শুধু তাদের জন্যই যারা ফরজ গোসল আদায় করে কিন্তু এমন একটি দল আছে যারা এ ঐশ্বর্য হতে বঞ্চিত। কেননা তাদের গোসল প্রায়ই নিষিদ্ধ সহবাসে ঘটে। আরও একটি দল আছে যাদের হালাল গোসলও পরিপূর্ণতার অভাবে বাতিল হয়ে যায়। যখন কেউ হারাম গোসল করে তখন আল্লাহতায়ালা তার আমল নামায় এক বছরের গোনাহ্‌ লিখে দেন এবং তার হারাম গোসলের প্রতি ফোটা পানি হতে এক একটি দৈত্য-দানব সৃষ্টি করেন, যারা কাল কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থেকে যে সকল পাপ করবে সে সমস্ত পাপই তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে।

এরপর এরশাদ করলেন, যদি কেউ তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করতে বাসনা করে তবে তার উচিত প্রথমে শরীয়তের যাবতীয় বিধি বিধান মেনে চলে শরীয়ত কায়েম করা। তরীকত পন্থীগণের শরীয়ত পরিপূর্ণভাবে পালনের পর, দ্বিতীয় স্তর, তরীকতে পদার্পণের যোগ্যতা অর্জন করা চাই। এরপর তরীকতের যাবতীয় বিধি বিধান পালনে সফল কাম হলে, তৃতীয় স্তর, মা'রেফাতে পদার্পণের যোগ্যতা অর্জিত হবে। মারেফাতের যাবতীয় কাজ কর্ম নিয়মানুযায়ী করে সফলতা অর্জন করতে পারলে, হকীকতের স্তরে প্রবেশের অধিকার পাবে। এখানে পেঁছে অর্থাৎ হাকীকতের স্তরে পদার্পণ করে স্থায়ী হলে শিক্ষার্থী যা কিছু কামনা করবে তাই পাবে। এরপর বললেন, আমি এক বুজুর্গের মুখে শুনেছি, সেই আরিফ, যে ব্যক্তি সফলতার সঙ্গে সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করে ''মাকামে ফারদানিয়াতে'' (শেষ স্তরে) পেঁছে সকল কিছু হতে বিমুক্ত হয়ে বলবে, ''বান্দাদের নিকট নামাজ

খোদা তায়ালার আমানাত''। বান্দার উচিত নামাজকে এমন ভাবে ধারণ করা যে ভাবে তার প্রাপ্য। নামাজ পড়ার সময় নামাজের আহ্‌কাম, রুকু, সিজদাহ ও অন্যান্য বিষয় সমূহের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রেখে নামাজ আদায় করা উচিত। 'সালাতে মাসউদী কিতাবে বর্ণিত আছে যখন নামাজী নামাজের আরকান আহ্‌কাম সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করে তখন ফেরেস্তা তার নামাজকে আসমানে নিয়ে যায়, ঐ সময় নামাজ হতে উদ্ভাসিত হয় একটি নূর, যার জ্যোতিতে আকাশের দ্বার উন্মোক্ত হয়। পরে ঐ নামাজকে আরশের নীচে পেশ করা হলে আল্লাহ্‌ তায়ালা হুকুম করেন সেজদা কর এবং বখশীস কামনা কর তার জন্য, যে তোমাকে আদায় করেছে। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা গরীব নওয়াজের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু পরিলক্ষিত হলো! ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আফসুস (দুঃখ) হয় তাদের জন্য যারা নামাজের বিধি-বিধান পালনে অবহেলা করে এবং সঠিক সময়ে নামাজ আদায় না করে। ফেরেস্তা এদের নামাজকে আকাশের নীচে নিয়ে গেলে আকাশের দরজা খুলে যায়। তখন আওয়াজ আসে, ''ফেরৎ নিয়ে যাও এ নামাজকে এবং যে আদায় করেছে তার মুখে নিক্ষেপ কর''। বড়ই পরিতাপের বিষয় তাদের জন্য, যারা সময় শেষে ও অন্তরবিহীন নামাজে অনর্থ সময় নষ্ট করে। এরপর হযরত খাঁজা (রাঃ) বললেন, এক সময়ে আমি বোখারায় ছিলাম। তখন কয়েকজন শায়েখের মুখে শুনেছি, ''হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নামাজে রত এক নামাজীকে দেখলেন, যার নামাজের সঙ্গে আরকান আহ্‌-কামের কোন মিল নেই অর্থাৎ নামাজী নামাজের আইন কানুন পালন করছেনা। হযরত নবী করিম (সাঃ) তার নামাজ শেষ না হওয়া অব্দি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। নামাজ শেষ হলে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ''কতদিন যাবত এ ধরনের নামাজ পড়ছ?'' উত্তরে সে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রায় চার বছর হলো আমি এ ভাবে নামাজ পড়ছি।'' হযরত সরওয়ারে কায়েনাৎ (সাঃ) তার উত্তর শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কেঁদে ফেললেন এবং তাকে বললেন, ''এই চারটি বছর অযথা নষ্ট না করে তুমি মরে গেলেও আমার সুন্নাতের অপমৃত্যু হত না। এরপর হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) বললেন আমি হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ)-এর মুখে শুনেছি কিয়ামতের দিন সমস্ত আম্বিয়া (আঃ), আউলিয়া (রঃ) ও মুসলমানগণের মধ্যে যাদের নামাজ পরিপূর্ণতার দাবীদার হবে শুধু তারাই মুক্তি পাবে দোজখের অগ্নি হতে। যাদের নামাজ পরিপূর্ণতা লাভ করেনি তারা জাহান্নামের আগুনের স্বাদ গ্রহণ করবে। এরপর এরশাদ করলেন, আমি এক সময়ে এক শহরে ছিলাম, নামটা

স্মরণ করতে পারছিনা, শহরটি শাম দেশের সন্নিকটে অবস্থিত। শহরের বাইরের একটা গুহায় একজন কামেল বুজুর্গ বসবাস করতেন, তার নাম ছিল হযরত শায়খ মুহাম্মাদুল ওয়াহেদ আজিজী (রঃ)। ভাবনা চিন্তায় তাঁর শরীরের মাংস নিঃশেষ হয়ে চামড়া হাড়ের সাথে সখ্যতা স্থাপন করেছিল। নিজে জায়নামাজে উপবিষ্ট ছিলেন এবং দু'টো বাঘ পাহাড়া দিচ্ছিল। আমি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী ছিলাম কিন্তু বাঘ দুটোর ভয়ে ভিতরে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। শায়খ সাহেব যখন আমাকে দেখলেন, বললেন ভিতরে এসো ভয় পেয়োনা। তাঁর আহ্বানে ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আদবের সাথে জমিনে চুমু খেয়ে (জমিন বুসি) বসে পড়লাম। তিনি আমাকে অনেক উপদেশ মূলক বাক্য দান করলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছিঃ (১) যদি তুমি কোন কিছুর প্রত্যাশা না কর তবে সেও তোমার প্রত্যাশা করবেনা। (২) যার অন্তরে খোদা ভীতি আছে তাঁকে দেখে সবাই ভীত হয়। বাঘের কি ক্ষমতা আছে তার ক্ষতি করবে? তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, দরবেশের কোথা হতে আগমন? আমি উত্তর দিলাম বাগদাদ হতে। বেশ ভাল, দরবেশদের খেদমত করতে থাক যাতে দরবেশীর শেষ মোকামে (স্তরে) পেঁছতে পার। তারপর নিজের কথা বললেন, অনেকগুলো বছর কেটে গেল এই গুহায়, দুনিয়ার সমস্ত কিছু বর্জন করে শুধু একটা ভয়ে রাত দিন কেঁদে কেঁদে পার করছি। ভয়টা জানার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিলেন, "নামাজের কথা স্মরণ করে। নামাজ আদায় করার পর পরই আমি ভয়ে ভীত হয়ে পড়ি, না জানি অজ্ঞাতে নামাজের মাঝে কোথায় কি ভুল করে বসেছি। কেননা আমি তো নিঃসন্দেহ নই যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমার নামাজ কবুল করেছেন। এরপর তিনি আমাকে একটা সেফ (আপেল) দিলেন এবং উপদেশ দিলেন, চেষ্টা কর যাতে শ্রেষ্ঠ নামাজীর মর্যাদা অর্জন করতে পার; তা না হলে হাশরের দিন লজ্জিত হতে হবে এবং কাউকে মুখ দেখাতে পারবেনা। এ ঘটনা বর্ণনার শেষ প্রান্তে হযরত খাজা বাবার চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বলতে লাগলেন, দরবেশদের নামাজ ধর্মের (দ্বীনের) স্তম্ভ এবং নামাজের রুকন নামাজের স্তম্ভ। যদি ঘরের খুঁটি বা স্তম্ভ মজবুত থাকে তাহলে ঘর খাড়া থাকবে। যখন ঘরের স্তম্ভ বা খুঁটি থাকবেনা তখন ঘরও আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা পাবেনা বরং পড়ে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি নামাজের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, অর্থাৎ আরকান আহ্কাম- ও অন্তরবিহীন নামাজ আদায় করে, তারা ইসলামকে বিধ্বস্ত করে। "শরহে সালাতে মাস্উদী" কিতাবে হযরত ইমাম জাহেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

আল্লাহ্ তায়ালা নামাজ-সম্বন্ধে যতখানি তাকিদ দিয়েছেন অন্য কোন ব্যাপারে এত অধিক তাকিদ দেননি। হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রঃ আঃ) বলেছেন আল্লাহ তায়ালা কোরান শরীফে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ, আদেশ, নিষেধ ও নির্দেশ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে কিছু প্রশংসা, কিছু সম্ভাষণ, কিছু পুরস্কার ও কিছু শাস্তির বাণী, আরও রয়েছে চলার পথের দিশা। এর মধ্যে একমাত্র নামাজ (সালাত-এবাদত বন্দেগী সমূহ) সম্বন্ধেই বলা হয়েছে সাত শত বার। নামাজ ও বন্দেগী সম্বন্ধে এত অধিক তাকিদ দিয়েছেন এ জন্য যে ইহা ধর্মের স্তম্ভ। হযরত মারুফ কারখী (রঃ)-এর তফসীরে বর্ণিত আছে হাশরের ময়দানে পঁচাশ যায়গায় থামতে হবে এবং পঁচাশ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে অর্থাৎ হিসাব নিবে। এর মধ্যে সব চেয়ে কঠিন ষ্টেশন হলো নামাজের হিসাবের স্থান। যে ব্যক্তি এখানে ছাড়া পাবে তাকে দ্বিতীয় কঠিন ঘাটির সন্মুখীন হতে হবে। সেখানে নামাজের ফরজ সমূহের উপর হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে এখানেও উত্তীর্ণ হয় ভাল, নচেৎ দোজখে পাঠানো হবে। তৃতীয় কঠিন স্থান হচ্ছে পয়গম্বর (আলায়হেস্‌সালাম)-এর সুন্নাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের স্থান। এখানে যদি সে টিকে যায় তো খুবই ভাল নতুবা রসুলের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং বলা হবে এ আপনার সেই উম্মত যে আপনার সুন্নাত পালন করেনি। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ (রাঃ) নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না ; হায় হায় করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, একটু সামলিয়ে নিয়ে পড়ে বললেন, আফসুস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে কিয়ামতের দিন সরওয়ারে কায়েনাৎ হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ)-এর নিকট লজ্জায় মুখ ঢাকবে এবং বলবে, "হায়! আমি এখন কোথায় যাব?" এরপর হযরত তেলাওয়াতে মশগুল হলেন। মজলিস এ দিনের মত শেষ হলো। আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

দিনটি ছিল বুধবার। পদচুম্বনের (কদমবুসি) ঐশ্বর্য নসিব (ভাগ্য) হলো। দু'জন সমরকন্দি দরবেশ সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন। পরে মওলানা বাহাউদ্দিন বোখারী হাজির হলেন। এরপর শায়খ আহাদ কিরমানী (রঃ) উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। আলোচনা শুরু হলো নামাজ পড়ার সঠিক সময় সম্বন্ধে। প্রশ্ন উথাপিত হলো নামাজ বিলম্বে পড়া ভাল না অবিলম্বে (তা'খীর ইয়া তকদীম)? হুজুর এরশাদ করলেন, সৌভাগ্যবান তারাই যারা নামাজের সময়ের ব্যাপারে ঢিলেমী না করে নির্দ্ধারিত সময়ে আদায় করে এবং অত্যন্ত দুঃখ অনুভব হয় ঐ মুসলমানদের জন্য যারা বন্দেগীতে ত্রুটী করে। এরপর বললেন আমি এক সময়ে কোন এক শহরে ছিলাম যার নাম স্মরণ হচ্ছে না। ঐ শহরের মুসলমানদের রীতি ছিল সঠিক সময়ের একটু পূর্বেই নামাজের প্রস্তুতি পর্ব সেরে নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নামাজের সময়ের পূর্বেই এ ভাবে প্রস্তুতির কারণ কি? উত্তরে তারা বললো এতে সুবিধা আছে এই যে, সময় হওয়ার সাথে সাথেই নামাজ আদায় করতে পারি, তা না হলে নামাজের প্রস্তুতির জন্য নামাজে দেরী হয়ে যেতে পারে। এমন কি সময় শেষও হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। আমরা কাল কিয়ামতের ভয়ে এই জন্য ভীত যে নামাজে অবহেলার জন্য নবী (সঃ)-এর নিকট শেষে লজ্জিত না হতে হয়। রসুলে খোদা (সঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে মৃত্যুর পূর্বেই তওবা কর নচেৎ সময় পাবেনা এবং যথা সময়ে নামাজ আদায় কর নতুবা নামাজ পাবেনা। এরপর এরশাদ করলেন হযরত ইমাম এহ্ইয়া হাসান জিন্দুসী (রঃ) প্রণীত 'রওজা' কিতাবে আমি লেখা দেখেছি, এবং আমার ওস্তাদ মওলানা হিসামউদ্দিন মুহম্মদ বোখারী (রঃ) কে বলতে শুনেছি যে, রসুলে খোদা (সঃ) এরশাদ করেছেন ভদ্রোচিত গোনাহের মধ্যে রয়েছে দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া। এরপর বললেন একবার হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ) -খেদমতে হাজির ছিলাম তিনি বলছিলেন যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে রওয়ায়েত আছে যে, রসুলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যদি কেউ সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আসরের নামাজ আদায়ে অবহেলা করে অথবা সূর্যের স্বাভাবিক রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আদায় না করে তার জন্য শত হাজার আফসোস।

পরে সব সাহাবীগন আরজ করলেন "ইয়া রাসুলাল্লাহ, একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিন। হযরত রসূলে দোজাহান (সাঃ) এরশাদ করলেন সূর্যের রং পরিবর্তনের পূর্বে এবং আলো তার স্বাভাবিক বর্ণে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ গাঢ় হলুদ (জরদ) বর্ণ হওয়ার পূর্বে আসর আদায় করবে। শীত ও গ্রীষ্ম সব সময়ের জন্যই একই নির্দেশ। "হেদায়া" কিতাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে "রসূলে করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন সকালের (ফজরের) নামাজ সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোরের আলো যখন উদ্ভাসিত হয় তখন পড়লে সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। যোহরের নামাজ গরমের দিনে বাতাসের উত্তপ্ততা কমে গেলে (সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে) এবং শীতের সময়ে সাধারণ নিয়মে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে তিনি আরও হাদীসের উল্লেখ করলেন, "গরম কালে দুপুরের নামাজ (যোহর) পড়বে যখন প্রকৃতি ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে।" কেননা গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় দোজখের মুখ খোলা থাকলে। পরে বললেন একবার হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) কতৃক ফজরের নামাজ কাজা (নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়া) হয়ে যাওয়ায় তিনি এত কাঁদলেন যার জন্য করুণাময় আল্লাহ, তাকে -গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে আশ্বস্ত করলেন, "হে বায়েজীদ বোস্, তোমার এ অনুতাপে হকতায়ালা তোমার আমল নামায় হাজার নামাজের ছওয়াব এনায়েত করেছেন"। এরপর এরশাদ করেন যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ভাবে নামাজের সঠিক সময়ে নামাজ সমাপণ করতে থাকে কিয়ামতের দিন নামাজ ঐ ব্যক্তির আগে আগে চলতে থাকবে। এরপর এরশাদ করলেন, রসূলে আক্রাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে নামাজ পড়েনি তার ঈমান ছিল না। অর্থাৎ যে নামাজ আদায় করে না তার ঈমান নেই। এরপর বললেন হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ) হতে কথিত আছে হযরত ইমাম জাহেদ (রঃ) এ আঁয়াত করিমের তফসীরের ব্যাখ্যায় বলেছেন "(ফাওয়াই লুল্লিল মুছাল্লিনাল্লাজিনা হুম আন ছালাতিহিম ছাহুন" অর্থ সুতরাং দুর্ভোগ সেই সমস্ত নামাজীদের যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন)"-এর ব্যখ্যায় লিখেছেন "ওয়ায়েল" নামে দোজখের মধ্যে একটা কুপ বা স্থান আছে যার চেয়ে অধিক আযাব (শাস্তি) কোন দোজখে নেই এবং ঐ শাস্তি ঐ সব নামাজীদের জন্য যারা সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করেনা। "ওয়ায়েল"-এর তফসীরে হযরত ইমাম জাহেদ (রঃ) বলেছেন 'ওয়ায়েল' আযাবের প্রচণ্ডতায় কাঁদতে কাঁদতে ৭০,০০০ বার এলাহির দরবারে আরজ করেছে 'হে খোদা এত কঠিন আযাব 'কাদের জন্য?" ফরমানে এলাহি হলো (আল্লাহর নির্দেশ হলো), "তাদের জন্য, যারা নামাজ ঠিক সময়ে পড়েনা এবং কাজা করে।"

এরপর এরশাদ করলেন, একবার হযরত ওমর (রাদিঃ) মাগরেবের নামাজ আদায় করার পর দেখলেন আকাশে নক্ষত্র দেখা দিয়েছে, তিনি ঘরে যেয়ে একজন গোলাম আজাদ করে দিলেন। কারণ সূর্যাস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরেবের নামাজ পড়া সুন্নাত।

পরে সদকা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খঁাজায়ে খঁাজেগান (রাঃ) এরশাদ করলেন যদি কেউ ক্ষুধার্থকে পেট ভরে আহার করায়, হক সোবাহান তায়ালা তার ও দোযখের মাঝে সাতটা পর্দা দঁাড় করাবেন এবং এক পর্দা হতে অপর পর্দার দূরত্ব হবে পঁাচশত বছরের পথ। এরপর 'কসম' (শপথ) খাওয়ার ব্যাপারে কথা উঠলো। তিনি এরশাদ করলেন যে ব্যক্তি মিথ্যা 'কসম' খায় সে স্বীয় পরিবার বর্গকে বিধ্বস্ত করে। সম্পদ ও সৌভাগ্য (বরকত ও জখিরা) তার ঘর থেকে তুলে নেওয়া হয়। এরপর এরশাদ করলেন একবার আমি বাগদাদ জামে মসজিদে মওলানা ইমাদ উদ্দিন (রঃ), যিনি অত্যন্ত খ্যাত নামা বুজুর্গ ছিলেন, তাঁর মুখে শুনেছি যে "খোদা তায়ালা হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট দোজখের বর্ণনা দিতে যেয়ে বললেন, "হে মুসা, দোজখের মধ্যে 'হাবীয়া' নামে একটা ঘর তৈরী করা হয়েছে এবং এই হাবী-য়াই হল দোজখের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির স্থান, সেখানকার অন্ধকারের সামনে অমাবস্থার অন্ধকারও তুচ্ছ, শাপ-বিছায় পরিপূর্ণ, রাশি রাশি পাথর রয়েছে, সেগুলি প্রতিদিন উত্তপ্ত করা হয়। হে মুসা, যদি ঐ আযাবের এক বিন্দুও দুনিয়াতে পতিত হয় তাহলে সারা দুনিয়ার পানি শুকিয়ে যাবে এবং পাথরও গলে যাবে। উত্তাপের প্রচণ্ডতায় সাত জমিন ফেটে যাবে। হে মুসা এ আযাব ঐ সব লোকদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাদের মধ্যে একদল, যারা নামাজ ত্যাগ করেছে এবং দ্বিতীয়, যারা আমার নামে মিথ্যা কসম খায়। এর পর বললেন মুহাম্মদ আসলাম তৌসী (রঃ) নামে একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন, একবার দুরাবস্থায় অজ্ঞানে কসম করেছিলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি অন্যান্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি কসম খেয়েছি?" উত্তরে তারা বলল, হঁা আপনি কসম খেয়েছেন। তিনি বললেন আমার নফস আজ অনাদ্ধ হয়েছে, আজ সে সুযোগ পেয়ে কসম খেয়েছে; কাল আরও খাবে এবং যখন অভ্যাস হয়ে যাবে প্রতিদিন খেতে থাকবে। এ সব কথা চিন্তা করে তিনি প্রকৃতই কসম খেলেন, "যতদিন জীবিত থাকব কারও সাথে আর কথা বলব না"। এই ঘটনার পর তিনি ৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন, এর মধ্যে তিনি তাঁর শপথ ভঙ্গ করেন'নি। অর্থাৎ কারও সাথে কথা বলেন নি।' হযরত খাঁজা কুতুব সাহেব (কুঃ সেঃ) বলেছেন আমি হযরত খ'াজা বুজুর্গ (রঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যখন

কারও কসমের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে কি ভাবে তা রক্ষা করে ? হযরত খাঁজা বুজুর্গ আদমাল্লাহ্ বারকাতাহু এরশাদ করলেন ইশারা দ্বারা প্রয়োজন সমাধা করে। হযরত খাঁজা বুজুর্গ নূরুল্লাহ্ মারকাদাহু এ পর্যন্ত বয়ান করার পর আল্লাহতে মশগুল হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দরবার ত্যাগ করলেন। মজলিস এদিনের মত এখানেই সমাপ্ত হলো। আলহামদু লিল্লাহ্ আলা জালেক।

—০—

চতুর্থ মজলিস

সোমবার প্রথমে কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন হলো, শেখ শিহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রঃ), খাঁজা আযল শিরাজী (রঃ), এবং শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখিরজী (রঃ) দেখা করার জন্য এসেছিলেন। আলোচনা শুরু হলো প্রশ্ন দিয়ে, "মুহব্বতে সাদিক" (সত্য প্রেমিক) কে? হুজুর এরশাদ করলেন যখন কোন বালা (দুঃখ-কষ্ট) বন্ধুর নিকট হতে আসে এবং যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ইহা গ্রহণ করে সেই মহব্বতে সাদিক। এরপর হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রঃ) বললেন আলমে শওক এবং ইশতিয়াক (জড়জগতের সন্তুষ্টি ও আকাঙ্খা) তার উপর থেকে এমন ভাবে নিঃশেষ হয় যখন তার মাথার উপর তরবারির হাজার আঘাত হানলেও তার চৈতন্যোদয় হবেনা। এরপর হযরত খাঁজা আযল শিরাজী (রঃ) বললেন মওলার সাথে প্রকৃত বন্ধুত্বের দাবীদার সেই, যাকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে জালিয়ে ছাই করে দিলেও তার মুখ দিয়ে রা শব্দটি বেরোবে না। এরপর শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখিরজী (রঃ) বললেন মওলার প্রকৃত বন্ধু সেই যার উপর প্রায়ই বিপদ আপদ নিপতিত হতে থাকা সত্যেও সে বন্ধুর প্রেমে সমস্ত কিছুকে ভুলে থাকে এবং দুঃখ দুর্দশায় কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। শায়খ সায়ফুদ্দিনের বক্তব্য পেশ করার পর খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন শায়খ সায়ফুদ্দিনের বক্তব্য শায়খ শিহাবুদ্দিনের বক্তব্যেরই অনুরূপ ; "কেননা আসারে আউলিয়া"র লেখা দেখেছি একবার হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ), খাঁজা হাসান বসরী (রঃ) মালেক বিন দিনার (রঃ) এবং হযরত খাঁজা শকীক বলখী (রাঃ) বসরায় একত্রে বসে "মওলার প্রকৃত বন্ধু" সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। হযরত মালেক বিন দিনার (রঃ) বললেন মওলার সাথে প্রকৃত বন্ধুত্বের দাবীদার সেই, যার প্রতি বন্ধুর তরফ থেকে বালা-মুসিবত আসা সত্যেও সে তাতে খুশী থাকে। হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বললেন এরচেয়ে আরও অধিক হওয়া উচিত। এরপর খাঁজা শকীক বলখী (রঃ) বললেন মওলার সাথে বন্ধুত্বে সাদিক সেই যাকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তাঁর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। পরে খাঁজা হাসান বসরী (রঃ) বললেন মওলার সাথে সাদিক বন্ধুত্ব তারই ঘটে যার উপর দুঃখ দুর্দশা নিপতিত হলেও সে তাতে নির্ভরশীল থাকে। রাবেয়া বসরী (রঃ) বললেন দু'জনের

সবগুলো একই আভাস পাওয়া যায়। এরপর রাবেয়া বসরী (রঃ) বললেন মওলার বন্ধুর মালিক সেই যখন তাকে দুঃখ কষ্ট প্রদান করলেও সে তাঁকে ভুলেন। খাজা হাসান বসরী (রঃ) বললেন, আমিও সমর্থন করছি, শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখিরজী (রঃ) বললেন মহব্বতের কথা একেই বলে। এরপর 'খোন্দা' বা হাসি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হুজুর এরশাদ করলেন, 'আসল খোন্দা' হলো উচ্চহাসি যা কবিরা গুনাহের মধ্যে গণ্য হয় এবং সলুকের উচ্চহাসিকে খোন্দা বলে। এরপর হুজুর এরশাদ করলেন প্রথম তামাশা ও খোন্দা অর্থাৎ উচ্চহাসি কবরস্থানে নিষেধ। কেননা উহা শিক্ষা গ্রহণের স্থান; খেলা ধুলার স্থান নহে। রসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন মানুষের চলাচল কবরস্থান দিয়ে হয়, তখন মৃত ব্যক্তি বলে, হে উদাসীন যদি তোমার জানা থাকত যে আমার উপর কি ঘটেছে এবং তুমিও যার সম্মুখীন হবে; তখন তোমার উপরও ঘটবে, সে সময় তোমার চামড়া-মাংস বিগলিত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, এক সময়ে কিরমান দেশে শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানীর সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম, একজন বুজুর্গকে দেখলাম যিনি অত্যন্ত সাহাবে নিয়ামত (ঐশী আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি) ও মশগুল ছিলেন। আমি এমন মশগুল আর কাউকে দেখিনি। আমি ছালাম দিয়ে কাছে গেলাম, দেখলাম শরীরে মাংস ও চামড়া কিছুই নেই আছে, শুধু রুহ। কথা খুবই কম বলেন। আমি ইচ্ছে করলাম তাঁর এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করব। তিনি তাঁর আলোকিত অন্তরের মাধ্যমে আমার ইচ্ছা বুঝতে পেরে বললেন, "ওহে দরবেশ আমি আমার এক বন্ধুর সাথে একদিন কবরস্থানে গেলাম। সে একটা কবরের নিকট থামল। বন্ধু যুবকেটির কৌতুকপূর্ণ কথায় আমি হাসি সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি যে কবরে বসে ছিলাম সেখান হতে আমার হাসিকে উদ্দেশ্য করে আওয়াজ হলো, "হে উদাসীন (গাফেল) যার সম্মুখে এমন কঠিন বাসস্থান যার প্রতি হুলী "মালেকুল মউত," যে মাটিতে রয়েছে সাপ এবং অজগর, সেটা হবে তার বাসস্থান; তার পরেও এভাবে হাসার অর্থ কি? যখন আমি এ আওয়াজ শুনলাম বন্ধুকে আহ্বান করে আস্তে আস্তে উঠে পরলাম, সে তার নিজের বাসস্থানে চলে গেল এবং আমি এই গুহায় প্রত্যাবর্তন করে নিশ্চুপ রইলাম। ঐ দিন হতে আমি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্থ, সন্ত্রাসিগ্রস্থ এবং ভয়ে আমার প্রাণ উষ্ঠাগত। আজ ৪০ বৎসর হলো আমি হাসি নি এবং লজ্জায় উর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করি নি; কেননা কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি কি করে এ মুখ দেখাব। আর এক বুজুর্গ ছিলেন যাঁর নাম আতায়ে ছলমী (রঃ)। তিনিও ৪০ বৎসর উর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করেন নি, দিনরাত তিনি অকরে

কাঁদতেন। জনগণ তাঁর এ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাব দেন। কবর এবং কিয়ামতের ভয়ে আমার এ অবস্থা। পরে প্রশ্ন করা হলো আপনি উর্ধ্বাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ হতে বিরত কেন? উত্তরে বললেন, আমি অত্যধিক গুনায় জর্জরিত এবং মজলিসে খুব হাসতাম, তাই লজ্জায় উর্ধ্বগগণে দৃষ্টিপাত করিনা। এরপর খাঁজা বুজুর্গ খাঁজা ফতেহ মও-সলি (রঃ)-এর ঘটনার বর্ণনায় বললেন যে তিনি এক মহান বুজুর্গ এবং জমানার আল্লামা ছিলেন। যিনি ৮ বৎসর এমনভাবে ক্রন্দন করেছেন যে তাঁর গণ্ডদেশ হতে মাংস গলে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর লোকজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ পাক আমায় ক্ষমা করেছেন। যখন আমাকে আর্‌শে আযীমের নীচে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি অত্যন্ত সবিনয়ে ভীতগ্রস্ত ও কম্পিত অবস্থায় সেজদাবনত হলাম; সম্ভাষণ হলো, "হে ফতেহ মও-সলি, এত কাঁদছ কেন? তুমি কি জানতে না যে আমি ক্ষমাশীল?" আমি পুনরায় সেজদাবনত হলাম এবং আরজ করলাম, হে প্রভু সে কেমন ব্যক্তি, যে তোমায় গাফ্‌ফার (ক্ষমাকারী) মনে না করে? কিন্তু আমি মৃত্যু-স্মরণে ও কবরের সংকীর্ণতার ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদতাম। কারণ, না জানি এই সংকীর্ণ কবরে আমার কি অবস্থা ঘটবে? এরপর আল্লাহ তায়ালার হুকুম হলো যখন এতসব ব্যাপারে তুমি আতঙ্কিত তখন সমস্ত সন্ত্রাস হতে তোমাকে মুক্ত করা হলো। খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ এরশাদ করলেন আমি সিস্তানে হযরত সাইয়েদেনা খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ)-এর সাথে ভ্রমণে ছিলাম। একদিন এক এবাদত গাহে পৌঁছলাম। সেখানে হযরত শায়খ ছদরুদ্দিন মুহম্মদ আহ্‌মদ সিস্তানী (রঃ) কল্পনাতীত ভাবে তন্ময় অবস্থায় ছিলেন। আমি কয়েকদিন ঐ বুজুর্গের সোহবতে ছিলাম, যে কেহই তাঁর এবাদত গাহে আসত কাউকেই তিনি নিরাশ করতেন না। তিনি ভিতরে যেয়ে কিছু এনে তাকে দিয়ে বলতেন, আমার জন্য দোয়া খায়ের কর যেন আমি ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারি। এ বুজুর্গ যখন কবরের কঠিন আযাবের কথা শ্রবন করতেন তখন ভয়ে কাঁপতে থাকতেন এবং চোখ দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত-অশ্রু প্রবাহিত হতো। ৭ দিনের মধ্যেও এ অবস্থার পরিবর্তন হতো না। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকতেন, তাঁর কান্না দেখে আমারও কান্না আসত। এরপর বললেন, "হে প্রিয় যার মৃত্যু অবধারিত এবং 'মালেকুল মওত' যার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার শয়ন করা, হাসা বা সন্তুষ্ট থাকা কি শোভা পায়? তুমি যদি তাদের কথা জানতে, যারা মাটির

নীচে শায়িত অবস্থায় এমন ঘরে কারারুদ্ধ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স াপ-বিচ্ছু ভর্তি ; তাহলে এমনভাবে বিগলিত হতে যে ভাবে নিমক পানিতে গলে যায়। এরপর হযরত খাঁজায়ে খাঁজেগান এরশাদ করলেন এক সময় আমি এবং একজন কামেল বুজুর্গ বসরা শহরের কবরস্তানে বসা ছিলাম, আমাদের সম্মুখে একজন মৃতের গোর আযাব হচ্ছিল আমার সঙ্গী বুজুর্গ যখন ঐ আযাব দেখলেন তখন খুব জোরে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি উঠাতে চেষ্টা করতেই বুঝলাম দেহে রুহ নাই। কিছুক্ষনের মধ্যেই তাঁর দেহ পানির মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি তাঁর মধ্যে যে ভয় দেখেছি অন্য কারও মধ্যে তেমন দেখিনি এবং কখনও শুনিনি। তারপর এরশাদ করলেন আমি ঐ দিনের পর হতে ভীষণ ভয়-ভীতির মধ্যে কালাতিপাত করছি। এই ঘটনার ত্রিশ বৎসর পর তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম। হে বন্ধুগণ, দুনিয়ার প্রতি এত মশগুল হয়োনা, যাতে স্রষ্টাকে ভুলে যাও। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি দুটো খোরমা আমাকে দান করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ভয়ের প্রভাব অধিক হলে হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর এরশাদ করলেন এ ব্যাপারটা বড়ই কঠিন ; যে রেহাই পেলো সেই বাঁচল। পরে বললেন কবরস্তানে রুটি খাওয়া, পানি পান করা অথবা অন্য কিছু আহার করা কবিরা গোণাহের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি একটা লিখিত ঘটনার বর্ণনা দিলেন, হযরত ইমাম এহ্ইয়া হাসান জিন্দুসী (রঃ) প্রনীত "রওজা" কিতাবে বর্ণিত আছে হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "মান আকালা ফিল মাকাবারে তায়ামান আও শারাবান ফাহুয়া মালউ'নুন ওয়া মুনাফিকুন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবরস্তানে কিছু খায় বা পান করে সে অভিশপ্ত (মালউ'ন) বা কপট-ভণ্ড (মুনাফিক)। এরপর হযরত খাঁজা হাসান বসরী (রঃ) এর কথা বর্ণনা করে বললেন, তিনি একদল মুসলমানকে দেখলেন কবরস্তানে আহার করছে এবং পানি পান করছে ; খাঁজা হাসান বসরী (রঃ) তাদের সম্মুখে যেয়ে বললেন, "তোমরা মোনাফিক না মুসলমান ?" এ প্রশ্নে তারা খুব রাগান্বিত হয়ে তাকে প্রহার করার জন্য উদ্যত হওয়ায় তিনি বুঝিয়ে বললেন, এ কথা আমার নিজের নয় ; হযরত রসুলে আক্রাম (সাঃ)-এর বাণী। তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্তানে আহার করে বা পানি পান করে সে মুনাফিক। কারণ, কবরস্তান ভয় ও শিক্ষা গ্রহনের স্থান। এ মাটিতে কত তোমাদের মত এবং কত তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শায়িত আছে যাদেরকে পিঁপীলিকায় ভক্ষণ করেছে। তাদের সৌন্দর্য এই মাটিতে মাটি হয়ে

মিশে গেছে। তোমরা জীবিতরা তাদেরকে এই ভূমিতে শোয়ায়ে রেখেছ। তারপর কি করে তোমরা এটাকে পানাহারের জায়গা হিসেবে বেছে নিলে? তিনি এ পর্যন্ত বলে চুপ হয়ে গেলেন। খাঁজা হাসান (রাঃ)-এর উপদেশ তাদের অন্তরে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো যে তারা তৎক্ষণাৎ তওবা করলো এবং নিজেদের অপরাধের জন্য মাফ চেয়ে নিলো। বাকী জীবনের জন্যেও তারা তাদের তওবার উপর কায়েম ছিল। এরপর খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) অনুরূপ আর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। ''রায়াহীন'' কিতাবে উল্লেখ আছে যে এক সময়ে হুজুর করিম (সাঃ) এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা তখন হাসি ঠাট্টায় মশগুল ছিল। হযরত (সাঃ) চলার গতি থামিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন। তারা হাবীবে খোদা (সাঃ)-কে দেখে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে গেলো। হুজুর আক্রাম (সাঃ) তাদেরকে বললেন, ''ওহে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা কি মৃত্যুকে ভয় কর না?'' সকলে এক সঙ্গে উত্তর দিলো, 'খায়ের' ইয়া রাসুলাল্লাহ, মৃত্যুকে কে না ভয় করে? হজরত পয়গম্বর (সাঃ) এরশাদ করলেন যারা মৃত্যুকে ভয় করে তাদের হাসি-ঠাট্টায় কি কাজ? সরদারে কায়েনাৎ (সাঃ) এর পবিত্র উপদেশ এমন ভাবে তাদেরকে পরিশোধিত করেছিল যে পরবর্তীতে কোন দিন আর তাদেরকে কেউ হাসতে দেখেনি।

অতপর রৌশন জমির খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) এরশাদ করলেন, ঠিক এমনি ভাবে আম্বিয়া ও আউলিয়া কেরামগণ পৃথিবীকে নিকৃষ্ট ভেবেছে এবং তার উপর লা'নত (অভিশাপ-ভৎর্সনা) করেছেন। এর কারণ এই যে মৃত্যু ও গোর আযাবের ভয় তাদের মনে গেঁথে গিয়ে ছিল। পরে এরশাদ করলেন আহলে সলুক কোন মুসলমান ভাইকে তিনবার দুঃখ দিলে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য হয় এবং এর চেয়ে আর বড় গুনাহ নেই। এ সম্বন্ধে কোরান শরীফে হক তায়ালা এরশাদ করেন, ''ওয়াল্লাজিনা ইউজুনাল মু'মেনিনা বেগায়রে মাকতাসাবু ফাক্বাদ এহ্তামানু বুহ্তানাও ওয়া ইসমান মুবিনা। অর্থ যারা অনর্থ দুঃখ দেয় মুসলমানদেরকে নিশ্চয়ই তারা অর্জন করেছে অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহ। আসল কথা হলো বিনা কারণে যারা কষ্ট দেয় মুসলমান ভাইকে তারা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিতে পতিত হয়। এরপর একটা ঘটনা বললেন, এক বাদশাহ আল্লাহ্্র বান্দাদের প্রতি এমন জোর-জুলুম করত যে বিনা কারণে তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করত এবং হত্যা করত। কিছু দিন পর ঐ জালিম বাদশাহ্কে বাগদাদের কংকরী মসজিদের নিকটে দেখা গেল, ধুলায় লুন্ঠিত এলোমেলো মাথার চুল, ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্য হতে বঞ্চিত। একজন লোক তাকে দেখে চিনল এবং জিজ্ঞেস

করল। 'তুমি কি সেই বাদশাহ নও যে মক্কা শরীফে জনসাধারণের প্রতি জুলুম করত? সে লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমিই সেই লোক"। কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কি করে? লোকটি বলল আমি তোমাকে সেই সময় ধন-দৌলতের ঐশ্বর্যে দেখেছি যখন তুমি বিনা কারণে লোকদের প্রতি জুলুমের শাসন কায়েম করেছিলে এবং খোদার ভয় হতে চোখ বন্ধ করে ছিলে। বাদশাহ বলল এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমি তাই করতাম এবং আমার বর্তমান অবস্থা সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। এরপর হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রঃ) আর একটা ঘটনা বললেন। আমি তখন দজলা নদীর তীরে এক এবাদত খানায় গিয়েছিলাম সেখানে একজন বুজুর্গ স্থায়ী ভাবে বাস করতেন। আমি সালাম করলাম তিনি ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। একটু পরে তিনি আমার সঙ্গে আলাপে রত হলেন। বললেন পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ জন-কোলাহল হতে এখানে এসে নিঃসঙ্গ ভাবে বসে আছি। তোমার মত আমিও এক সময় ভ্রমণ করতাম। তৃতীয় ভ্রমণকালীন সময়ে এক শহরে অবস্থান করছিলাম। একজন ধনবান লোককে দেখলাম বাজারে দাঁড়িয়ে বিক্রেতার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ও দূর্ব্যবহার করছিল এবং নিজের গ্রাহকদেরেও কষ্ট দিচ্ছিল। আমি ধনী লোকটিকে কিছু না বলে নিশ্চুপ চলে এলাম। হঠাৎ গায়েবী আওয়াজ হলো "যদি তুই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ঐ দুনিয়ার মুর্দার থেকে চলে না এসে তাকে বুঝিয়ে দিতি যে এ রকম দূর্ব্যবহার অন্যায়; তাহলে এমনোত হতে পারত যে তোর কথা মেনে নিয়ে সে জুলুম থেকে বেঁচে যেত।" যেদিন থেকে আমি এ আওয়াজ শুনেছি সেদিন হতে এই এবাদতগাহে বসবাস করছি। কখনও এর বাইরে পা রাখি নি। এ ঘটনার পর হতে আমি অত্যন্ত ভীত আছি যে রোজ হাশরে যখন এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করবে তখন কি জবাব দিব? ঐ তারিখের পর হতে আমি কসম খেয়েছি আর কোথাও যাব না। কেননা যদি এমন কোন ঘটনা আবার আমার সম্মুখে পড়ে এবং আমি তার জন্য জবাবদিহী হই? সন্ধ্যা হলে অদৃশ্যলোক হতে (গায়েবী) দু'টো গমের রুটি এবং একবাটী পানি এল। আমরা দু'জন এক সংগে বসে ইফতার করলাম। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তার জায়নামাজের তলা হতে আমাকে দু'টো আপেল দিলেন। তারপর আমি বাগদাদে ফিরে এলাম।

হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রঃ) এরশাদ করলেন আহলে সলুকদের মাঝে যে চতুর্থবার কবীরা গুণাহ করে তার অবস্থা এমন হয় যে, যদি সে আল্লাহ্ পাকের নাম শ্রবণ করে এবং কালাম পাক পাঠ করে তবু তার অন্তর নরম হয়না এবং ঈমানও বৃদ্ধি হয় না এবং না হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি সে আল্লাহর করুণ কামনা করে

এবং খেল-তামাশায় মশগুল থাকে তবে সেটা খুবই খারাপ কথা। কোরান মজিদের নির্দেশ "ইন্নামাল মু'মেনিনাল্লাজিনা এজা জুকেরাল্লাহু ওয়া জিলাত কুলুবাহুম ওয়া এজা তুলেইয়াত আলাইহিম আইয়াতুহু জাদাতহুম ইমানাও ওয়া আলা রাব্বেহিম ইয়া তাওয়াক্কালুন." নিশ্চয়ই মু'মেন ঐ ব্যক্তি যাদের নিকট আল্লাহর জিকির করা হয় তাদের অন্তর ভীত হয় এবং তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সমূহ বর্ণনা করলে তাদের ঈমানের মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়, তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকে। ইমাম জাহেদ এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন প্রকৃত মু'মেন ব্যক্তি তারাই যারা খোদার নাম শ্রবণ করলে তাদের ঈমান ও এতেকাদ (বিশ্বাষ) বর্দ্ধিত হয় এবং যে কোরান শরীফ পাঠকালীন সময়ে হাসে তাকে তুমি জানবে প্রকৃত মোনাফেক। রসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেন চলার পথে একবার একদল লোককে অতিক্রম করছিলাম তারা তখন আল্লাহ তায়ালার জিকির করছিল ও হাসছিল এবং খোদাওন্দ করীমের কথা শুনেও তাদের মন নরম হচ্ছিল না। হুজুর (সাঃ) বললেন আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং বললাম এটা মোনাফেকদের তৃতীয় দল। এরপর খাঁজা বুজুর্গ বললেন, খাঁজা ইব্রাহিম খোয়াজ এমন একটি সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা বসে আল্লাহ তায়ালার জেকের করছিল। তিনি আল্লাহর নাম নিলেন এবং শ্রবণ করার পর ফকিরের (তাঁর) মধ্যে এমন প্রেমের (শওক) সৃষ্টি হল যে ৭ দিবস-রজনী ঐশী প্রেমে মূর্চ্ছাগত (ওজুদ) হয়ে অচৈতন্য রইলেন। চেতনা ফিরলে আবার খোদার নাম নিলেন এবং পুনরায় চেতনা হারিয়ে ৭ অহঃরাত্র কাটালেন। সম্পূর্ণ হুশ হওয়ার পর ওজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। মাথা সেজদাবনত রেখে 'ইয়া আল্লাহ' বললে পুনরায় বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং রুহ দেহ ছেড়ে স্রষ্টার কাছে চলে গেল। এ ঘটনা বলার পর হযরত খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজ (রঃ)-এর চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি নিম্নোক্ত ফার্শী কবিতার পংতি দু'টো উচ্চারণ করলেন.

আশিক ব হাওয়ায়ে দোস্ত বেহুশ বুয়াদ,
ওজিয়াদে মুহব্বাত খেশ মদহুশ বুয়াদ॥
ফরদা কে ব হাশ্‌রে খালকে হয়রান মানেদ,
নামে তু দরুসিনা ওগুশে বুয়াদ॥

অর্থ—বন্ধুর পরশে প্রেমিক হয় বেহুশ,
প্রেমাধিক্যে হারায়ে নিজেরে হয় নেশায় বিভোর॥
সৃষ্টি হবে আতঙ্কিত আস্‌ছে হাশরে,
কর্ন-সিনায় থাকবে সদায় নামটি জাগ্রত॥

এরপর এরশাদ করলেন হযরত খাঁজা নাশির উদ্দিন আবি ইউসুফ চিস্তী রহমতুল্লাহে আলায়হের খানকা শরীফে কয়েকজন কামেল দরবেশ এসেছিলেন। ঐ সময় আমিও সেখানে ছিলাম। একদিন 'সামা'র (গান) মজলিসে কাওয়ালগণ এমন রুবাই (চার পংতির কবিতা) গাইতে শুরু করল যা শ্রবণ করার পর আমার ও দরবেশগণের এমন হালের (অবস্থার) সৃষ্টি হল যে, অহঃরাত্রি ৭ দিন পর্যন্ত আর কোন হুশ রইল না। সামা (গান) চলাকালীন সময়ে 'ওজুদ হালে' (ঐশী প্রেমে মূর্ছিত হয়ে স্রষ্টাতে বিলীন) উক্ত দরবেশগণের মধ্য হতে দু'জনে মাটিতে পড়ে যায় এবং খিরকাহ (আজুনু লম্বা পরিধেয় বস্ত্র) ভূতলে লুটিয়ে থাকে আর শরীর অদৃশ্য হয়ে যায়। এ অমৃতসুধা আমাদেরকে পান করিয়ে হযরত খাঁজায়ে খাঁজেগান (রাঃ) তেলওয়াতে মশগুল হলেন। মজলিস বিরত রইল।

আলহামদু লিল্লাহ আলা জালেক।

—০—

শনিবার। কদম মোবারকে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হল। শায়খ জালাল, শায়খ আলী সঞ্জরী, খাঁজা মুহাম্মদ আহ্‌মদ চিশ্‌তী রহমকুমুল্লাহ্ এবং আরও অনেক প্রখ্যাত মাশায়েখ, সুফিয়ে আযম খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শুরু হলো। বিষয় বস্তু ছিল নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিষ পালন নিয়ে, যদি এগুলো পৃথক পৃথক ভাবে পালন করে, তবে তা হবে আহ্‌লে সুলুকগণের জন্য এবাদত। খাঁজা বুজুর্গ (রঃ) এরশাদ করলেন, জিনিষ পাঁচটির মধ্যে প্রথম আদেশ হল স্বীয় পিতা মাতার হক আদায় (অর্থাৎ তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, ভরণ পোষণ করা, মনে দুঃখ না দেওয়া এবং অন্যান্য খেদমত করা)। পিতা মাতার খেদমত সন্তানদের জন্য অত্যন্ত ছওয়াবের এবাদত। রসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি পিতা মাতার খেদমত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করে আল্লাহ্ তায়ালা তার আমল নামায় একটি হজের ছওয়াব প্রদান করেন এবং যে সন্তান স্বীয় জননীর কদমবুসি করে আল্লাহ্ জাল্লে শানহু তার আমল নামায় হাজার বছর এবাদতের ছওয়াব দান করেন এবং তার সমস্ত গুণাহ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেন। এরপর এরশাদ করলেন, এক লম্পট, ব্যভিচারী, দুশ্চরিত্র ও দুনিয়াশক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পর তাকে বেহেস্তে হাজীগণের সঙ্গে দেখা গেল। লোকজন তাকে স্বপ্নে এ অবস্থায় দেখে তাজ্জব (আশ্চর্য) হয়ে গেল এবং প্রশ্ন করল তুমি এ নিয়ামত কি করে অর্জন করলে? তোমার তো এমন কোন আমল ছিলনা যদ্বারা এ নেয়ামত লাভ করতে পার? উত্তরে সে বলল তোমাদের ধারণা সন্দেহাতীতভাবে সত্য, কিন্তু তোমরা তো জানতে আমার এক বৃদ্ধা মা ছিলেন, যখন আমি ঘর থেকে বেরুতাম তাঁর পায়ে চুমু (কদমবুসি) খেয়ে তার পর বেরুতাম। তিনি আমাকে দোয়া দিতেন "খোদা তোমাকে ক্ষমা করুন এবং হাজীদের সওয়াব এনায়েত করুন।" পরম করুণাময় আল্লাহ্, জাল্লে শানহু আমার সেই বৃদ্ধা মায়ের দোয়া কবুল করে আমাকে বেহেস্তে হাজীদের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। এরপর এরশাদ করলেন হযরত খাঁজা বায়েজীদ বোস্তানী রহমতুল্লাহ আলায়হে-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যটি এবং নিয়ামত ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ নিয়ামতটি আপনি কি করে হাসেল করেছেন?" তিনি জবাব দিলেন যখন আমি বালক ছিলাম, বয়স ৭ বছরের মত হবে। মসজিদে পড়তে যেতাম; নিম্নোক্ত আয়েতটি একদিন পাঠের মধ্যে এসে

গেল। "ওয়াবিল ওয়া-লেদায়নে এহ্ছানা" ওস্তাদের নিকট এর অর্থ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন, ইহা আল্লাহ্‌র আদেশ, 'পিতা মাতার হক আদায় কর', যেমন তাদের প্রাপ্য। এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথেই আমি কালাম পাক বন্ধ করে মায়ের খেদমতে যেয়ে হাজির হলাম এবং বললাম মা আমি আজ একটা আয়াত পড়েছি; ওস্তাদ সে আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন মাকে শোনালাম এবং বললাম এখন আদেশ কর, প্রথমে তোমাদেরই খেদমত করব। একই বক্তব্য পিতার সম্মুখেও পেশ করলাম। উভয়েই আমার জন্য দু'রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমাকে সমর্পণ করলেন। আমার নেয়ামত লাভের পিছনে মায়ের তরফের আরও একটি দোয়া সংযুক্ত আছে। শীত কাল, তখন বরফ পড়ছিল, রাত্রে মা পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলেন আমি জেগেছিলাম, ঘরে দেখলাম কলস শূন্য, পানি নেই। পানি আনতে বাইরে চলে গেলাম। পানি এনে পাত্রে ঢেলে মায়ের কাছে যেয়ে দেখি তিনি নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন। ভাবলাম যদি আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ি এবং মা জেগে পানি না পান তাহলে মায়ের আদেশ পালন না করায় আদবের খেলাপ হবে এবং মায়েরও কষ্ট হবে। এ সমস্ত ভেবে আমি আর শয়ন না করে পানির পাত্র হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম। অত্যধিক ঠাণ্ডায় হাতের পানি জমে যাচ্ছিল এমন সময় মা চোখ মেললেন। আমাকে পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং এলাহির বারগাহে এই বলে দোয়া করলেন, 'হে বারে এলাহি আমার সন্তানকে তোমার ফজল ও করম দ্বারা আরিফ দের বাদশাহ করো।' তোমরা যে সব নেয়ামতের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে সে সবই আমার মায়ের দোয়ার বরকতে লাভ করেছি।

খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) এরশাদ করলেন পাঁচটি জিনিষের দ্বিতীয় জিনিষ হলো কোরান শরীফ সংক্রান্ত একটা নির্দেশ, যা বন্দেগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্দেগী। "শরহে আউলিয়া" কিতাবে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম পাঠ করেন হক তায়ালা দু'টো ছওয়াব তাকে দান করেন। একটা ছওয়াব কোরান পড়ার জন্য, দ্বিতীয় ছওয়াব কোরান শরীফে দৃষ্টিপাত করার জন্য। যে কোরান শরীফ পাঠ করে তার আমল নামায় প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে নেকি লেখা হবে এবং দশটি করে পাপ মুছে যাবে। এরপর কেউ আরজ করল ভ্রমণের সময়ে অথবা যুদ্ধের ময়দানে কোরান শরীফ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা? হুজুর এরশাদ করলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে যখন ইসলামের প্রসার বেশী ঘটেনি

তখন বেদ্বীনদের জন্য ভয় ছিল যদি তাদের হাতে কোরান পাক পড়ে তাহলে কোরান পাকের (বেইজ্জতি) অসম্মান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যার জন্য কেউ কোরান শরীফ সঙ্গে নিতেন না। কিন্তু যখন ইসলামের মর্যাদা উপলব্ধি করে এর প্রসার বৃদ্ধি লাভ করে তখন নবী করিম (সাঃ) কোরান শরীফ ভ্রমণে বা যুদ্ধের ময়দানে সব জায়গাতেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরপর এরশাদ করলেন সুলতান মাহমুদ গজনবীকে ওফাতের পরে (মৃত্যুর পরে) স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? জবাবে বললেন একরাত্রে আমি একটা ছোট শহরে মেহমান ছিলাম। সেই ঘরের তাকে একটা কোরান শরীফের পাতা রাখা ছিল, আমি ভাবলাম, যেহেতু এখানে কোরান শরীফ রাখা আছে সুতরাং এখানে শয়ন করা উচিত নয়। পরে মনে ওয়াসওয়াসা (খারাপ চিন্তা) এলে ভাবলাম, কোরান শরীফের পাতাটা অন্য কোথাও সড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না; কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল এতে ভীষণ বেয়াদবী হবে। কেননা নিজের আরামের জন্য কোরান শরীফকে স্থানান্তর করব? শেষ পর্যন্ত কোরান শরীফ স্থানান্তর না করে জেগে রইলাম। পরে যে সময়ে আখেরাতের ডাক পড়ল, চলে এলাম। আল্লাহ পরম করুণাময়, আমার ঐ রাতের কোরান শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শণের জন্য আমায় ক্ষমা করেছেন। এরপর এরশাদ করলেন কোরান শরীফের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করলে তার চোখের জ্যোতি বেড়ে যায় এবং সে কখনও অন্ধ হয় না। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা বললেন, 'এক সাজ্জাদা নশীন তার গদীর উপর বসেছিলেন, কোরান শরীফ তাঁর সামনে রাখা ছিল, একজন অন্ধ লোক এসে আরজ করল আমি বহু দিন যাবৎ অন্ধ অবস্থায় আছি বহু চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নি। আপনার কাছে এসেছি দোয়া খায়েরের জন্য, 'একটু দোয়া করুন আমার জন্য।' পীর সাহেব কেবলা মুখী হয়ে ফাতেহা পড়লেন এবং কোরান শরীফ তুলে তার চোখে লাগালেন। তৎক্ষণাৎ লোকটি তার দু'চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। এরপরে ''জামেউল হেকায়েত' কিতাব হতে একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। ফেলে আসা দিনগুলির কোন এক সময়ে এক দুশ্চরিত্রের কর্ণধার ছিল। মুসলমানগণ তার দুশ্চরিত্রের জন্য তাকে ঘৃণা করত এবং সব সময়েই সংশোধন হওয়ার জন্য উপদেশ দিত। কিন্তু সে কোন উপদেশই মানত না। সে মারা গেলে লোকগণ তাকে স্বপ্নে দেখল, সে উত্তম পোষাকে সজ্জিত, মাথায় তাজ এবং ফেরেস্তাদের উপর আদেশ হয়েছে তাকে বেহেস্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জিজ্ঞেস করা হল তুমি তো ফাসেক ছিলে তোমার এ উচ্চ সম্মান কি করে

লাভ হল? জবাবে সে বলল, আমি চলার পথে কোথও যদি কোরান শরীফের পাতা পড়ে থাকতে দেখতাম সেটাকে তুলে নিতাম এবং অত্যন্ত আদবের সাথে দেখতাম। হক তায়ালা আমাকে তার প্রতিদান হিসেবে এ মর্যাদা এনায়েত করেছেন। অর্থাৎ কোরান শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমার এ সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে।

পাঁচ জিনিষের তৃতীয় জিনিষ হলো, ঐশীজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিয়ারত। (দর্শণ) যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় জ্ঞানীদের চেহারার প্রতি, বিশেষভাবে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত মনে করে দর্শণ করবে, খোদা-তায়ালা তার ঐ দৃষ্টি হতে একজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন এবং ঐ ফেরেস্তা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য দোয়ায়ে মাগফেরাত কামনা করে। এরপর এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তির অন্তরে জ্ঞানী ও মাশায়েখদের প্রতি মহব্বত হবে খোদা-তায়ালা হাজার বছর এবাদতের ছওয়াব তার আমল নামায় এনায়েত করেন। যদি এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তাহলে রোজ হাশরে জ্ঞানীদের সাথে তাকে উত্তোলন করা হবে এবং বাসস্থান তার ঈল্লীনে হবে। (যেখানে নেক আত্মাদেরকে রাখা হয় তাকে ঈল্লীন বলে) "ফতুয়ায়ে জহিরা" কিতাবে বর্ণিত আছে যে খোদার রসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আলেমদেরকে (জ্ঞানীদেরকে) বেশী বেশী দেখে এবং তাদের সঙ্গে উঠাবসা (সোহবত) করে এবং সাত দিন খেদমত করে, হক-তায়ালা তার সমস্ত গোণাহ মাফ করে দেন এবং সাত হাজার বছর এবাদত বন্দেগীর নেকী তার আমল নামায় লিখে দেন। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন, ঘটনাটি প্রথমটির বিপরীত। এক ব্যক্তি, যখন সে কোন আলেম বা মাশায়েখদের দেখতো, ঘৃণা ও বিদ্বেষে মুখ ঘুরিয়ে নিত। আল্লাহর ইচ্ছায় তার যখন মৃত্যু হল তখন তার মুখ কেবলার দিকে ঘুরছিলনা। বহু প্রকারের চেষ্টা চালান হল কিন্তু কোন ফল হলনা, এই দৃশ্যে সমস্ত লোক অবাক হয়ে গেল। অবশেষে গায়েবী আওয়াজ হলো, "ওহে মুসলমানগণ অযথা কষ্ট করে না এ লোক জীবিত অবস্থায় আলেম ও মাশায়েখ (পীর)-দের দেখে ঘৃণা ও বিদ্বেষে মুখ ফিরিয়ে নিত; আমি আমার রহমত থেকে একে বঞ্চিত করেছি এবং বহিষ্কৃতদের তালিকায় এর নাম লিখেছি। কাল-কেয়ামতের দিন শুকরের চেহারায় একে উত্তোলন করব।"

পাঁচটি জিনিষের চতুর্থ জিনিষটি সম্বন্ধে হযরত খাজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন 'কাবা-শরীফ' দর্শণ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে খানা কাবার সম্মান ও

তাজীম করবে হাজার বছরের এবাদত এবং হজের ছওয়াব আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রদান করবেন এবং সে বুজুর্গ হবে।

পাঁচটি জিনিষের পঞ্চম জিনিষ হলো স্বীয় পীরের জিয়ারত (দর্শন) ও খেদমত। কাজটি একটি উচ্চ পর্যায়ের বন্দেগীর মধ্যে গণ্য। আমি এ বিষয়ে "মারেফাতুল মুরিদীন" কিতাবে লেখা দেখেছি এবং আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী-কাদ্দাসা সাররাহু এর মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় পীরের খেদমত করে হক তায়ালা বেহেস্তের মধ্যে তাকে হাজার মহল দান করবেন। প্রত্যেক মহলে একজন করে হুর থাকবে। কিয়ামতের দিন সে বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে এবং এক হাজার বছরের এবাদত তার আমল নামায় লেখা থাকবে। এরপর এরশাদ করলেন মুরীদের উচিত স্বীয় পীরের প্রত্যেক কথা ও কর্মের উপর খেয়াল রাখা এবং সে যা কিছু এরশাদ করেন অত্যন্ত পবিত্র অন্তকরণে তা পালন করা এবং যথা সম্ভব পীরের খেদমত হতে অনুপস্থিত না থাকা। এরপর বললেন, অতীতে একজন জাহেদ ছিলেন সে হাজার বছর পর্যন্ত হক তায়ালার এবাদত বন্দেগী অহঃনিশি করেছেন। কোন সময়েই সে জেকের হতে বিরত হতেন না। যে ব্যক্তি তাঁর জিয়ারতের জন্য যেত তিনি সেই ব্যক্তিকে উপদেশ-বাণী শুনাতেন, খোদা তায়ালা কোরান শরীফে এরশাদ করেছেন, "ওয়া মা খালাকতুল জেন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লে ইয়া'বুদুন।" অর্থ আমি জিন এবং মানবকে সৃষ্টি করেছি আমার এবাদতের জন্য। অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের উচিত দিন-রাত খোদা তায়ালার যাঝে নিজেদেরকে মশগুল রাখা এবং তাঁকে স্মরণ করা। বহুদিন গত হয়েছে যাহেদ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ওফাতের পর লোকজন তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ তায়ালা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, ক্ষমা করে দিয়েছেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, আপনার কোন আমল বারগাহে সোবহানীতে মকবুল (গৃহীত) হয়েছে? উত্তরে বললেন, কোন বন্দেগীই কাজে আসেনি শুধু আমার উপদেশ, যা মানুষকে দান করতাম, আমাকে ক্ষমা করিয়েছে এবং সব-চেয়ে বড় এনাম পেয়েছি আমার শায়খের (পীরের) খেদমত করার জন্য। আমার প্রতি আওয়াজ হলো, 'তুমি শায়খের খেদমতে কার্পণ্য করনি যার জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হল'। এরপর হযরত খাঁজা বাবা অশ্রুশিক্ত নয়নে বললেন কেয়ামতের দিন আম্বিয়া, আউলিয়া প্রত্যেককে কবর হতে উঠানো হবে এবং তাঁদের কাঁধের উপর কম্বল থাকবে, প্রত্যেক কম্বলে কম বেশী একলাখ সুতা লাগানো থাকবে এবং প্রত্যেক সুতায় কম-বেশী একলাখ গিট থাকবে। তাঁর মুরীদান, পুত্র-কন্যা,

শিশু-বাচ্চা সব বংশধর সেই সূতা ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না হাশরের হাঙ্গামা থেকে মুক্তি না পাবে। হক তায়ালা তাদেরকে পুল ছেরাতে পৌঁছাবে এবং স্বীয় পীরের সাথে এই ত্রিশ হাজার বছরের পথ, (পুল ছেরাত) এক পলকে ঐ কম্বল ধরে থাকার বরকতে পার হয়ে যাবে এবং বেহেস্তের দরজায় পৌঁছে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করবে। কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হবে না। হুজুর এ পর্যন্ত বলে তেলাওয়াতে মশগুল হলেন। মজলিস ঐ দিনের মত শেষ হল।

আলহামদু লিল্লাহে আলা জালেক।

—০—

ষষ্ঠ মজলিস

বৃহস্পতিবার। পদ চুম্বনের ভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। শায়খ বুরহানউদ্দিন চিশ্‌তী, শায়খ মুহাম্মদ সাফাহায়ে (রঃ) এবং আরও অনেক দরবেশ খেদমতে হাজির ছিলেন। আল্লাহ্-তায়ালার কুদরত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রঃ) এরশাদ করলেন আল্লাহ জাল্লে শানহু চিরজীব এবং চিরস্থায়ী। তিনি অনন্তকাল ধরে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। মানুষ যদি শুধু এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চায় তাহলে তার সে প্রচেষ্টা তার জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করলেও শেষ হবে না বরং সে পাগল হয়ে যাবে। হযরত নবী করিম (সাঃ) "আসহাবে কাহাফ" দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বারগাহে এলাহি হতে হুকুম হলো, 'তুমি দুনিয়ায় তাদেরকে দেখতে পাবে, না তবে আখেরাতে অবশ্যই দেখবে'। ইচ্ছা করলে তুমি তাদেরকে তোমার উম্মতের মধ্যেও পেতে পার। হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) এর বেসাল শরীফের পর "আসহাবে কাহাফের" গুহা পরিদর্শন করেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। আল্লাহ তায়ালা সকলকে জীবিত করেন এবং সালামের জবাব দেওয়ান। হুজুর আক্রাম (সাঃ) তাঁদেরকে স্বীয় মজহাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্তির আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা সিদ্দিক দিলে রসুলে খোদা (সাঃ) এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সামিল হন। এরপর খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন এমন কোন জিনিষ নেই যা কুদরতে এলাহিতে নেই। মানুষের উচিত স্রষ্টার বন্দেগী এমন ভাবে করা, যে রকম তার হক আছে। মানুষ যা কিছু করবে তাঁর প্রতিদান সে কর্মানুযায়ী পাবে। আমার প্রতি দৃষ্টি পাত করে হযরত খাঁজা বুজুর্গ বললেন, আমি এবং অনেক সুফীগণ হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) এর খেদমতে বসে ছিলাম। একজন অতি বৃদ্ধ লোক মজলিসে প্রবেশ করলেন। খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) বৃদ্ধের সম্মানে দাঁড়িয়ে তার সাথে মিললেন এবং নিজের কাছে সামনা সামনি বসালেন। বৃদ্ধ আরজ করলেন আজ ত্রিশ বছর যাবৎ আমার যুবক-ছেলে আমার নিকট হতে বিছিন্ন, তার মৃত্যুর কোন খবরও আমি পাইনি, আল্লাহ তায়ালাই জানেন সে মৃত না জীবিত। বহু যায়গায় তালাশ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অবশেষে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি, দোয়ার মাধ্যমে লুত্‌ফ ও করম (দয়া ও করুণা) এনায়েত করুন।

হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) এই ঘটনা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে মোরাকাবা করলেন। তারপর এরশাদ করলেন, এসো এর ছেলের জন্য দোয়া করি। দোয়ার পর বৃদ্ধকে বললেন, 'আপনি চলে যান আপনার ছেলেকে আপনার ঘরের দরজার সম্মুখেই পাবেন'। বৃদ্ধ মজলিস থেকে উঠে চলে গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরেই তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ)-এর কদম মোবারকে ফেলে দিলেন এবং বলতে শুরু করলেন, যখন আমি এখান থেকে বাড়ীর পথে রওয়ানা হলাম তখন মহল্লার লোকজন আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এ দিকেই আসছিল, আমাকে শুভ-সংবাদ দেওয়ার জন্য। এখন ছেলেকে আমি আপনার খেদমতে হাজির করলাম। হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সঃা) ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ত্রিশ বছর কোথায় ছিলে'। সে উত্তর দিল, আমি ত্রিশ বছর দানবদের হাতে বন্দী ছিলাম, কিছুক্ষণ পূর্বে ঠিক আপনারই অনুরূপ একজন বুজুর্গ আমাকে মুক্ত করে বললেন চোখ বন্ধ কর, আমি চোখ বন্ধ করলাম, যখন চোখ খোললাম, দেখলাম নিজের ঘরে আছি। ছেলেটি আরও কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) ইশারায় নিষেধ করায় সে চুপ হয়ে গেল। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধের ছেলে উভয়েই হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট মুরীদ হয়ে বললেন, এমন লোক কাছে থাকতে আর কোথায় যাব? এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও যিনি নিজেকে গোপন রেখেছেন। তাঁর কথা আর কি বলব? সোবহান আল্লাহ্! এ সবই আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত। তারপর বললেন কাবে এহবার (রঃ) হতে রওয়ায়েত আছে খোদা হাবীল নামে এক ফেরেস্তা পয়দা করেছেন, তার হাত এত লম্বা যে এক হাত পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে, অন্যহাত পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ঐ ফেরেস্তা সব সময় লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই তসবীহ পাঠে রত। যে হাত পূর্ব দিকে তদ্বারা সে দিনকে আলোকিত করে এবং অপর হাত দ্বারা অন্ধকার আনয়ন করে। যদি ঐ ফেরেস্তা আলোকিত হাত ছেড়ে দেয় তখন আর কখনও অন্ধকার আসবেনা, এবং অনুরূপ ভাবে যদি অন্ধকার হাত ছেড়ে দেয় তাহলে আর দিন হবে না। তার সম্মুখে ফলক লটকানো আছে ওর মধ্যে কালো ও সাদা বহু চিঠি আছে যদ্বারা সে দিন রাত্রি বিবেচনা করে এবং এর মাধ্যমেই দিন ও রাত ছোট বড় করে। ইহা বলার পর তিনি অঝরে কাঁদতে লাগলেন এবং আলমে বেহুশী তাকে ছেয়ে ফেলল। জ্ঞান ফিরলে বল-লেন এ জগৎ কুদরতে এলাহির এক তামাশা-ঘর; হাজারো রকমের কর্ম-কুকর্ম ও অপকর্ম এখানে সংঘটিত হয়। আরিফের উচিত ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় সমূহের

আলো না করা। এরপর এরশাদ করলেন, আরও একজন ফেরেস্তা আছে যার এক হাত আকাশে এবং দ্বিতীয় হাত মাটিতে। আকাশের হাত দিয়ে হাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জমিনের হাত দিয়ে পানির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি সে জমিনের হাত একটু সরিয়ে নেয় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই পানিতে প্লাবিত হয়ে যাবে এবং আকাশের হাতকে গুটিয়ে নিলে হাওয়ায় সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। এরপর বললেন আল্লাহ তায়ালা 'কোহকাফ'কে পয়দা করেছেন, —সমস্ত জগৎ তার ঘেরাওর ভিতরে অবস্থিত। কোরান শরীফে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ''কাফ ওয়াল কোরআনিল মজিদ'' অর্থাৎ কসম কোহকাফ ও কোরান মজিদের। এরপর এরশাদ করলেন, হক তায়ালা 'ওতায়েল' নামে আর একজন ফেরেস্তা তৈরী করেছেন, সে কোহ্‌কাফে অবস্থান করছে, 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই তসবীহ সে অনবরত পাঠ করছে। কোহ্‌কাফের ভার তার উপর ন্যাস্ত। কখনও মুষ্টি বন্ধ করছে কখনও মুষ্টি খুলে দিচ্ছে। তার হাতে সাতটি আলমের ধমনীর নিয়ন্ত্রণ ভার দেওয়া আছে। আল্লাহপাক যখন ইচ্ছা করেন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নাজেল করতে, তখন ঐ ফেরেস্তার উপর হুকুম দেন। সে তখন তার হাতে রাখা সংশ্লিষ্ট ধমনীটিতে টান দেয়; এতে ধমনীটি সংকুচিত হওয়ায় সে যায়গার নদীনালা শুকিয়ে যায়, যার ফলে জমীনে শষ্য অঙ্কুরিত হয় না; এবং অজন্মার সৃষ্টি হয়। আবার যখন ধমনীটি ছেড়ে দেওয়া হয় তখন জমীন সুজলা সুফলা হয়ে উঠে। আবার কখনও ফেরেস্তাকে হুকুম দেওয়া হয় ধমনীকে দোলাতে। সে যখন ধমনীটিকে দোলায় তখন সংশ্লিষ্ট এলাকাটি প্রকম্পিত হতে থাকে। এরপর এরশাদ করলেন আমি হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) এর মুখে শুনেছি যে আল্লাহ পাক ঐ পাহাড়টিকে দুনিয়া হতে ৪০গুণ প্রসস্ত করে সৃষ্টি করেছেন ঐ পাহাড়টি কখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না। সব সময়ই পাহাড়টি সমোজ্জল থাকে; কখনও রাত হয় না। ভূমি স্বর্ণের এবং অধিবাসিরা ফেরেস্তা, তাদের কোন কিছুর ভয় নেই। যেদিন থেকে তারা পয়দা হয়েছে সেদিন হতেই তারা আল্লাহর জেকেরে মশগুল। তাদের তসবী—'লা-ই-লাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এর পিছনে ৪০টি পর্দা (অন্তরাল) আছে যার উদ্দেশ্য ও সরূপ আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। জিন ইনসান বা ফেরেস্তা কেউই এর ভেদ জানেনা। এরপর এরশাদ করলেন, ঐ পাহাড়টি একটা গরুর সিংহের উপর রাখা হয়েছে; এক সিং হতে অন্য সিংয়ের দূরত্ব ত্রিশ হাজার বছরের পথ। ঐ গরুটি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসায় নিমগ্ন। গরুটির মস্তক মাশরেকের দিকে এবং লেজ মাগরেবের

দিকে। হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি খোদার শপথ করে বলছি এ ঘটনা আমি হযরত খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী রহমতুল্লাহ আলায়হে (আমার দাদা পীর)-এর মুখে শুনেছি। ঐ মহফিলে এক দরবেশ উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি এ ঘটনার বর্ণনা শ্রবণ করলেন তখন সন্দেহ প্রকাশ করায় খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী (রাঃ) মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন এবং সন্দেহকারী সহ তিনি অদৃশ্য হলেন এবং কিছুক্ষণ পর তাঁরা ফিরে আসলেন। ঐ দরবেশ কসম খেয়ে বললেন, খাঁজা মওদুদ চিশ্‌তী আমাকে কোহকাফ দেখিয়েছেন এখন হতে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী (রাঃ) বললেন যে, দরবেশদের বাতেনী শক্তি এমনই যে, তারা যদি ইচ্ছা করেন তা হলে এক পলকেই যে যা দেখতে চায় তাকে তা দেখাতে পারেন। এরপর হযরত খাঁজা আজমেরী (রাঃ) নিজের একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক সময় আমি সমরকন্দে ছিলাম তখন আবু লায়ছা সমরকন্দির বাড়ীর সন্নিকটে একটা মসজিদ তৈরী হচ্ছিল। এক ব্যক্তি এসে বলল কেবলা প্রসঙ্গে আমার সন্দেহ আছে, তোমরা কেবলা যেদিক করছ কেবলা সেদিকে নয়। আমি তাকে বুঝালাম যে মসজিদ ঠিক কেবলার দিকেই হচ্ছে। কিন্তু সে মানল না। আমি তার গর্দান ধরে বললাম, দেখ এই সেই কেবলা যেদিকে আমি বলেছি। ঐ ব্যক্তি কাবা ঘর দর্শণ করে কেবলা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল। এরপর এরশাদ করলেন আল্লাহ্ পাক যেদিন জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন সেইদিন একটা সাপও সৃষ্টি করেছেন। সাপকে হুকুম করলেন আমি তোমার কাছে একটা আমানাত অর্পণ করছি, তুমি গ্রহণ করছ কি না? সাপ উত্তর করল বিনাশর্তে গ্রহণ করব। হুকুম হল মুখ খোল, সাপ মুখ খোলল। ফেরেস্তাকে নির্দেশ করলেন জাহান্নামকে নিয়ে এসে সাপটির মুখে দাও। ফেরেস্তা জাহান্নামকে এনে সাপের মুখের ভিতরে স্থাপন করল এবং সাপের মুখটি বেঁধে দিল। এখন দোজখ ঐ সাপের মুখের ভিতরে সাত জমীনের নীচে অবস্থিত। দোজখ যদি সাত জমীনের নীচে সাপের মুখে রক্ষিত না হত তাহলে সমস্ত জগত জলে ভষ্ম হয়ে যেত। যখন কিয়ামত হবে তখন দোজখকে সাপটির মুখ হতে বের করা হবে। দোজখটিকে সহস্র শিকল দ্বারা বাঁধা হয়েছে। প্রতিটি শিকল ধরে হাজার হাজার ফেরেস্তা টানবে, ঐ ফেরেস্তাদের দৈহিক আকৃতি এত বড় যে, তাদের যে কোন একজনের কাছে পৃথিবীটা এক লুকমার (গ্রাস) সমতুল্য। দোজখ হাশরের ময়দানে প্রবেশ করে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে যার ফলে কিয়ামতের ময়দান কুণ্ডলীকৃত ধুয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি কিয়ামতের দুর্বিসহ আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়

তার উচিত সে যেন এমন ধরনের এবাদত করে যার চেয়ে বড় এবাদত নেই। ভক্তগণ আরজ করলেন, সেটা কোন এবাদত? হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) এরশাদ করলেন, লোকজনের ফরিয়াদ শ্রবণ করা, গরীব দুঃখীদের চাহিদা পূরণ করা, ক্ষুধার্থকে অন্ন দান করা এবং আহার কালীন সময়ে গরীবগণ পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার করানো। এ পর্যন্ত বলার পর হুজুর তেলাওয়াতে নিমগ্ন হলেন। মজলিস সমাপ্ত হলো।

আলহামদু লিল্লাহ আলা জালেক।

—০—

বুধবার, কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। খানা কাবা (আল্লাহ, এর মান সম্মান বৃদ্ধি করুন) হতে এক হাজী এসেছিলেন। সুরা 'ফাতেহা' বা আলহামদু নিয়ে আলোচনা শুরু হল। হযরত খাঁজা বুজুর্গ বললেন 'আছারে মশায়েখ' কিতাবে লেখা দেখেছি 'আলাহামদু' সুরা বাসনা পূরণের জন্য অনেক বার পড়া উচিত। রসুলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন যখন কোন লোকের কোন বড় কাজ বা কঠিন কাজ সম্মুখে আসে তখন তার উচিত সুরা ফাতেহা যেন 'বিছমিল্লাহির রাহমানের রাহিম'-এর শেষ মিমের সাথে মিলিয়ে পড়ে অর্থাৎ বিছমিল্লাহির রাহমানের রাহিমিল হামদু লিল্লাহির ... দোয়াল্লিন, এবং শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনবার আস্তে আস্তে আমিন বলে। ইনশাল্লাহ তার কঠিন কাজ সমাধা হয়ে যাবে। এরপর হুজুর (সাঃ) একদিন সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হলেন। সব সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অগণিত নেয়ামত ও করম করেছেন, তম্মধ্যে এটাও একটা যে, আমার পরে কোন নবী হবেনা। এর মধ্যে জিব্রাইল (আঃ) তসরীফ আনলেন এবং বললেন, ''আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আমার হাবীব আমি আপনার প্রতি আমার কিতাব নাযিল করেছি যার মধ্যে একটি সুরা আছে, যদি আমি ঐ সুরাকে তৌরাতে নাযিল করতাম তাহলে মূসার উম্মতদের মধ্যে জেহাদ হতনা, যদি ঐ সুরা ইঞ্জিলে নাযিল করতাম তাহলে ইসার উম্মতগণ ভয়গ্রস্ত হতনা এবং ঐ সুরা যদি যবুরে নাযিল করতাম তাহলে দাউদের উম্মতগণের সঙ্গীতজ্ঞের প্রয়োজন হতনা। আমি এ সুরা কোরান শরীফে এ জন্য নাযিল করেছি যেন আপনার উম্মত নিজেদের ধর্মের উপর দৃঢ় থাকে এবং কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থাও দোজখের আগুন হতে নিরাপদ হয়। জিব্রাইল (আঃ) আরও বললেন, ''হে আল্লার হাবীব, আখেরী জমানায় এ সুরার ফজিলত এত বেশী যে, যদি সমস্ত নদীর পানি কালি বানান হয় এবং সমস্ত বৃক্ষরাজি কলম বানান হয় এবং এ সুরার ফজিলত লিখতে লিখতে এ কালি কলম উভয়ই শেষ হয়ে যায়, তবু এর ফজিলত লেখা বাকি থেকে যাবে।'' এরপর এরশাদ করলেন এ সুরা সমস্ত রোগের ঔষধ স্বরূপ। যে রোগের ওষুধ নেই বা চিকিৎসা সম্ভব নয় সে রোগের চিকিৎসায় সুরা ফাতেহা এমন ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন ফজরের নামাজের সুন্নাৎ ও ফজরের মধ্যবর্তী

সময়ে ৪১ বার পাঠ করে রুগীদের মুখে ফুঁ দেয়। ইন্‌শাল্লাহ তায়ালা রুত আরোগ্য নসীব হবে। এরপর এরশাদ করলেন "আলফাতেহা শাফায়ে বেকুল্লে দা'আয়ে" অর্থাৎ স্বরা ফাতেহা সমস্ত রুগের ঔষুধ। এরপর এরশাদ করলেন, একবার খলিফা হারুনুর রশিদ (নূরুল্লাহ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে দু'বৎসর পর্যন্ত বহু চিকিৎসা করেও কোন লাভ হল না। অবশেষে স্বীয় মন্ত্রী জাফর বর মক্কীকে হযরত খাঁজা ফুজায়েল বিন আয়াজকে আনার জন্য তাঁর খেদমতে পাঠালেন এবং বলে দিলেন আপনি যেয়ে তাঁকে বলবেন আমি এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছি যে আর বাঁচার সাধ হয় না। যে সব চিকিৎসা করান হয়েছে তার ফল উপকার না হয়ে অপকারে পর্যবসিত হয়েছে। এখন খলীফার জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। মন্ত্রী (উজির) খলিফার নির্দেশ মত সব জানালেন হযরত খাঁজা ফুজায়েল (রাঃ)-কে। তিনি খলিফার অবস্থা শ্রবণ করার সাথে সাথে উজিরের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে খলিফার কাছে পৌঁছলেন এবং স্বরা ফাতেহা ৪১ বার পাঠ করে হারুনুর রশীদের মুখে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হারুন-উর-রশীদ রোগ মুক্ত হলেন এবং স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। এরপর তিনি আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন, একবার হযরত আলী কররমুল্লাহ ওয়াজহু একজন রোগীকে দেখার জন্য গিয়েছিলেন এবং স্বরা ফাতেহা পড়ে রোগীর মুখে ফুঁ দিলেন। রোগী তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করল। কিছু সময় পরে অন্য একজন লোক রোগীকে দেখার জন্য এসে দেখল রোগী সুস্থ হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল তুমি কি ভাবে আরোগ্য লাভ করলে? লোকটি উত্তর করল হযরত আলী (রাদিঃ) এসে আমার মুখে স্বরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিতেই আমি সেরে উঠলাম। এই উক্তি করার সাথে সাথেই পুনরায় লোকটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং উক্ত রোগেই সে মারা গেল। এর কারণ এ ছিল যে, স্বরা ফাতেহার প্রতি তার বিশ্বাস বিশুদ্ধ ছিল না। রোগ মুক্তির কারণ বর্ণনার সময় সে অবিশ্বাসের সাথে বর্ণনা করেছে। কোন কাজ থেকে যদি কেউ ফল ভোগ করতে চায় তাহলে বদ আকিদা দ্বারা তা সম্ভব নয়।

এরপর এরশাদ করলেন, 'তফসীরে' আছে আল্লাহ্‌ তায়ালা সব স্বরার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। একটা স্বরার একটাই নাম আছে দু'টো নাম নেই। কিন্তু হক সোবহান তায়ালা স্বরা ফাতেহার ভিন্ন ভিন্ন ৭টি নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

১। ফাতেহাতুল কিতাব

২। সাব উ'স্সানী

৩। উম্মুল কিতাব

৪। উম্মুল কোরান

৫। সূরা মাগফেরাত

৬। সূরা রহমত

৭। সূরায়ে ছানিয়া

এ সূরায় ৭টি হরফ নেই এবং না থাকার সাতটি কারণও রয়েছে।

১। 'ছে' বা 'ছা' অক্ষরটি এ সূরায় নেই। 'ছে' অক্ষর থেকে 'ছবুর' হয়, যার অর্থ ধ্বংশ। 'ফাতেহা' পাঠকারীর সঙ্গে ধ্বংশের কোন সম্পর্ক নেই।

২। 'জিম' অক্ষরটি এ সূরার বহির্গত। জাহান্নামের আদ্যাক্ষর 'জিম'। সূরা 'ফাতেহা' পাঠকারীর সঙ্গে জাহান্নামের কোন সম্পর্ক নেই।

৩। 'জে' বা 'জা' অক্ষরটি 'জাক্কুম' শব্দটি লিখতে প্রথমেই ব্যবহার হয়। 'জাক্কুম' একটা কাঁটা যুক্ত ফল যা দোজখবাসীদের আহার; অতএব জাক্কুমের সাথেও 'ফাতেহা' পাঠকারীর সম্পর্ক থাকতে পারে না।

৪। 'শিন' অক্ষরও সূরা ফাতেহায় নেই। কারণ 'শিকাওত'-এর প্রথম অক্ষর 'শিন' যার অর্থ দুর্ভাগ্য। ফাতেহা পাঠকারী কখনও দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে না।

৫। 'যোয়া' অক্ষরটি হতে ফাতেহা মুক্ত। কারণ 'যুল্মাত' অর্থাৎ অন্ধকারের আদ্যাক্ষর 'যোয়া'। সুতরাং ফাতেহা পাঠকারী কখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে না।

৬। 'ফা' অক্ষরটি সূরা ফাতেহা হতে বর্জিত। কারণ, 'ফিরাক' শব্দে 'ফা' প্রথমে ব্যবহার হয়। 'ফিরাক' অর্থ বিরহ-বিচ্ছেদ যার সঙ্গে ফাতেহা পাঠকারী কখনও বন্ধুত্ব করতে পারে না।

৭। 'খা' অক্ষর হতে সূরা ফাতেহা বিমুক্ত। কারণ 'খাওয়ারী' শব্দের শুরুতে 'খা' ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ 'ভবঘুরে-লম্পট-গৃহহীন' অতএব এমন শব্দের সঙ্গে 'ফাতেহা' পাঠকারী সম্পর্ক রাখতে পারে না।

সূরা ফাতেহায় আয়াত রয়েছে সাতটি। ইমাম নাছির বিস্তি (রঃ) লিখেছেন, মানুষের দেহে প্রধান সাতটি 'রগ' রয়েছে, যাকে 'হাফত আন্দাম' (সপ্ত রগ বা দেহ) বলে। যারা এ সাতটি আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার 'হাফত আন্দামকে' দোজখের আগুন হতে নাযাত দিবেন। অতপর এরশাদ করলেন, এই সূরার মধ্যে ১২৪টি অক্ষর বিদ্যমান এবং আম্বিয়া আলায়হেস, সালামদের সংখ্যা

১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) যে ব্যক্তি এই ১২৪ (একশত চব্বিশটি) অক্ষর পাঠ করবে আল্লাহ্ পাক তাকে অগণিত ছওয়াব এবং বরকত দান করবেন। খাঁজা বুজুর্গ এরপর অনুরূপ আর একটি হেকায়েত বর্ণনা করলেন 'আলহামদু' শব্দটিতে আরবীতে ৫টি অক্ষর রয়েছে এবং ফরজ নামাজ পাঠ করার সময়ও পাঁচ বার। যে ব্যক্তি এ পাঁচটি অক্ষরের শব্দ আলহামদু পাঠ করবে তার ঐ পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজের ভুল-ত্রুটিগুলি আল্লাহ্ গাফুরুর রাহিম মাফ করে দিবেন। এরপর এরশাদ করলেন, 'লিল্লাহে' শব্দটিতে তিনটি অক্ষর রয়েছে আলহামদুর সহিত লিল্লাহে মিলিত হলে হয় আটটি অক্ষর। আল্লাহ্ তায়ালা আটটি বেহেস্ত সৃষ্টি করেছেন; যে ব্যক্তি ঐ আটটি অক্ষর পাঠ করবে হক তায়ালা তার জন্য বেহেস্তের আটটি দ্বারই উন্মুক্ত করে দিবেন। সে তার ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়েই বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে। রাব্বিল আলামিন শব্দতে আরবীতে ১০টি অক্ষর আছে, পূর্বোক্ত আটটির সাথে এ দশটি অক্ষর মিলিত হয়ে হয় ১৮টি অক্ষর। আল্লাহ্ তায়ালা ১৮০০০ হাজার জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি উক্ত ১৮টি অক্ষর পাঠ করবে আল্লাহ্ পাক তাকে ১৮,০০০ আলমের ছওয়াব প্রদান করবেন। 'আররহমান' শব্দটিতে আরবীতে ছ'টি অক্ষর আছে। পূর্বোক্ত ১৮টির সাথে এ ছ'টি যোগ করলে দাঁড়ায় ২৪। দিন রাত ২৪ ঘণ্টায় বিভক্ত; যে ব্যক্তি উক্ত ২৪টি অক্ষর পাঠ করবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার ২৪ ঘণ্টার পাপ ও অপবিত্রতা দূর করে দিবেন এবং এমনভাবে পবিত্র করবেন যেন সদ্য ভূমিষ্ট নবজাত শিশু। 'আররাহিম' শব্দে আরবীতে ছ'টি অক্ষর রয়েছে পূর্বোক্ত ২৪টির সাথে মিলিয়ে হয় ৩০টি অক্ষর। পুলছিরাতের দৈর্ঘ্য ৩০ হাজার বছরের পথ; যে ব্যক্তি উক্ত ৩০টি অক্ষর পাঠ করবে সে বিদ্যুৎ গতিতে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। 'মালেকে ইয়াও মিদ্দিন' শব্দে ১২টি অক্ষর আছে। পূর্বোক্ত ৩০টির সাথে যোগ দিয়ে হয় ৪২টি (এবং গুণ দিয়ে হয় ৩৬০) অক্ষর। যে ব্যক্তি এ ৪২টি অক্ষর পাঠ করবে আল্লাহ্ জাল্লে শানহু তার ১২ মাসের অর্থাৎ সম্পূর্ণ ১ বছরের গুণাহ্ এমন ভাবে মুছে দিবেন যেন সে বছরে কোন গুণাহ্ই ক'রে নি। 'এইয়াকানা'বুদু, শব্দে আছে ৮টি অক্ষর। আগের ৪২টির সাথে এ ৮টি অক্ষর যোগ করলে হয় ৫০টি। হাশরের আযাব চলবে ৫০ হাজার বছর ধরে। যে ব্যক্তি এ পঞ্চাশটি অক্ষর পাঠ করবে সে উক্ত হাশরের আযাব হতে নাযাত পাবে। 'ওয়া এইয়া কানাসতাঈ'ন - এর মধ্যে আছে ১১টি অক্ষর। পূর্বের ৫০টি, এর সাথে যোগ করলে হবে ৬১টি। খোদা তায়ালা আকাশ ও মাটিতে যত নদ-নদী

পয়দা করেছেন তার সমস্ত পানির সমতুল্য পরিমাণ নেকি বা পূণ্য ঐ ৬১ অক্ষর পাঠকারী লাভ করবে এবং সম পরিমাণ গুণাহ বা পাপ তার আমল নামা হতে বাদ যাবে। "এহদেনাছ ছেরাতা'ল মুসতাকিম' - এতে আছে ১৯টি অক্ষর। পূর্বোক্ত ৬১টির সাথে যোগ দিলে হয় ৮০টি। মদ্যপান কারীর জন্য শরীয়তের বিধানে রয়েছে ৮০টি বেত্রাঘাতের দণ্ড। উক্ত আশিটি অক্ষর পাঠ করলে শরাবখুরের দণ্ড মওকুফ (মাফ) হবে। "ছেরাতোয়াল্লাজিনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম গাইরিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়া-ল লিন এর মধ্যে রয়েছে ৪৫টি অক্ষর। পূর্বের ৮০টির সাথে যুক্ত হয়ে মোট হয় ১২৪ টি অক্ষর। যে ব্যক্তি এ ১২৫টি অক্ষরের সূরাটি সম্পূর্ণ পাঠ করবে এবং কায়েম (দৃঢ়) থাকবে আল্লাহ রাহমানুর রাহিম ১,২৪,০০০ আম্বিয়া (আঃ)-দের সম্পূর্ণ এবাদত বন্দেগীর ছওয়াব দান করবেন।

হযরত খাঁজায়ে আজমেরী (রঃ) এরপর এরশাদ করলেন, আমি এবং খাঁজা ওসমান হারুনী কাদ্দাসাল্লাহ সাররুহু ভ্রমণে ছিলাম। এক সময় দজলা নদীর তীরে পৌঁছলাম। নদী প্লাবিত ছিল এবং পার হওয়ার কোন উপকরণ ছিল না। আমি চিন্তা করতে লাগলাম কিভাবে পার হব? এদিকে ওপারে যাওয়ার তাড়াও ছিল। এমন সময় হযরত খাঁজা ওসমান হারুণী (রঃ) বললেন, চোখ বন্ধ কর, আমি চোখ বন্ধ করলাম। কিছুক্ষণ পর চেয়ে দেখলাম আমরা নদী অতিক্রম করে চলে এসেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কি করে পার হলাম? তিনি উত্তর দিলেন 'আলহামদু' পাঁচবার পাঠ করে পা পানিতে রাখলাম এবং এপারে চলে এলাম। সুতরাং এটা খুবই সত্য যে প্রয়োজনে সূরা ফাতেহা খুবই ফলোদায়ক। এ সূরা আমল থাকলে অন্য কোন আমলের প্রয়োজন হয় না। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা আজমেরী (রঃ) তেলওয়াতে মশগুল হলেন এবং দোয়া প্রার্থীগণ দোয়া নিয়ে ঘরে ফিরলেন। মজলিস সমাপ্ত হল।

আলহামদু লিল্লাহ আলা জালেক।

বৃহস্পতিবার। আস্তানা বুসির সৌভাগ্য অর্জিত হল, তসবীহ্ পাঠের অভ্যাস নিয়ে বলতে যেয়ে খাঁজা বুজুর্গ (রাঃ) এরশাদ করলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ একটা 'অজিফা' নির্দিষ্ট করে নিয়ে প্রতিদিন পাঠ করা। দিন বা রাতের যে কোন সময়েই হোক না কেন প্রথমে অজিফা পাঠ করে পরে অন্য কাজ করতে হবে। রসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "তা:রকুল বিরদে মালউন্নুন।" অর্থাৎ অজিফা ত্যাগকারী অভিশপ্ত। এরপর এরশাদ করলেন মওলানা রাজিউদ্দিন (রঃ) অশ্বে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘোড়ার একটা পা গর্তে পড়ে ভেঙ্গে গেল। তিনি বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন এ দুর্ঘটনার কারণ কি? অনেক ভাবনা চিন্তার পর তার খেয়াল হল সকালের ওজিফা, যা প্রতিদিন পাঠ করতেন আজ কাজা হয়ে গেছে। এ দুর্ঘটনা উহারই সতর্কীকরণ। এরপর এ ঘটনার অনুরূপ আর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন, খাঁজা আবদুল্লাহ মোবারক নামে এক বুজুর্গ ছিলেন। কোন একদিনের 'ওজিফা' তিনি পড়তে ভুলে যাওয়ায় গায়েবী আওয়াজ হলো "হে আবদুল্লাহ তোমা থেকে নিজের প্রতিজ্ঞা সম্পাদন হয়নি, যে ওজিফা অবলম্বন করেছিলে ভুলে গেছো।" আরও বললেন আম্বিয়া আউলিয়া এবং মাশায়েখদের জন্য ওজিফাসমূহ নির্ধারিত হয়। তাঁরা এর প্রতি সুদৃঢ় থাকে এবং যে সব ওজিফাগুলি তাঁদের কাছে পৌঁছান হয় সেগুলি পালনে তাঁরা যত্নবান হন। এরপর এরশাদ করলেন, যে সমস্ত ওজিফা আমি বুজুর্গানে দ্বীন এবং মাশায়েখদের নিকট থেকে লাভ করেছি আমি সেগুলি এখনও পরিপূর্ণরূপে পালনে সুদৃঢ় আছি। তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি প্রতিটি ওজিফা যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে সেগুলির প্রতি পরিপূর্ণরূপে যত্নবান থাকবে। এরপর এরশাদ করলেন, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, গাত্রোত্থান করার সময় 'ডান কাত' হয়ে উঠবে এবং এ দোয়া পাঠ করবেঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিমেল হামদু লিল্লাহে নাজালা রহমাতা ওয়াল বারকাতা, অতপর ওজু করবে এবং দু'রাকাত তাহ্ইয়াতুল ওজুর নামাজ পড়বে, নামাজ শেষ হলে ঐ জায়নামাজে বসেই কেবলামুখী হয়ে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ভাবে সমস্ত কাজগুলি একটার পর একটা করে যাবে।

১। সূরা বাকারার কয়েকটি আয়াত পাঠ করবে।

২। সূরা আনামের সতের আয়াত পাঠ করবে।

৩। সূরা ইউসুফের ত্রিশ আয়াত পাঠ করবে।

৪। লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ১০০ বার পাঠ করবে।

৫। সুরা আন্আমের তেত্রিশ আয়াত পাঠ করবে।

৬। সুরা ইউসুফের ত্রিশ আয়াত পাঠ করবে।

৭। ফজরের সুন্নাৎ নামাজ আরম্ভ করবে। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা আলাম নাশরাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা 'আলমতারা কায়ফা' পাঠ করা অতি উত্তম কাজ। এ দু' রাকাত সুন্নাৎ নামাজ শেষ হওয়ার পর এবং ফরজ নামাজ শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

৮। "সোবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সোবহানাল্লাহিল আজিমে ওয়া বিহামদিহি আসতাগ ফিরুল্লাহে মিন কুল্লে জামবেও ওয়া আতুবু এলায়হে।" ১০০ বার পাঠ করবে।

৯। ফজরের ফরজ নামাজ যথারীতি নিয়মে সমাপ্ত করবে। পূর্বোক্ত নিয়মেই কেবলাদিক হয়ে নীচের কাজগুলো করবে।

১০। লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়াহ্য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়াহু ওয়া হাইয়ুন লা-ইয়া মুতু আবাদা জুল জালালে ওয়াল ইকরামে বিয়াদিহিল খায়রে ওয়াহু ওয়া আ'লা কুল্লে শাইয়িন কাদির। ১০ বার পাঠ করবে।

১১। আশহাদু আল্ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। ৩ বার পাঠ করবে।

১২। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন মা ইখতালাফাল মিলওয়ানে ওয়া তা'য়াক্কাবাল উছরানে ওয়া তাকওয়াদুল হাদীদে আন্না ওয়াসতাহ্‌সাবুল ফারকেদানে ওয়াল জামরানে বাল্লাগা আলা রুহে মুহাম্মাদিন মিনাত্‌তাহ্‌ইয়াতে ওয়াস সালাম। তিন বার পাঠ করবে।

১৩। ইয়া আজিজু ইয়া গাফুরু। ৩ বার পাঠ করবে।

১৪। সোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যেল আজিম। ৩ বার পাঠ করবে।

১৫। আসতাগ ফেরুল্লাহে রাব্বি মিন কুল্লে জামবেও ওয়া আতুবু এলায়হে। ৩ বার পাঠ করবে।

১৬। সোবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সোবহানাল্লাহেল আজিমে ওয়া বিহামদিহি আসতাগ ফেরুল্লাজি লা-ই-লাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমে গাফ্‌ফারুল

জুনুবে, সাত্তারুল উ'য়ুবে আল্লামুল গুয়ুবে, কাশফুল কুরুবে, মুকাল্লেবুল কুলুবে ওয়া আত্তুবু এলায়হে। ৩ বার পাঠ করবে।

১৭। ইয়া হায়্যু, ইয়া কাইয়্যুমু, ইয়া হান্নানু, ইয়া মান্নানু, ইয়া দাইয়্যানু, ইয়া সোবহানু, ইয়া সুলতানু, ইয়া গোফরানু, ইয়া জুল জালালে ওয়াল ইকরাম, বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন। তিন বার পাঠ করবে।

১৮। লা হাওলা ওয়ালা কু'য়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যেল আজিমে, ইয়া ক্বাদিমু, ইয়া দা-য়েমু, ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুমু, ইয়া আহাদু, ইয়া ছামাদু, ইয়া আ'লেমু, ইয়া আজিমু, ইয়া আলিমু, ইয়া নুরুন, ইয়া ফরদুন, ইয়া ওয়াতারুন, ইয়া বাক্বিউন, ইয়া হায়্যুন, ইয়া কাইয়্যুমুন আকদান হাজাতি বেহাক্কে মুহাম্মাদিন ওয়া আলেহি ওয়া আসহাবেহি আজমায়িন। তিন বার পাঠ করবে।

১৯। আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নাম। এক বার পাঠ করবে।

২০। হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ) এর ৯৯ নাম এক বার পাঠ করবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহাম্মাদুন   আহ্‌মাদুন   হা-মেদুন   মাহমুদুন   ক্বাসেমুন
আ'ক্বেবুন   খাতেমুন   হাশেরুন   হায়্যান   মা হায়্যান
দায়েউন   সিরাজুন   মুনিরুন   কাশিরুন   নাজিরুন
বাদিউন   মুহিদ্দিউন   রাসূলুর রাহমাতে   নাবিউন
তা-হা   ইয়া-সিন   মুজাম্মিলুন   মুদাছছেরুন   শুফিউন
খালিলুন   কারিমুন   হাবিবুন   মাজিদুন   মুস্তাফা   মুরতুজা
মুখতারুণ   না-ছেরুন   ক্বায়েমুন   হা-ফিজুন   শাহিদুন   আ-দিলুন
হাকিমুন   আহিদুন   ওহিদুন   ক্বায়েমুন   জা-মেউন   মুক্বিফুন
মুকফিয়ুন   রাসূলুল মুলাহিম   রাসূলুর রাহাতিন   কা-মেলুন   আকিলুন
নুরুন   হাজাতুন   বায়্যানুন   বুরহানুন   মু'মেনুন   মুতিয়ু'ন
মাজকুরুন   ওয়ায়েজুন   ওয়াহেদুন   আমিনুন   ছোয়াদেকুন   না-তেকুন
ছোয়াহেবুন   মাক্কিউন   মাদ্‌নিউন   আবতাহিয়ুন   আরাবিউন   হাশিমিউন
কুরাশিউন   মুজারিউন   উম্মিউন   আজিজুন   হারিছুন   রা'ওফুন
ইয়াতিমুন   তাবিবুন   তা-হেরুন   মুতাহ্‌হেরুন   ফসিহুন   সায়্যেদুন
মুত্তাকিউন   ইমামুন   ইয়ারুন   হাকুন   মুবিনুন   আওয়ালুন
আখেরুন   জা-হেরুন   বাতেনুন   রাহমাতুন   শাফিউন   মুহর্‌রমুন
আমারণা   হালিমুন   শাহিদুন   ক্বারিবুন   মুনিবুন   ওয়ালিয়ুন

আবদুল্লাহ কারামাতিল্লাহ আয়াতুল্লাহ ওয়া-সাল্লামা তাসলিমান কাছিরান কাছিরা বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমীন।

২১। আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদিন,
হাত্তা লাইয়াবকা মিনাস সালাওয়াতে শাইইন,
ওয়ারহামা আলা মুহাম্মাদিন,
হাত্তা লাইয়াবকা মিনার রাহমাতে শাইইন,
ওয়া বারেকা আলা মুহাম্মাদিন,
হাত্তা লাইয়াবকা মিনাল বারকাতে শাইইন। (তিন বার পাঠ করবে)।

২২। 'আয়াতুল কুরসী' তিন বার পাঠ করবে।

২৩। 'সুরা ইখলাস' তিন বার পাঠ করবে।

২৪। ফাইন্‌তাওয়াল্লাও ফাকুল হাসবে ইয়াল্লাহ লা-ই-লাহা ইল্লা হুয়া আলায়হে তাওয়াক্কালতু ওয়াহু ওয়া রাব্বুল আরশিল আযিম, তিন বার পাঠ করবে।

২৫। সুরা বাকারার শেষ আয়াত, তিন বার পাঠ করবে।

রাব্বানা ওয়ালাতাহ্‌মেল্‌না মালা তাকাতালানবী ওয়া-ফু-আন্না ওয়াগ-ফেরলানা ওয়ার হামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাউমিল কাফেরিন।

২৬। আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ালে ওয়ালে দাইয়া ওয়ালিমান তাওয়ালিদ ওয়া বেজামিয়েল মু'মেনীনা ওয়াল মু'মেনাতে ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলেমাতে আল এহ্‌ইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াত বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমীন। এই দোয়া তিন বার পাঠ করবে।

২৭। সোবহানাল আওয়ালু মুবাদি, সোবহানাল বাকিউল মা-ই-দুল্লাহিস সামাদে লামইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। এই দোয়া তিন বার পাঠ করবে।

২৮। ইয়াল্লাহ আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদির ক্বাদ এহাতাল্লাহে বেকুল্লে শাইয়িন ইলমা। এই আয়াত তিন বার পাঠ করবে।

২৯। তাওবাতু আবদাজ জালেমু জালিলু ওয়ালা ইয়ামলেকো লেনাফসিহি জার্‌রাও ওয়ালা নাফাআ'ও ওয়ালা মাওতান ওয়ালা হায়াতিন ওয়ালা নোশুরা। তিন বার পাঠ করবে।

৩০। আল্লাহুম্মা ইয়া হায়ু ইয়া কাইয়ুমু ইয়া আল্লাহ লা ই লাহা ইল্লা আনতা আস্‌আলুকা ইয়া তাহ্‌ই কালবি বেনুরে মা'রেফাতেকা আবাদান, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ। এ দোয়া তিন বার পাঠ করবে।

৩১। ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব ইয়া মুফাত্তেহাল আবুয়াব ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবে ওয়াল আবসারে ইয়া দালিলুম, মুতাহ্‌হেরিন ইয়া গিয়াছুল মুসতাগেছিনা আগেছনি, তাওয়াক্কালতু আলায়কা ইয়া রাব্বে ওয়া ওফাব্বেজতু আমরি ইলায়কা ইয়া রাব্বে ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আযিমে মাশায়া কানা ওয়া লাম ইয়া শায়া লাম ইয়া কুন ইয়া কানা'বুন ওয়া ইয়া কানসতায়ীন। তিন বার পাঠ করতে হবে।

৩২। আল্লাহুম্মা ইন্না আসআলুকা ইয়া মাইয়ামলেকা হাওয়ায়েজুস সায়েলিনা ওয়া ইয়ালামু জমিরাস সামেতিনা ফা ইন্না লাকা মিন কুল্লে মা সালাতিন মিনকা সামআন হাজেরান জাওয়াবান আতেদান ওয়া ইন্না মিন কুল্লে সামেতিন ইলমান নাফেয়ান ফাই'তনা মাওয়ায়েদ্‌ কাসসাদেকাতে ওয়া আবাদিকাশ, শামেলাতে ওয়া রাহমাতিল ওয়াছিয়াতে ওয়া নেয়ামাতেকাস সাবেকাতে উনজুর ইলা নাজেরাতে বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন। এক বার পাঠ করতে হবে।

৩৩। ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া দায়ানু ইয়া বোরহানু ইয়া সোবহানু ইয়া গোফরানু ইয়া জুল জালালে ওয়াল ইকরাম। তিন বার পাঠ করবে।

৩৪। আল্লাহুম্মা ইন্না আস আলুকা বেআসমায়েকাল আজিমু ইন্না তা'তেনি মাছায়া'লাতুকা বেফাজিলাতেকা ওয়া কারামেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন। আলহামদ্‌ লিল্লাহিল্লাজি ফিস, সামাওয়াতে আরশাহু ওয়াল হামদু লিল্লা হিল্লাজি ফিল কুবুরে কাজায়েহু ওয়া আমরুহু ওয়ালহামদু লিল্লা হিল্লাজি ফিল বাহরে ওয়াল বাহ্‌রে সাবিলাহু ওয়াল হামদু লিল্লাহিল্লাজি লা মালজা ওয়ালা মানজা-য়া ইল্লা এলায়হে। রাব্বে লাতাজারনি ফারদাও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারেছিনা। এই দোয়া তিন বার পাঠ করবে।

৩৫। আল্লাহুম্মারহাম উম্মাতে মুহাম্মাদিন
ওয়া আহলেহ উম্মাতে মুহাম্মাদিন
আল্লাহুম্মাগফের উম্মাতে মুহাম্মাদিন
আল্লাহুম্মা ফাররাজ উম্মাতে মুহাম্মাদিন
এই দোয়া তিন বার পাঠ করবে।

৩৬। সোবহানআল্লাহে মালায়েল মিজানে ওয়া মুনতাহিল ইলমে ওয়াজনাতুল আরশে ওয়া মুবলিগুর রেজায়ে বেরাহ মাতেক ইয়া আর হামার রাহেমীন। তিনবার পাঠ করবে।

৩৭। রাজিতু বিল্লাহে রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামে দীনাও ওয়া বিল কোরানে ইমানাও ওয়া বিল কা'বাতে কিবলাতাও ওয়া বিল মোমেনিনা এখওয়ানান। ১ বার।

৩৮। বিসমিল্লাহিল খাইরাল আসমায়ে বিসমিল্লাহে রাব্বিল আরদে ওয়াছ ছামায়ে বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়া দুরুরু মায়া এছমিহি শাইউন লা ফিল আরদে ওয়ালা ফিছ ছামায়ে ওয়াহু ওয়াস ছামিউল আলিম। এই দোয়া তিন বার পাঠ করবে।

৩৯। আল্লাহুম্মা আজেরনা মিনান্নারে ইয়া মুজির ১০০ বার পাঠ করবে।

৪০। লা-ই-লাহা ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। ১০০ বার পাঠ করবে।

৪১। আশহাদু আন্নাল জান্নাতা হাক্কুন, ওয়ান্নারু হাক্কুন, ওয়াল মিজানু হাক্কুন, ওয়াছ ছিরাতু হাক্কুন, ওয়াল মাউতু হাক্কুন, ওয়াছ ছায়াতু হাক্কুন, ওয়াল কারামাতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন, ওয়াল মোজেজাতুল আম্বিয়ায়ে হাক্কুন, ফিদায়েম দুনিয়া ওয়াশ শাফায়াতু হাক্কুন, ওয়াছ ছায়াতু আতিয়াতু লারাইবাফিহা ওয়া ইন্নাল্লাহা ইয়াবয়াসু মানফিল কুবুরে। ১ বার পাঠ করবে।

৪২। এরপর হাত উত্তোলন করে দোয়া খায়ের করবে। "আল্লাহুম্মা জেদ নুরেনা, ওয়া জেদ হুজুরেনা; ওয়া জেদ ই'শকেনা ওয়া জেদ মুহাব্বাতেনা ওয়া জেদ কবুলেনা বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন। ১ বার পাঠ করবে।

৪৩। এরপর "মুসাববেয়াতে আশারা" এবং সূরা ইয়াসিন, সূরা মুল্‌ক, সূরা জুমআ, পাঠ করবে।

৪৪। এরপর সূর্য যখন এক বল্লম পরিমাণ উপরে উঠবে তখন ১০ রাকাত এশরাকের নামাজ ৫ সালামে আদায় করবে। প্রথম রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা কদর ১ বার। দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা জিলজাল। ১ বার। তৃতীয় রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাওছার ১ বার। চতুর্থ রা'কাত সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন ১ বার। ৫ম রাকা'ত ও পরবর্তী সব রাকা,তে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ১০ বার করে পাঠ করবে। নামাজ শেষে ১০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর চাশ্‌ত, নামাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত কালাম পাক তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকবে।

৪৫। চাশতের নামাজ ১২ রাকা'ত, ৬ সালামে পাঠ করবে। প্রত্যেক রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা দোহা ১ বার করে পাঠ করবে।

৪৬। নামাজ শেষে কলেমা তামজীদ ১০০ বার এবং দরুদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করবে। এরপর দুপুর পর্যন্ত একটানা কোরান শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল থাকবে।

৪৭। দ্বিপ্রহরে ৪ রাকা'ত "ইসতুয়া" নামাজ সূরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকা'তে সূরা ইখলাস ৫ বার করে পাঠ করবে। এ নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে খিজির (আঃ)-এর দীদার লাভ হয়। এরপর যোহরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত শুয়ে থাকবে।

৪৮। ঘুম থেকে উঠে ১২ রাকা'ত জোহরের নামাজ আদায় করবে এবং এ বারো রাকা'ত নামাজে কোরান শরীফের শেষ দশটি সূরা পাঠ করবে। নামাজ শেষে দোয়ার পূর্বে ১০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। অতপর সূরা নূহ পাঠ করবে।

৪৯। এরপর আছরের নামাজ পর্যন্ত মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকবে।

৫০। আসরের নামাজের পূর্বে ১০০ বার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়েল আযিম পাঠ করবে।

৫১। আছরের ৪ রাকা'ত সুন্নাত পড়ার পর ৪ রাকা'ত ফরজ আদায় করবে। নামাজের পর সূরা ফাতেহা ১ বার, সূরা মুলক ৫ বার, সূরা নাস ও সূরা নাযেয়াত এক বার করে পাঠ করবে। এ সূরা পাঠকারীকে আল্লাহ তায়ালা গোর আযাব হতে মুক্তি দিবেন।

৫২। এরপর মাগরেবের নামাজের সময় হলে নামাজ আদায় করবে ; সুন্নাত নামাজের পর ২ রাকা'ত 'হেফজুল ঈমান' নামাজ প্রথম রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা ইখলাস ৩ বার এবং সূরা নাছ ১ বার পড়বে। নামাজ শেষে সেজদায় যেয়ে ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু ছাব্বেতনী আ'লাল ঈমান ১১ বার পাঠ করবে।

৫৩। এরপর ৬ রাকা'ত 'আউয়াবিন' নামাজ ৩ সালামে পাঠ করবে। প্রথম রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইজা জিল-জালা' ১ বার পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকা'তে ফাতেহার পরে সূরা 'আলহাকুমুত্তাকাছুর ১ বার পাঠ করবে। তৃতীয় রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা আছর ১ বার পাঠ করবে। এরপর আল্লাহর জেকেরে মশগুল হবে।

৫৪। এশার নামাজের সময় হলে এশার নামাজ আদায় করে নিবে। নামাজ শেষে এ দোয়া পাঠ করবে। "আল্লাহুম্মা আয়িন্নি আলা জিকরেকা ওয়া শুক্‌রেকা ওয়া হুসনে ইবাদাতেকা।"

৫৫। নামাজ খাফতান, ৪ রাকা'তে আদায় করবে। ১ম রাকা'তে ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী তিনবার, ২য় রাকা'তে ফাতেহার পর সূরা ইখলাস একবার,

৩য় রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা ফালাক ১ বার, ৪র্থ রাকা'তে ফাতেহার পর সূরা নাছ একবার পাঠ করবে। সালামের পর দোয়া করবে। ইনশাআল্লাহ নৈকট্য লাভ হবে।

৫৬। অতঃপর ৪ রাকাত সায়াদা'ত-এর নামাজ পাঠ করবে। প্রত্যেক রাকা'তে সূরা ফাতেহার পর সূরা কদর তিন বার এবং সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করবে। পরে সেজদায় যেয়ে এই দোয়া পাঠ করবে। ''ইয়া হাইয়ু ইয়াকাইয়ুমু ছাব্বেতনী আ'লাল ঈমান (কমপক্ষে ১১ বার)। সেজদা হতে উঠে দু'-জানু হয়ে বসে এই দোয়া পাঠ করবে ''আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বারকাতিন ফিল উমুর ওয়া ছেহাতে ফিল বাদানে ওয়ার রাহাতে ফিল মা'য়িশাতে ওয়াল ওয়া ছিয়াত ফির রিজ্‌কে ওয়া জিয়া'দাতে ফিল ইলমে ওয়া ছাব্বেতনা আ'লাল ঈমান। এরপর নির্ধারিত ওজিফা পাঠ করবে।

এরপর এরশাদ করলেন রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগে নামাজে মশগুল থাকবে, দ্বিতীয় ভাগে শয়ন করবে এবং তৃতীয় ভাগে তাহাজ্জোদ নামাজ পাঠ করবে।

অতঃপর এরশাদ করলেন, রসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন তাহাজ্জোদের নামাজ আমার জন্য ফরজ ছিল এবং আমার আউলিয়া উম্মতদের উপর এই নামাজ ওয়াজিব। ৪ সালামে ৮ রাকাত তাহাজ্জোদ নামাজ পড়া উচিত এবং শেষে কোরান শরীফ হতে যা কিছু স্মরণ হয় পাঠ করবে। তারপর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে এবং সুবেহ সাদেকের কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুম থেকে উঠে নতুন করে ওজু করবে তারপর আল্লাহর স্মরণে কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকবে। পরে ফজরের নামাজ ও পূর্বে বর্ণিত যাবতীয় এবাদত বন্দেগী নিয়মানুসারে ধারাবাহিকভাবে করতে থাকবে।

পরে খাঁজা গরীব নওয়াজ (রঃ) এরশাদ করলেন, এক বুজুর্গ প্রত্যহ তাহাজ্জোদের নামাজ পড়তেন। ঘটনাচক্রে একবার তাহাজ্জোদ কাজা হয়ে যাওয়ায় তাঁর ঘোড়ার পা ভেঙ্গে যায়, গায়েবী আওয়াজে তাকে জানান হয়, ''তাহাজ্জোদ কাজা করার সতর্কীকরন স্বরূপ ঘোড়ার পা ভেঙ্গেছে।'' এরপর এরশাদ করলেন আজ যে সমস্ত অজিফা তোমাদেরকে জানান হলো এর সবই আমাদের মাশায়েখ রেদওয়ানুল্লাহে আলায়হিম-গণের সুন্নাৎ যে ব্যক্তি এগুলি পাঠ করবে তারা মাশায়েখগণের সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ ঐশ্বর্য দান করার পর খাঁজা বুজুর্গ তেলাওয়াতে মশগুল হলেন। মজলিস বরখাস্ত হল। আলহামদু লিল্লাহে আলা জালেক।

দৌলতে কদমবুসি অর্জিত হল। শায়খ আহাদ বিরমানী, ওয়াহেদ বোরহানি, খাঁজা সোলায়মান, শায়খ আব্দুর রহমান এবং আরও অনেক সুফি, দরবেশ খেদমতে হাজির ছিলেন। 'সলুক' সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল।

সলুক এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনেকগুলো— যেমন পথ, আচার ব্যবহার, আদান-প্রদান, রীতি-নীতি ইত্যাদি। তাসাউফের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক শিক্ষার পথ বা স্তরকে বুঝায়। সালিক তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার্থী যে পথে চলে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় সেই পথ বা রাস্তা বহু স্তরে বিভক্ত। সালিককে একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করে মনজিলে (আকাংখিত স্থান) পৌঁছতে হয়। এই স্তর সমূহের সমষ্টিকে সলুক বলে।

খাঁজা গরীব নওয়াজ এরশাদ করলেন বহু মাশায়েখ সলুকের স্তরের সংখ্যা ১০০টি নির্দ্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে ১৭টি স্তর অতিক্রম করার পর কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি) ও কারামত (ঐশী-শক্তি) হাসেল হয়। যে ব্যক্তি এই স্তরে আত্মপ্রকাশ না করবে সে অবশিষ্ট ৮৩টি স্তরও অতিক্রম করতে পারবে। এ ব্যপারে সালেকদের অবশ্যই উচিত সতের স্তরে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে পরিপূর্ণ ১০০টি স্তরই অতিক্রম করা। এরপর এরশাদ করলেন, অনেক মাশয়েখদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আমাদের খান্দানে অর্থাৎ চিশতীয়া খান্দানে বা তরীকায় কামালিয়াত পর্যন্ত সর্বমোট ১৫টি স্তর বা দর্জা রয়েছে তন্মধ্যে ৫ম স্তর হলো কাশফ ও কারামতের। আমাদের মাশায়েখগণের নির্দেশ রয়েছে কোন সালেকই যেন ৫ম স্তরের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিজের জাতকে প্রকাশ না করে। তাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ ১৫টি স্তরই অতিক্রম করা বা হাসিল করা। তারপর নিজের জাতকে প্রকাশ করলে কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

এরপর এরশাদ করলেন একবার কিছু লোক একত্র হয়ে হযরত জোনায়েদ বোগদাদী কাদ্দাসাল্লাহ সাররুহুল বারীকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি আল্লাহর নিকট কোন জিনিস চান না কেন? যদি আপনি চেতেন, খোদাতায়ালা আপনাকে অবশ্যই দান করতেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি সব জিনিসই চাই শুধু একটি জিনিস চাইনা এবং সেটা হল হযরত মোসা (আঃ) চেয়েও যা পাননি এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিনা যাচনায় পেয়েছিলেন। বান্দার চাওয়া বা যাচনার

কি প্রয়োজন? বান্দা যদি উপযুক্ত হয় তবে তার চাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এরপর এরশাদ করলেন হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে যেমন সামান্য একটা পিঁপড়ে উপহাস করে বলেছিল, "হে সোলায়মান যদি তুমি অপেক্ষা করতে এবং জলদি না করতে অর্থাৎ দৈত্যদেরকে করায়ত্ব করার দোয়া না চাইতে তা হলে ফেরেস্তাদেরকেও তোমার অধীন করে দিতেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কিছুই আল্লাহর কাছে চাননি যার জন্য তাঁকে জগতের সমস্ত কিছুই আল্লাহ দান করেছেন।

পরবর্তী আলোচনা ইশ্‌ক্ (প্রেম) সম্বন্ধে আরম্ভ হলো। তিনি এরশাদ করলেন, প্রেমিক বা আশেকের অন্তরে থাকে অগ্নি পূজারীদের উপাসনাগারের মত প্রেম যা কিছু এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে সে সবই জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে কোন প্রকারের আগুনই প্রেমের আগুনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নয়। এরপর বললেন, যখন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) আল্লাহর নৈকট্যের স্তর লাভ করলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ হলো, "কি চাবে চাও"? আজ যা চাবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে"! তিনি স্বীয় মস্তক সেজদাবনত করে আরজ করলেন, "বান্দার সঙ্গে চাওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? যা কিছু তোমার দরবার হতে অনুদান আসবে তাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করব। আবার আওয়াজ হলো "হে বায়েজীদ তোমাকে আখেরাত (পরকাল, বেহেস্ত) দান করলাম। হযরত বায়েজীদ (রঃ) আরজ করলেন, "ইয়া এলাহি আখেরাত (বেহেস্ত) প্রেমিকদের জন্য কয়েদখানা; এমন জিনিসে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর আওয়াজ হলো, "হে বায়েজীদ তুমি যদি এতে রাজি না থাক তবে তোমাকে আমার বেহেস্ত দোজখ আরশ-কুরছী যা আমার কুদরতের হাতের মধ্যে আছে সবই দান করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, "ভাল"। পরে আবার আওয়াজ হলো, "তোমার মকছুদ (বাসনা) জানাও, আমি তোমাকে তাই দিব!" হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) উত্তর দিলেন, 'হে খোদাওন্দতায়ালা তুমি তো জানই আমার মকছুদ কি, তবু কেন জিজ্ঞেস করছ? আওয়াজ হল, "হে বায়েজীদ তুমি কি আমাকে চাও? যদি আমি তোমাকে চাই তাহলে কি হবে? হযরত বায়েজীদ (রঃ) কসম খেয়ে বললেন, তোমার বিশুদ্ধ মর্যাদার শপথ, যদি তুমি আমাকে তলব কর তাহলে কিয়ামতের দিন তোমার দোজখের আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এমন ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলব যার প্রভাবে দোজখের আগুন এমন ভাবে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, যার অবশিষ্ট খোঁজে পাবে না। কেননা, প্রেমের আগুন এমন ভাবে জ্বলে যে, কোন কিছুর অবশিষ্ট রাখেনা। যখন এই কথা বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) বললেন,

সাথে সাথে আওয়াজ হলো, "হে বায়েজীদ, যা তোমার বাসনা ছিল পূর্ণ হলো।" গরীব নওয়াজ এরপর এরশাদ করলেন, এক সময় হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)-এর শওক ও ইশতিয়াকের (প্রেম ও ভালবাসা) প্রভাব এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলো যে অস্থিরতার পরিমাণ সীমা অতিক্রম করল। তিনি তখন 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করতে লাগলেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে হতে প্রেমানলের হল্‌কা বেরুতে ছিল। বসরার লোক আগুন আগুন চিৎকার শুনে পানি ভর্তি পাত্র সঙ্গে নিয়ে আগুন নিভাবার জন্য দৌড়াতে লাগল। একজন বুজুর্গ পথিমধ্যে তাদেরকে আটকিয়ে দিয়ে বুঝাল, রাবেয়ার অগ্নি পৃথিবীর অগ্নি নয়, ঐ আগুন ইশকে এলাহির আগুন, দুনিয়ার কোন বস্তুতেই নিভবার নয়। রাবেয়ার অন্তরে এলাহির প্রেমের প্রখরতা এত প্রবল হয়েছে যে এখন তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এখন এ আগুন প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের পূর্বে আর নিভবার নয়। এরপর এরশাদ করলেন, মনসুর হাল্লাজ (রঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইশকের পরিপূর্ণতা বলতে কি বুঝায়? তিনি উত্তরে বললেন যাদের মাশুক দুঃখ কষ্ট প্রদানে কমর বাঁধে এবং আশেক সে সমস্ত বালা-মুসিবত মাথা পেতে নিয়ে নিজের কাজে দৃঢ় থাকে এবং প্রেমাস্পদের মোশাহেদায় এলাহির নূরের দর্শণে এমনভাবে নিবিষ্ট থাকে যেন তাকে মারুক, কাটুক তবু যেন তার তন্ময়তায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়; তাহলে তাকে আশেকে কামেল বা পরিপূর্ণ প্রেমিক বলা চলবে। বলতে বলতে খাঁজা গরীব নওয়াজের চোখ দু'টো অশ্রুতে কানায় কানায় ভরে উঠল। তিনি একটি কবিতার দু'টো লাইন আবৃত্তি করলেন—

> খো বরদিয়া চু বরগিরান্দ
>
> আশেকান পেশে শানে চুনি মিরান্দ॥

অর্থাৎ মাশুক যখন দেখা দিয়ে পর্দার আড়ালে অন্তর্ধান করে, আশেক তখন সেই পর্দার নিকট আত্মবিসর্জন করে।

খাঁজা বুজুর্গ (রহঃ) এরপর একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। বাগদাদের কোনো বাজারে একজন আশেককে বেঁধে এক হাজার বেত্রাঘাত মারা হয়েছিল, কিন্তু তাতে তার হাত পা কিছুই নড়েনি অর্থাৎ সে কোন প্রকার ব্যথাই অনুভব করেনি। এর কারণ তাকে জিজ্ঞেস করায় সে উত্তর দিয়েছিল আমি বন্ধুর নূরের প্রশান্ত জ্যোতির দর্শণে তন্ময় ছিলাম, আঘাতের কোন খবর জানি না। এরপর এরশাদ করলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম্ মুহাম্মদ গাজ্জালী (রঃ) তাঁর কিতাবে লিখেছেন একবার এক প্রতারককে বাগদাদের বাজারে হাত পা বেঁধে

কেটে দিল। কিন্তু সে কাঁদল না বরং হাসতে ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তোমাকে এত আঘাত করার পরও না কেঁদে হাসছ কি করে? সে উত্তর দিল ঐ সময় বন্ধুর দর্শনে বিভোর ছিলাম আমি সামান্যতম কষ্টও অনুভব করিনি। খাঁজা গরীব নওয়াজ এ ঘটনা বলতে বলতে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন —

ও বর সেরে কতল ওয়ানে বকইয়াস হয়রান
কি রান দান তাগাইয়াশ চে নেকো সি আয়াদ"

অর্থ—ওর মাথার উপর ডাগ কাটা, আর আমি তার চেহারা দেখে অবাক!
(কিন্তু) তরবারীর আঘাত খেয়ে বেহুশ হলে হবে কি নেক কাজ?

পরবর্তী আলোচনা 'আহ্‌লে সলুক এবং 'আরেফানে এলাহির' সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রঃ) এরশাদ করলেন, একবার বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) মোনাজাতে মশগুল ছিলেন। তার অন্তরে হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, "দুনিয়াটা কেমন?" গায়েবী আওয়াজ হলো—

তালাকা নাফসুকা ছালাছা ছুম্মা কুল হু আল্লাহু।

অর্থাৎ তালাক দাও নিজের নফসকে তিনবার, পরে আমার কথা বল এবং আমাকে চাও।

হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রঃ) এরশাদ করলেন যে তরিকতের পথে চলতে চায় তার উচিত প্রথম দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল বস্তুকে ত্যাগ করে, তারপর নিজের নফসকে তালাক দেয়, তারপর আহ্‌লে সলুকদের পথে পা রাখে। তা না হলে সব কিছুই মিথ্যা। এরপর এরশাদ করলেন একজন বুজুর্গ আহ্‌লে সলুক এবং সাহেবে ইশ্‌ক ছিলেন। একবার মোনাজাতে অনর্গল বলতেছিলেন, "তুমি যদি আমার ৭০ বছরের হিসাব চাও তবে আমিও তোমার কাছে ৭০,০০০ বছরের "আল আসতে"-এর দিনের হিসাব চাব। এখন যা কিছু হচ্ছে আলাসতে বেরাব্বেকুমের জন্যই হচ্ছে। পাপিষ্ঠ এবং পূণ্যবান ঐ দিনই হয়েছে, এখন তার ফল দাখিল বাকার আগেরাতে হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ গায়েবী আওয়াজ হলো, "তোমার ইচ্ছার জন্য উত্তর দেওয়া হচ্ছে; আমি তোমার সমস্ত শরীরকে অণু-পরমাণু রূপে বিভক্ত করে প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশকে দর্শণ দিব। সত্তর হাজার বছরের হিসাব পাশেই রেখে দেওয়া আছে। এরপর এরশাদ করলেন একজন আরিফ প্রতিদিন বলতেন যে, প্রত্যেকেই যার যার চাওয়ার কর্মে বিভোর। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এও করতে পারলাম না যে নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহ তায়ালার মাঝে বিলীন করব। কিন্তু একাজ আমি কখনও নিজের ইচ্ছা থেকে করব না। যদি আমি ইচ্ছা করি সাত জমিনকেই উলটিয়ে দিতে পারি। এরপর হযরত

খাঁজা (রাঃ) এরশাদ করলেন, অন্য আর একজন বুজুর্গ 'শওক'-এর প্রভাবে অর্থাৎ প্রেমের আকর্ষণে বলতে ছিলেন, 'সে (আল্লাহ) আমাকে দেখতে চেয়েছিল দেখেছে'; কিন্তু আমি কখনও তা ইচ্ছা করিনি। কেননা, বান্দার চাওয়ার কি প্রয়োজন আছে? আর একজন বুজুর্গ বলতে ছিলেন, "চাইলে কিছু পাওয়া যায় না; মানুষ উপযুক্ত হওয়া মাত্রই আল্লাহ তায়ালা তাকে তার কাম্য বস্তু প্রদান করেন।" এরপর এরশাদ করলেন এক বুজুর্গ বলতে ছিলেন যখন মানুষ আমিত্বের খোলস ত্যাগ করে, তখন নিগুঢ়ভাবে চিন্তা করলে দেখবে ইশ্‌ক্, আশেক এবং মাশুক (প্রেম, প্রেমিক, প্রেমাস্পদ) সবই এক। এরপর এরশাদ করলেন বান্দা যখন কামেল হয়ে যায় তখন সলুকের সমস্ত স্তরগুলিই অর্জিত হয়ে যায়। তখন সে নিজের অনেক কাজ করতে থাকে। যদি সে সমস্ত স্তর বা মোকামাত অর্জন করতে না পারে তাহলে "হয়রত" (আশ্চর্য)-এর একটা স্তর আছে সেখানেই সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এরপর এরশাদ করলেন, খাঁজা বায়েজীদ (রহঃ) বলেছেন, "ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত 'আমি খোদায়ে হক'-এর সঙ্গে ছিলাম এবং 'হক' আমার সঙ্গে ছিলেন। এখন আমি জাত পাকের (আল্লাহর) আয়না। অর্থাৎ আমি বলতে আমার যা কিছু ছিল এখন তার কিছুই নেই। সমস্ত গর্ব এবং অহংকার বিদূরিত হয়েছে। এখন, যখন আমিই নেই তখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তার জাতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আমি যা বলি তা তাঁরই প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাকে দিয়ে বলান। আমি নিজে থেকে কিছুই বলি না।"

বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)-এর অন্য আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে এরশাদ করলেন। হযরত বায়েজীদ (রঃ) বললেন আমি বহুদিন পর্যন্ত দরবারের খাদেম ছিলাম কিন্তু লোকসান ব্যতীত কোন লাভ হয়নি। এখন যেখানে পৌঁছেছি সেখানে কোন কষ্ট নেই। দুনিয়াদারেরা দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত, আখেরাত কামনাকারীগণ আখেরাতের কর্মে নিমগ্ন, প্রার্থনাকারীগণ স্বীয় প্রার্থনায় বিভোর, ধর্মানুরাগীগণ ধর্মে লিপ্ত। অনেকে আহার-বিহারে পরিতৃপ্ত। অনেকে আমোদ-প্রমোদে ও রঙ্গ-রসের কয়েদ খানায় আবদ্ধ। কিন্তু যে সম্প্রদায় রাব্বুল আলামিনের সম্মুখে উপস্থিত তাঁরা প্রেম সাগরের অতল তলে তলিয়ে আছে। বায়েজীদ (রহঃ) আরও বললেন, অনেক দিন পর্যন্ত আমি কা'বা ঘর তওয়াফ করেছি। যখন স্রষ্টার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো তখন এক রাত্রে আরজ করলাম "বায়েজীদ পরিশোধিত অন্তর কামনা করছে।" ভোর হওয়ার সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ হলো, "হে বায়েজীদ আমায় ছাড়া অন্য কিছুও কামনা কর! যদি আমাকে চাও তাহলে অন্তর দিয়ে কি করবে?"

আরিফ যখন সৃষ্টি জগতকে তার দু'আঙ্গুলের ফাঁকের মাঝে দর্শনে সমর্থ হয় তখন সে কেবল মাত্র 'আরিফের স্তরে' প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ এটা আরিফের নিম্নতম স্তর, পরে এরশাদ করলেন, বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি তরিকতের কোন স্তর বা মার্গে অবস্থান করছেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার রুতবা (মর্যাদা) এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, দুনিয়াকে আমি আমার দু'আঙ্গুলের ফাঁকের মাঝে দেখতে পাই। এরপর এরশাদ করলেন এলাহির ভক্তি শ্রদ্ধা বা বশ্যতায় আজব মিজাজ (বিস্ময়কর মন) হয় এবং এ ভাব তখনই পয়দা হয় যখন ভক্তিকারী ভক্তিতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকে। এই সন্তুষ্টিতে আল্লাহর নৈকট্যের স্তর লাভ হয়। এরপর এরশাদ করলেন আরিফের সবচেয়ে নিম্নতম স্তর হলো এলাহির সেফাত-গুলো তার মাঝে প্রকাশ পাওয়া। হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বলতেন, "এলাহি যদি আমার দেহের মাথা হতে পা পর্যন্ত অগ্নিতে প্রজ্বলিত করে এবং আমি তাতে সবুর করি, তাহলেও তার মুহব্বতের দাবী মিথ্যা নয়। যদি তোমার সৃষ্টির সমস্ত গোণাহও তুমি মাফ করে দাও তবু তোমার রহমতের কাছে ইহা নগণ্য হতেও নগণ্যতর। খাঁজা গরীব নওয়াজ এরপর এরশাদ করলেন, বিস্ময়াভিভূত হওয়া আহলে সলুকদের নিকট কবিরা গুনাহ এমন কি কবিরা গুনাহের চেয়েও অধিক খারাপ। পরে বললেন আরিফের আল্লাহ-প্রেমের পরিপূর্ণ স্তম্ভ হল, প্রথমে নিজের অন্তরে নূর সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়ঃ কেউ কারামত (রহস্য) দেখতে চাইলে তাকে তা দেখানো। এরপর এরশাদ করলেন, 'আমি, খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) এবং খাঁজা আহাদ উদ্দিন কিরমানী (রঃ) মদিনা ও তায়বা ভ্রমণ করছিলাম, দামেস্কে পৌঁছে জন' দামেস্কের সামনে বার হাজার নবীদের রওজা যিয়ারতের জন্য কয়েকদিন ওখানেই ছিলাম। এক মসজিদে হযরত খাঁজা মুহাম্মদ আরিফ নামে এক কামেল বুজুর্গ থাকতেন। একদিন আমরা তাঁর মজলিসে বসেছিলাম। তিনি বললেন যদি কেউ কোন কিছুর দাবী করে অর্থাৎ আমি সুফি, আমি আরিফ, আমি কামেল, আমি শায়খ, আমি পীর, আমি বুজুর্গ ইত্যাদি এবং প্রমাণে ব্যর্থ হয়, তবে কে তাকে বিশ্বাস করবে? তিনি এরপর বললেন, কিয়ামতের দিন সুফি হতে বুজুর্গগণ পর্যন্ত সম্মানিত হবেন এবং বিত্তশালীরা আযাব ভোগ করবে। এ ব্যাপারে খাঁজা মুহাম্মদ আরিফের সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হলো; সে বলল, আপনার বক্তব্যের পিছনে কোন দলিল আছে কি? অর্থাৎ এটা কোন্ কিতাবে লিখা আছে? উত্তরে খাঁজা আরিফ বললেন কিতাবের নামটা স্মরণ করতে পারছিনা। লোকটি বলল কিতাবে লিখা না দেখানো পর্যন্ত বিশ্বাস করিনা। খাঁজা আরিফ স্বীয় মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করে

বললেন কিতাবের নাম আমার মনে নেই, 'ইয়া বারে এলাহি, ভুলে যাওয়া কিতাবটি দেখিয়ে দাও'। তৎক্ষণাৎ ফেরেস্তার প্রতি আল্লাহ হুকুম দিলেন, সে কিতাবে ঐ কথা লিখা আছে সেটা নিয়ে দেখাও। ফেরেস্তা ঐ কিতাব খুলে যেখানে ঐ কথা লিখা ছিল বের করে ঐ লোককে দেখিয়ে দিল। যে লোকটি খাঁজা আরিফ (রহঃ) বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিল সে লজ্জিত হয়ে খাঁজা আরিফ (রহঃ)-এর কদম মোবারকে পড়ে গেলো এবং তাঁর নিকট মুরিদ হলো। এরপর খাঁজা আরিফ বললেন আল্লাহর দর্শন লাভকারী কোন ব্যক্তি যদি এই মজলিসে উপস্থিত থাকে তবে তাঁর উচিত কোন কারামাত প্রদর্শন করা। হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বীয় হাত জায়নামাজের নীচে প্রবেশ করায়ে কয়েকটা আশরাফি বের করলেন। একজন ফকির উপস্থিত ছিল, তাকে বলা হল আশরাফি নিয়ে যাও এবং দরবেশদের জন্য রুটী ও সিরকা নিয়ে এস। খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ)-এর কারামত দেখানো শেষ হলে হযরত খাঁজা শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানী (রঃ) দাঁড়িয়ে সামনে রক্ষিত কাঠ দণ্ড, যাহা পুঁতা ছিল, তার উপর নিজের হাত রাখতেই সেটা স্বর্ণে রূপান্তরিত হল। দু'জনের কারামত দেখানোর পরে শুধু আমিই বাকি ছিলাম। কিন্তু পীরের আদবের জন্য করামত প্রকাশ করতে চাইনি, তখন মুর্শিদ কেবলা আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কেন চুপ আছ? কিছু কারামত দেখাও। সেখানে একজন ক্ষুধার্থ ফকির ছিলো, হযরত খাঁজা স্বীয় কম্বলের ভিতর হতে চারটি রুটি বের করে ফকিরকে দিয়ে দিলেন। ঐ দরবেশ এবং খাঁজা মুহাম্মদ আরিফ (রঃ) বলতে ছিলেন, যে পর্যন্ত দরবেশদের এ রকম ক্ষমতা অর্জিত না হয় সে পর্যন্ত তাকে দরবেশ বলা উচিত না।

খাঁজা বুযুর্গ গরীব নওয়াজ এরপর এরশাদ করলেন, একজন বুযুর্গ ছিলেন তিনি বলতেন, যেদিন হতে আমি পৃথিবীকে দুশমন ভেবেছি, সেদিন দুনিয়া হতে রক্ষা পেয়েছি, যার ফলে খোদা তায়ালার প্রতি রুজু হলাম এবং মহব্বতও অনেক বেড়ে গেল। মৃত্যুকেও মাঝখান থেকে তুলে দিলাম। মুতু কাবলা আন তা মুতু' অর্থাৎ মরার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর। এ হাদীস আমল করে উন্‌সে বাক্বা (প্রেমে স্থায়িত্ব) এবং লুত্‌ফে হক অর্থাৎ আল্লাহর করুণা হাসিল হয়েছে। পরে এরশাদ করলেন কিয়ামতের দিন আশেকদের এক দলের প্রতি হুকুম হবে বেহেস্তে যাও। তারা আরজ করবে, "ইয়া এলাহি আমরা বেহেস্ত দিয়ে কি করব? বেহেস্ত তাদেরকে দান কর, যারা বেহেস্তের জন্য তোমার এবাদত করেছে। যে আল্লাহ তায়ালার জাতের প্রেমিক তার বেহেস্তে কি প্রয়োজন?" এরপর এরশাদ করলেন, একজন

বুজুর্গ বলতেন, দুনিয়াদারেরা দুর্বল, আর আখেরাত ওয়ালারা বেহেস্ত পেলে আনন্দিত এবং মারেফাত পন্থীদের জন্য আর কি বলব ? তারা তো নূরুন আলা নূর অর্থাৎ নূরের উপর নূর। এ অবস্থাকে আহ্‌লে সলুকগণ ভালভাবেই জানে, আহ্‌লে মারেফাতদের মধ্যে এবাদত প্রতি নিঃশ্বাসে চালু থাকে। এরপর এরশাদ করলেন, আরিফ হওয়ার অর্থ এই যে, যখন সে খোদার প্রতি ধাবিত হবে তখন চোখ বন্ধ করলে খোদার ইচ্ছার প্রতি এতদূর মশগুল থাকবে যেন ইস্রাফিলের সিংগা বাজলেও তার তন্ময়তা না ভাঙ্গে। এরপর এরশাদ করলেন হযরত খাঁজা জুন্নুন মিসরী (কাঃ সাঃ) বলেছেন আল্লাহর পরিচয়লাভকারী ব্যক্তিদের নিদর্শন, দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং নিশ্চুপ থাকে। যখন সে খোদাকে চিনবে তখন সৃষ্টি জগতের প্রতি তার ঘৃণা আসবে। এরপর এরশাদ করলেন, যে দাবী করে যে আমার মারেফাত হাসীল হয়েছে অথচ দুনিয়া হতে মুক্ত নয়, তখন বুঝবে যে সে মিথ্যুক। এরপর এরশাদ করলেন, আরিফ সেই, যে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকেই ত্যাগ করেছে এবং সকলের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছে। পরে এরশাদ করলেন আরিফ কামালিয়াতের পথে বন্ধুর সঙ্গে চলে নিতে। এরপর এরশাদ করলেন আরিফ মারেফাতের কথা সে ভাবেই বলে যে ভাবে সে আয়ত্ব করেছে। আহলে আশেকদের জ্বালা ও ফরিয়াদ ঐ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মাশুকের সাথে মিলন ঘটে। আরিফদের কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না কেননা আল্লাহর মারেফাত তাদের হাসেল হয়েছে। আরও বললেন, স্রোতস্বিনী নদীর পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় যেমন ছল-ছল আওয়াজ করতে করতে সাগরে পতিত হয়ে মিশে যায়, তখন তার ফরিয়াদ বা অভিযোগের প্রয়োজন হয় না। ঠিক এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয় আশেকের, যখন সে মাশুকের সাথে মিশে যায়। নিশ্চুপ নীরবতা অবলম্বন করে, কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা কিছুই অবশেষ থাকে না। এরপর এরশাদ করলেন, আমি খাঁজা ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ)-এর মুখে শুনেছি সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার বন্ধুত্বের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি জগৎ প্রকম্পিত হয় এবং বন্ধুত্বে এ কম্পন যদি না হত তাহলে কোন সৃষ্টিই হত না এবং কেউ এবাদতও করত না। এরপর এরশাদ করলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ খফীফ ভুলবশতঃ দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সাথে সাথে মনে হল এ কাজে বন্ধুর সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ হয়, এর জন্য কসম খেয়ে বললেন," দুনিয়ায় 'যতদিন থাকব কোন কাজ আর করবনা'। এরপর তিনি পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু দুনিয়ার কোন কাজ আর করেন নি। খাঁজা বুজুর্গ এরপর বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)-এর ইশকের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, বায়েজীদ

বোস্তামী (রঃ) প্রত্যেক দিন সকালের নামাজ পড়ে এক পায়ের উপর খাড়া হয়ে ফরিয়াদ করতেন, একদিন গায়েবী আওয়াজ হল, ''ইয়াওমা তাবাদ্দিলুল আর্দ'' অর্থাৎ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন এই জমীন উলটিয়ে ফেলা হবে এবং এর পরিবর্তে অন্য জমীন আনা হবে এবং বিচ্ছেদকে মিলনে রূপান্তরিত করা হবে। এরপর অনুরূপ আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন, একবার হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) বোস্তামের মরুভূমিতে ওজু করলেন এবং ফরিয়াদ করতে লাগলেন, আমি যে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি মনে হয় এ মরুভূমিতে অনেক প্রেম বর্ষণ হয়েছে আমি পা বের করতে চাচ্ছি কিন্তু বেরুচ্ছে না। এরপর এরশাদ করলেন ইশক ও মহব্বতের পথ ভিন্ন ভিন্ন। যারাই এ পথে এসেছে নিজেদেরকে গোপন রেখেছে। আরও বললেন আহলে আরেফীনের মুখ থেকে আল্লাহর জেকের ছাড়া দ্বিতীয় কোন কথা বেরুতে পারে না। এরপর এরশাদ করলেন আরিফের নিম্নতম স্তরের নমুনা হলো দুনিয়াদারীর প্রতি অভিসম্পাত করা। এ পর্যন্ত বলার পর খাঁজা গরীব নওয়াজের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি বলতে লাগলেন আরিফের নিম্নতম স্তর হলো, দু'জাহানের অর্জিত সম্পত্তির সকল কিছুই যদি আল্লাহর নামে দান করে তবুও তা হবে অতি নগণ্য। প্রেমিক যদি প্রেমাস্পদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাহলে তার সমস্ত কর্মের ধারাগুলি হয় ভিন্নতর। যেমন, সে শুয়ে থাক্ অথবা জাগ্রত থাক্, বাঞ্ছিত প্রেমেই বিভোর থাকে। হৃদয়ের কর্মকে দৈহিক কর্ম হতে পৃথক করে রাখে এবং স্রষ্টার সম্মুখে নিজেকে উপস্থিত রাখে। অর্থাৎ সদা সর্বদা দৈহিক কর্মে থাকা সত্তেও অন্তরকে এবাদত বন্দেগীতে মশগুল রাখে। এরপর এরশাদ করলেন, খাঁজা সামনুন মুহিব্বা বলেছেন আউলিয়াদের অন্তর প্রেমাস্পদ থেকে এমন ভাবে সংবাদিত থাকে যে, তাঁদের প্রেমে বিঘ্ন ঘটানো দুনিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়, ফলে তাঁদের প্রতিটি মুহূর্তই এবাদতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সুতরাং এমন কোন বিরোধী শক্তি নেই যে এ গতিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এরপর এরশাদ করলেন, সেই প্রকৃত আরিফ যে চেষ্টা করে একটা ''দম'' (শ্বাস) লাভ করেছে। আরিফদের পরিভাষায় 'দম' শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। ''দম'' বলতে প্রতি দমে বা নিঃশ্বাসে জেকেরে নিয়োজিত থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত বজায় রেখে আল্লাহর মাঝে বিলীন থাকাকে বুঝায়।'' যদি কেউ এমন 'দম' পায় তাহলে সে ধন্য। আসমান জমিনে অনুসন্ধান চালিয়ে এমন দম লাভকারী ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুরূহ। আমি আমার পীরের মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত তিনটি গুণের অধিকারী, আল্লাহ তায়ালা তাকে বন্ধুত্বে গ্রহণ করেন।

১। নদীর মত বদান্যতা
২। সূর্যের মত দয়াদ্রতা
৩। মৃত্তিকার মত সহনশীলতা ও ভদ্রতা

এরপর এরশাদ করলেন আহলে সলুকদের মাঝে এমন জ্ঞান রয়েছে যার কাছে জড়বস্তুর জ্ঞান প্রবেশাধিকার পায় না অর্থাৎ পৃথিবীর কোন বস্তু সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা তার উত্তর দিতে সমর্থ হবে না। জাহেদ এমন ভাবে বন্দেগীতে বিভোর থাকে যে, তার নিজের সম্বন্ধেই সে কোন খবর রাখেনা এবং সে উভয় জগৎ হতেই অনবহিত, এটা আল্লার রহস্য। তাকে প্রেমিক ও আশেক ব্যতীত আর কেউ চিনে না এবং এ রহস্য উভয় জগতের বহির্ভূত। যারা উভয় জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন তারা ওদেরকে চিনবে।

আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌ আলা জালেক।

—০—

বৃহস্পতিবার, কদমবুসির মাধ্যমে সৌভাগ্যবান শ্রোতাদের সৌভাগ্য নসিব হল হযরত খাঁজা বুজুর্গের অমীয়বাণী শ্রবণ করার। অনেক দরবেশ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শুরু হলো "পুণ্যবানদের সঙ্গলাভ" নিয়ে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে "লিস্‌সোহ্‌বতে তাছেরা" অর্থাৎ সঙ্গলাভের উপকারিতা। যদি কোন পাপীর পুণ্যবানদের সঙ্গলাভ হয় তবে আল্লাহ্ ঐ পুণ্যবানদের সম্মানে তাকেও পুণ্যবানে রূপান্তরিত করেন। অনুরূপভাবে যদি কোন পুণ্যবান অসৎ সঙ্গ লাভ করে তবে সেও পাপীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়। আসল কথা হল যে রকম সঙ্গ হবে তার ফলও তদ্রূপ হবে। যা কিছু প্রাপ্তি হয় সঙ্গ লাভেই হয়। যাদের নেয়ামত লাভ হয়েছে সঙ্গ লাভেই হয়েছে। পুনরায় বললেন যদি পাপীগণ পুণ্যবানদের সঙ্গ লাভে সমর্থ হয় তবে তাহারা পুণ্যবানে রূপান্তরিত হতে পারে এবং পুণ্যবানও অসৎসঙ্গে পাপীদের অন্তর্গত হয়। নেক কাজের চেয়ে নেক লোকের সঙ্গ করা উত্তম হতে উত্তমতর এবং পাপ কার্যের চেয়ে পাপীদের সঙ্গ করা নিকৃষ্ট হতেও নিকৃষ্টতর। তারপর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সময়ের একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। যখন ইরাকের বাদশাহ গ্রেফতার হয়ে খলিফার নিকট নীত হয় তখন তিনি ইরাকের বাদশাহকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বললেন, ইসলাম কবুল করলে ইরাক আপনাকে ফেরৎ দেওয়া হবে। বাদশাহ উত্তর দিলেন, ইসলাম আমি গ্রহণ করব না। হযরত ওমর ফারুক বললেন, যদি ঈমান না আন তবে গর্দান যাবে। সে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করল, জল্লাদ এলো, সে পিপাসিত ছিল, বলল, আমাকে পানি দাও। পরিচারক (আহলে খেদমতগার) স্ফটিক পাত্রে পানি আনলে, বাদশাহ বলল, "এ পাত্রে পানি পান করব না।" হযরত ওমর (রাঃ) বললেন উনি বাদশাহ, উনার জন্য স্বর্ণ-নির্মিত পাত্রে পানি আনয়ন কর। আদেশ অনুযায়ী কাজ করা হল, সে পুনরায় উক্ত পানি পান করার অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলল, আমার জন্য মৃৎপাত্রে পানি আনয়ন করুন। মাটির পাত্রে পানি আনা হলে বাদশাহ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলল, ওয়াদা করুন যে, যতক্ষণ না আমি এ পানি পান করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাণ নাশ হতে বিরত থাকবেন। হযরত ওয়াদা করলেন, তাই হবে। বাদশাহ এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে পানিপূর্ণ পাত্রটি মাটিতে

আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলল এবং বলল আপনি কথা দিয়েছেন, যে পর্যন্ত আমি এ পানি পান না করব সে পর্যন্ত আমাকে হত্যা করবেন না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তার এ হেন বুদ্ধির প্রখরতায় জল্লাদকে বিদায় দিলেন এবং একজন বুজুর্গ সাহাবীর সাহচর্যে থাকার নির্দেশ দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই পুণ্যাত্মার সাহচর্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হল। বাদশাহ খলিফা (রাঃ)-কে খবর পাঠালেন "আমাকে আপনার সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি দানে বাধিত করুন। হযরত অনুমতি দিলে বাদশাহ উপস্থিত হল। হযরত পুনরায় তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। বাদশাহ এবার বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। বাদশাহের মুশরিক হতে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের পর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "ইরাকের বাদশাহী আপনাকে দেওয়া হচ্ছে আপনি তথায় রাজত্ব করুন।" বাদশাহ বললেন, রাজত্বে আমার কোন সাধ নেই। ইরাকের অন্তর্গত কোন অখ্যাত নিঝুম গাঁয়ে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বাকী ক'টি দিন কাটাবার অনুমতি দান করলে বাধিত হব। খলিফা (রাঃ) জনহীন গাঁয়ের অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন কিন্তু ইরাকে এমন কোন গ্রাম পাওয়া গেল না যেটা জন-মানব বিবর্জিত। খলিফা এই অনুসন্ধানের ফল বাদশাহকে জানিয়ে তার ইচ্ছা পূরণের অপারগতা প্রকাশ করলেন। বাদশাহ বললেন, "আমার উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করানোর মধ্যেই নিহিত ছিল, যাতে আপনি ইরাক সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন, যে ইরাক সুজলা-সুফলা ও শ্যামলিমাময়। বাদশাহের কর্তব্য তার দেশকে সুজলা-সুফলা রাখা। অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে আমি আমার শাসনামলে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইনি। ইরাকের খুব ভাল অবস্থায় তার শাসন ভার আমি আপনার হস্তে অর্পন করছি, এবার আপনি উহার শাসন কর্তা, আমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।" এ ঘটনা বলার পর খাঁজা গরীব নওয়াজ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ধন্য বাদশাহ তোমার বুদ্ধিমত্তার। এরপর মজলিসকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, "পুণ্যাগণের সোহবতে এমনি করেই ফলোদয় হয়" এবং কবিতার ছন্দে বললেন—

সোহবাতে নেকিয়া ব আজ তা'য়াতে আস্‌ত

অর্থাৎ—পুণ্যবানদের সঙ্গলাভে এমনি হয় ফলোদয়।

এরপর হযরত খাঁজা বুজুর্গ বললেন আমি আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী কাদ্দাসাল্লাহু সাররুহু হতে শুনেছি যে বান্দার উপর বুজুর্গদের বাণী তখন পর্যন্ত কার্যকরী হয় যখন পর্যন্ত বাম কাঁধের ফেরেস্তা ঐ বান্দার আমল নামায় লেখা শুরু না করে, যাহার সময় সীমা আট বৎসর পর্যন্ত

নির্দ্ধারিত। অতঃপর বললেন, আরেফানে হক (আল্লাহর পরিচয়-জ্ঞান লাভকারী ব্যক্তি) সেই যে আল্লাহর নিকট হতে বিনিময়ের আশা না করে। তারপর বললেন, যে আরিফ এবাদত না করে সে হারাম রুজি খায়। পরে বললেন, হযরত খাঁজা জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল প্রেমের ফল (Result) কি? উত্তরে তিনি বললেন, যে একে ভক্ষণ করে প্রেমময় আল্লাহ তাকে ইশ্‌ক্ (প্রেম) ও সরুর (আনন্দ) ততটুকু দান করেন, যতটুকু তার ধারণ করার ক্ষমতা থাকে। তাকে খোদা বান্দা থেকে বন্ধুতে উন্নীত করেন এবং যেহেতু তার সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করে। এরপর খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন, প্রেমময়ের সাথে আরিফ ও সালেকের প্রেমে কোন তফাৎ নেই। প্রত্যেক প্রেমিকই প্রেমাস্পদে মিলন আশায় আকাঙ্খীত এবং অতি যত্নবান। পুনরায় বললেন, মহব্বতের ব্যপারে শ্রদ্ধেয় উস্তাদজী, মওলানা শরফ্‌উদ্দিন (রঃ) প্রণীত 'শরাতুল ইসলামে' দেখেছি যে হযরত শায়খ শিবলী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার এবাদতের মহব্বতে এত নিবিষ্টতা-ভয়-বিহ্বলতা এবং অশ্রুপাতের কারণ কি? জবাবে তিনি জানিয়ে ছিলেন দু'টো জিনিস আমাকে ভীত করে রেখেছে; প্রথমতঃ আমি যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং বলা হয় তোমকে আমি চাইনা। দ্বিতীয়তঃ আমি আমার পূর্ণ ঈমান নিয়ে যেতে পারব কিনা? যদি পারি ভাবব পরিশ্রম সফল হয়েছে, তা না হলে সবই নিস্ফল হল। এরপর হযরত খাঁজা এরশাদ করলেন এক ব্যক্তি হযরত শায়খ শিবলী (রঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল খারাপ লোকের পরিচয় কি? তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি গোণাহ করে, ভবিষ্যতে করার আশায় থাকে এবং করে। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, আসল আরিফের পরিচয় কি? তিনি উত্তরে বললেন, ''সব সময় নিশ্চুপ ও সাধনায় লিপ্ত থাকা।'' খাঁজা গরীব নওয়াজ এরপর এরশাদ করলেন, পৃথিবীতে তিনটে জিনিস বন্ধুসুলভ, ১ম ঃ আলেমের (জ্ঞানীর) বক্তব্য, যা সে ধর্মীয় জ্ঞান থেকে পেশ করে। ২য় ঃ লোভ-লালসা বিবর্জীত ব্যক্তি। ৩য় ঃ যে আরিফ তার বন্ধুর (খোদার) প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করে। এরপর বললেন, একবার হযরত জুন্নুন মিসরী (রঃ) বাগদাদের কংকরী মসজিদে তরীকতপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে বসে মহব্বত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, একজন সুফি দাঁড়িয়ে আরিফ ও সুফি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। উত্তরে হযরত জুন্নুন মিসরী (রঃ) বললেন, সুফি এবং আরিফগণ এমন এক সম্প্রদায় যাদের মন মুক্ত হয়েছে পৃথিবীর আশক্তি হতে, জয় করেছে লোভ-লালসাকে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করেছে জড়-বস্তুর সাথে।

খাঁজা বুজুর্গ এরপর তাসাউফ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, তাসাউফ কোন

সাধারণ জ্ঞান বা 'রসম' (আচার-আচরণ) নয়। তাসাউফ মানুষকে এমন এক চরিত্রের অধিকারী করে যার তুলনা শুধু বেহেস্তের দ্বার-রক্ষী ফেরেস্তা রেদওয়ানের স্বভাবের মত। ইহা মুর্শেদ কতৃক আল্লাহ্‌র পথে প্রদত্ত এমন এক শিক্ষা যা নফসকে বিনাশ ও মনজিলে (আকাংখিত স্থানে) পৌঁছবার পাথেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে ইহা সম্পর্কযুক্ত। ইহা সাধারণ জ্ঞান বা রীতির মাধ্যমে সাধিত হয় না। কেননা জ্ঞান বা রীতি এমন কোন স্বভাব বা চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় না যে স্বভাব বা চরিত্র প্রেমময় আল্লাহর প্রিয়। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের সাথে সংযুক্ত।

আরিফ সম্বন্ধে এরশাদ করলেন আরিফগণ দুনিয়ার দুশমন; মওলার সঙ্গে সম্বন্ধে নশ্বর পৃথিবীকে তারা ঘৃণা করে। পৃথিবীর প্রেম হতে তারা বিমুক্ত এবং দুনিয়ার আকর্ষণ হতে বিকর্ষিত। আরিফ সম্বন্ধে অন্য একজন বললেন, "আরিফগণকে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হয়ে বহু অশ্রু ঝরাতে হয়।" এর উত্তরে খাঁজা গরীব নওয়াজ বললেন, "স্রষ্টার সাথে মিলনে তাদের সব দুঃখ মুছে যায়। পরে এরশাদ করলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেমিকদের মধ্যে এমন একদল আছে যারা খোদার বন্ধুত্বে নির্বাক হয়ে যায়। তারা না জানে প্রকৃতির ধন-সম্ভার ও সৌন্দর্যকে এবং না যানে তা হাসিলের দোয়া। অতপর বললেন, পরম করুণাময় আল্লাহ যার অন্তরে বন্ধুত্বের আসন গেড়েছেন অর্থাৎ যে 'আশেকে সাদিক' তার উচিত দু'জাহানকেই একই দৃষ্টিতে দেখা, যদি না দেখে তাহলে সে প্রকৃত প্রেমিক নয়। পরে বললেন হযরত দাউদ তায়ী (রঃ)-কে দেখেছি, এবাদত খানা হতে চোখ বন্ধ অবস্থায় বেরিয়ে এসে মজলিসে দাঁড়ালেন। একজন দরবেশ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর এ অবস্থার মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় আছে কি? তিনি জবাব দিলেন আজ ৪৫ বৎসর হয়ে গেছে এ চোখ দু'টোকে পট্টি বেঁধে বন্ধ করে রেখেছি। এ জন্য যে, আল্লাহ তায়ালাকে ভিন্ন অন্য কাউকে দেখব না। কেননা আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম করে অন্যকে দেখা মহব্বতের পরিপন্থী। এরপর বললেন, খাঁজা আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রঃ) বলেছেন আল্লাহ তাঁর যে বন্ধুকে দীদার (দর্শন) দিয়েছেন, স্বীয় প্রেম সেই বন্ধুর অন্তরে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যার পরিপূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ধ্বংশ হবে না। আরিফ আল্লাহতে বিলীন হয়, তার কোন চেতনা থাকে না। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় ছিলে বা কি চাও? উত্তরে সে বলবে একমাত্র মহান স্রষ্টা ব্যতীত কিছু বুঝিনা। এরপর এরশাদ করলেন আফামান শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইস-লামে ফাহুয়া আলা নূরিম্‌মের রাব্বেহি" (সূরা যুমার-২২ আয়াত) (অর্থঃ আল্লাহ্ পাক যাদের হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রসস্ত করেছেন তাঁরা আল্লাহর নূরের উপর

অবস্থান করেন। যদি কেউ এ আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করে, তবে উত্তর দেবে যে, এ আয়াত আরিফদের মর্যাদা। যখন আরিফ ওহ্‌দানিয়াত ও জালালে রবুবিয়াতের স্তরে পৌঁছে তখন সে অন্ধ হয়ে যায়। আর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনা। এরপর বললেন, যখন বুখারা শহরে মোসাফির ছিলাম এবাদতে মশগুল এ বুজুর্গকে দেখলাম। তাঁর দৃষ্টি শক্তি রহিত ছিল। জিজ্ঞেস করলাম আপনি দুনিয়া দর্শণে বিরত কত দিন যাবৎ? উত্তরে তিনি বললেন, 'যতদিন যাবত মারে'ফাত (পরিচিতি, আল্লাহর প্রাপ্তি বা আধ্যাত্মিক বা ঐশী অসীম জ্ঞান) হাসিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার আজমাতের (শ্রেষ্ঠত্বের) জ্যোতি বসে বসে অবলোকন করছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি সম্মুখের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ আমার দৃষ্টি তার প্রতি নিপতিত হওয়ায় গায়েবী আওয়াজ হল, "আমার সাথে প্রেম করে গায়রুল্লাহ্‌তে (আল্লাহ ভিন্ন অন্য) দৃষ্টি দিচ্ছ? আমি ভীষণ ভাবে লজ্জিত হয়ে বললাম, ইয়া এলাহি যে চোখে প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্যের প্রতি নজর দিয়েছে তাকে জ্যোতি-বিহীন কর।" বলার সাথে সাথেই আমার দৃষ্টির বাহ্যিক শক্তি শেষ হলো। এরপর গরীব নওয়াজ বলতে লাগলেন, হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির পর হুকুম করলেন, 'নামাজ পড়'। তিনি নামাজ আরম্ভ করতেই অন্তর মিলনাকাঙ্খায় পুলকিত হয়ে আত্মা স্থায়িত্বের ঘরে পৌঁছে স্থির হলো। সৃষ্টির উদ্দেশ্য এর মধ্যেই নিহিত ছিল। তারপর বললেন, এক বুজুর্গ সব সময় এই দোয়া করতেন, "ইয়া এলাহি হাশরের দিন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্তোলন করো।" মজলিসের লোক এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করলো এ কেমন দোয়া হলো? হুজুর বললেন, যে লোক বন্ধুকে দেখতে চায় তার উচিত অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা।

খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন, দরবেশীর অর্থ এই যে ক্ষুধার্থকে আহার দান করা, তৃষ্ণার্তকে পানি দেওয়া এবং বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করা। কাউকেই নিরাশ করা চলবে না। অভাবগ্রস্তদের অভাব জেনে নিয়ে তার অভাব মেটানো দরবেশের কাজ। এরপর এরশাদ করলেন একবার আমি এবং আমার শায়খ হযরত ওসমান হারুনী (কাঃ সাঃ) ভ্রমণরত ছিলাম, রাস্তায় কামেল বুজুর্গ হযরত খাঁজা বাহাউদ্দিন আউশী (রঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁর নিয়ম ছিল কোন লোক তার খানকায় এলে তিনি সে ব্যক্তির নেক আকাঙ্খা অবশ্যই পূর্ণ করতেন। যদি কোন বিবস্ত্র আসত তাহলে তিনি তাঁর স্বীয় পরিধেয় কাপড় খোলে তাকে পরাতেন। অনেক সময় এমন হতো যে স্বীয় কাপড় খোলার পূর্বেই ফেরেস্তা তাঁর জন্য উত্তম বস্ত্র এনে হাজির করতেন। উনার খেদমতে আমি কিছু দিন ছিলাম। বিদায়ের সময়ে তিনি আমাকে

উপদেশ দিলেন টাকা পয়সা যা কিছু পাও নিজের কাছে না রেখে খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে তুমিও এলাহির বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়ে যেয়ো। আরও বললেন, দরবেশ যা কিছু হাসেল করে এসব দান খয়রাতের বিনিময়েই করে থাকে এরপর একজন দরবেশের ঘটনা বর্ণনায় বললেন, এক দরবেশ ছিলেন যার নিয়ম ছিল নজর নিয়াজ যা কিছু আসত সবই দরবেশদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। নিজে পরিশ্রম ও মজদুরী করে জীবন জাপন করতেন। একবার সমস্ত নজর নিয়াজ বন্টন করে শেষ করার পর দু'জন দরবেশ উপস্থিত হয়ে পানি চাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে গেলেন এবং পানীর সঙ্গে দু'টো রুটীও এনে তাঁদের সম্মুখে রেখে আহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। দরবেশ দু'জন অত্যন্ত ক্ষুধার্থ ছিলেন। তাঁরা সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করলেন এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ করলেন, এর বিনিময়ে একে কিছু দেওয়া উচিত। একজন ইচ্ছা করলেন স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করার, অপর জন বাধা দিয়ে বললেন, দরবেশকে কেন দুনিয়ায় জড়াতে চাও। পরিশেষে দোয়া করে বললেন, "ইয়া এলাহি এ দরবেশকে কামেল বুজুর্গ কর।" তাঁদের দোয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হল এবং সে দরবেশ কামেল ওলির দর্জা (প্রকোষ্ঠ) লাভ করলেন। এরপর হতেই ঐ দোয়ার বরকতে তাঁর লঙ্গরখানার পরিধি এত বৃদ্ধি পেল যে প্রতিদিন হাজার মনের খাবার রান্না হত।

হযরত খাঁজা বুজুর্গ এরশাদ করলেন, প্রেমের পথে সেই প্রেমিক যে নিজেকে উভয় জগৎ হতে নির্লিপ্ত রেখেছে। (অর্থাৎ যেমন প্রয়োজন নেই তার দুনিয়ার ঐশ্বর্যে, তেমনি নেই আখেরাতের সম্পদে অর্থাৎ বেহেস্তে)। খাঁজা বাবা বললেন প্রেমে, প্রেমিকের চারটি বিষয়ের প্রতি অতি যত্নবান হতে হয়। প্রথমতঃ খোদা তায়ালার জেকেরে সদা সর্বদা নিমগ্ন ও সন্তুষ্ট চিত্তে থাকা। দ্বিতীয়তঃ জেকেরের পরিপূর্ণতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছান। তৃতীয়তঃ এমন ভাবে শোগল (আল্লাহর ধ্যানের একটা প্রক্রিয়া) করা যাতে দুনিয়ার মহব্বত বিদূরিত হয়। চতুর্থতঃ সর্বদা ক্রন্দন করা (অর্থাৎ কান্নায় মন যে ভাবে বিগলিত হয় ঠিক সেই অবস্থাটা বজায় রাখা)। এরপর প্রেমিক বা আশেকদের জন্য রয়েছে চারটি মনজিল ১। মহব্বত (প্রেম) ২। ইলমিয়ত (জ্ঞান অর্জন) ৩। হায়া (লজ্জা) ৪। তা'জীম (সম্মান) এরপর বললেন মহব্বতে সাদিক (প্রকৃত প্রেমিক) সেই যে স্বীয় পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হতে বিমুক্ত থেকে আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকে এবং তাঁর সাথে মহব্বত রাখে, যার সাথে খোদা মহব্বত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর বললেন, হযরত খাঁজা হাসান বসরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আরিফ কে? উত্তরে তিনি

বললেন, সেই ব্যক্তিই আরিফ যে দুনিয়া হতে নির্লিপ্ত হয়েছে এবং নিজের সমস্ত ধন দৌলত খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন। তারপর বললেন মহব্বতের পবিত্রতাই আরিফদের স্বভাব। আরও বললেন দরবেশদের সাথে উঠা বসা করা এবং পবিত্র মন নিয়ে আলোচনা করা পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম কাজ এবং এর বিপরীত কর্মকাণ্ডই সবচেয়ে খারাপ কাজ। এরপর বললেন, প্রকৃত বন্ধু সেই, যে বন্ধুর (আল্লাহর) নিশেধাজ্ঞা পালনে কৃতকর্ম। আরিফ তখনই কামেল হয় যখন তাঁর নিজের পছন্দ মত কাজ করার ইচ্ছা না থাকে বা না জাগে, শুধু বন্ধুর (আল্লাহর) স্মরণই স্থায়ীত্ব লাভে করে। প্রকৃত আরিফ সেই, যার কাছে মালপত্র ধন-দৌলত কিছুই থাকেনা। একবার হযরত সামনুন (রঃ) বন্ধুর প্রেম সম্বন্ধে কথা বলছিলেন এমন সময় একটা পাখী উড়ে এসে তাঁর মাথায় বসলো, পরে ডান হাতে, তারপর মাটিতে নেমে ঠোকরাতে লাগলো, ঠোকরাতে ঠোকরাতে ঠোঁট দিয়ে শোণিত ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো এবং কিছুক্ষণ পরে পাখীটি মারা গেল। হযরত এ পর্যন্ত বলার পর তেলাওয়াতে মশগুল হলেন এবং মজলিস তখনকার মত শেষ হল।

আলহামদু লিল্লাহি আলা জালেক।

—০—

বুধবার। প্রথমে কদমবুসির সৌভাগ্য অর্জিত হল। মওলানা বাহাউদ্দিন শায়খ আহাদ কিরমানী (রঃ) এবং আরও অনেক দরবেশ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আরিফদের তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। খাঁজা গরীব নওয়াজ (রঃ) এরশাদ করলেন তাওয়াক্কুল (ভরসা) একমাত্র খোদা ভিন্ন অন্য কারো উপর হয়না এবং কারো প্রয়োজনও হয় না। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি দুঃখ দুর্দশার জন্য কারও কাছে অভিযোগ করে না। এরপর বললেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হযরত জিব্রাইল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন আপনার কোন বাসনা থাকলে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, "তোমার কাছে কিছু চাওয়ার নেই"। কেননা আল্লাহ্‌র বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় নফস হতে গায়েব ছিলেন এবং বাতেনে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। পরে এরশাদ করলেন 'তাওয়াক্কালে' এমন একটা পর্যায় আসে যখন তাঁকে কোন যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা কেটে টুকরো টুকরো করলে বা গায়ের চামড়া তুলে নিলেও তাঁর চৈতন্য হবে না। এরপর বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে আরিফের তাওয়াক্কুল এমন হয় যে জড়-জগতের প্রতি তার কোন নেশা থাকেনা। খাঁজা বায়েজীদ বোস্তামীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আরিফের পরিচয় কি? উত্তরে বলেছিলেন, 'সেই আরিফ, যে জ্ঞান, কর্ম ও সৃষ্টি জগৎ হতে নির্লিপ্ত। যে পর্যন্ত সে উক্ত তিন বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত না করতে পেরেছে সে পর্যন্ত সে তাওয়াক্কালকারী নয়। অন্য এক বুজুর্গের কাছে আরিফ সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দিলেন, সেই আরিফ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী নয়।" হযরত খাঁজা এরপর বললেন আমি নিজে, এক বুজুর্গের মুখে শুনেছি 'শওকের' এমন কিছু অবস্থা আছে যা আরিফের মাঝে দেখা না গেলে তাকে আরিফ বলা চলবেনা। প্রথমতঃ আনন্দের সময় মৃত্যুকে স্মরণ করা। দ্বিতীয়তঃ মাওলার সাথে মহব্বত এখতিয়ার করা। তৃতীয়তঃ প্রেমে আল্লাহর বন্ধুত্বের সন্তুষ্টি হাসেল এবং তাঁর সাথে দৃষ্টি বিনিময় ইত্যাদি সময়ে বেচৈন (অস্থির) থাকা। এরপর বললেন, শিহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রঃ) বলেছেন পৃথিবীতে এ দুই বস্তু হতে উত্তম কিছু নেই। প্রথম দরবেশদের সঙ্গে থাকা, দ্বিতীয়তঃ ওলিগণের ইজ্জত করা।

পরবর্তী আলোচনা তওবা সম্বন্ধে হয়েছে। হুজুর এরশাদ করলেন, 'তওবার কয়েকটা স্তর আছে; তন্মধ্যে প্রধান স্তর হলো মূর্খ বা অজ্ঞ হতে দূরে থাকা।

২য়—মিথ্যাবাদীদের সঙ্গ ত্যাগ করা। ৩য়—মুনকির বা অবিশ্বাসী হতে দূরে থাকা। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন, সেই বৃদ্ধ বা অভিজ্ঞদের মধ্যে গণ্য হয় যে বলা ছেড়ে দেয় এবং তাতে দৃঢ় থাকে ; অর্থাৎ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে। এরপর বললেন এই পথে দু'টো জিনিস মজবুত করতে হয়, ১। আদবে আবুদিয়াত অর্থাৎ বন্দেগীর সম্মান করা, ২। আল্লাহ্‌র মা'রফাতকে তা'জীম করা। হযরত শায়খ শিবলী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ; শওকের মান বেশী না মহব্বতের ? তিনি উত্তরে বললেন মহব্বতের কারণ শওক বা সন্তুষ্টি মহব্বতেরই ফল। এরপর বললেন হযরত আদম (আঃ)-এর যে (জান্নাত) ভুল হয়েছিল তাতে আওয়াজ হলো, "আ'সা আদামা রাব্বাহু"। অর্থ আদম (আঃ) নিজ প্রভুর সন্নিধানে কাঁদলেন। সমস্ত মখলুক হযরত আদম (আঃ-)কে দেখে কাঁদতেছিল কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্য আরজ করল আমি তাঁর এ অবস্থায় কাঁদব না। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের এ আরজ শুনে বললেন, আমি তোমাদের মূল্য বর্দ্ধিত করব এবং বনিআদমদেরকে তোমাদের খাদেম বানাব। যারা পার্থিব বস্তুর সঙ্গে মহব্বত বা প্রেম করে তারা আল্লাহ্‌র প্রেম হতে বিচ্ছিন্ন হবে। প্রেমের ইচ্ছা পূর্ণ হয় মহামহিমের সাথে মহা-মিলন ঘটলে এবং সম্মান অর্জিত হয় বর্জিত বস্তু হতে বিমুক্ত থাকলে। অর্থাৎ এলাহির নূর দর্শণের মাধ্যমে ফকির দীদার লাভ করে। সেই প্রকৃত বন্ধু, যে স্বীয় স্রষ্টার প্রতি ধ্যানমগ্ন থাকে ; নফসের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং ফরজ সমূহের প্রতি যত্নবান হয়। এরপর এরশাদ করলেন, সৈয়দ আত্তায়েফা জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো মহব্বতের স্তর গুলি কি কি ? উত্তরে তিনি বললেন, প্রেমিকের ডান হাতে যদি সেই ভয়াল ও বিভীষিকাময় ৭টি দোজখ স্থাপন করে রাখা হয়, তাহলেও সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলবে না যে, ডানহাত হতে বাম হাতে রাখ, বরং সে বলবে এলাহির যতক্ষণ ইচ্ছা এ হাতেই থাক।

এরপর মা'রেফাত সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন, "আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি প্রথম ফরজ করেছেন তাঁর মা'রেফাতকে।" কোরান শরীফ এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়াবুদুন"। (আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার বন্দেগীর জন্য)। এখানে কথা হচ্ছে যার বন্দেগী করব তাঁর পরিচয় বা মারেফাত লাভ করাই প্রথম কর্তব্য বা ফরজ। তা না হলে বন্দেগী আল্লাহ্‌মুখী না হয়ে গায়রুল্লাহ্‌তে যাবে, যার ফল হবে অনন্ত কাল দোজখ ভোগ। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সমস্ত রহস্য ভাণ্ডার হতে বহু তথ্য সৃষ্টির মাঝে গোপন রেখেছেন। এরপর বললেন ইসরারুল আউলিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে

হাশরের দিন আশেকদেরকে বিশ্বাস ও প্রেম সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। যে ব্যক্তি সত্যিকারের প্রেমিক সে এর উত্তর দানে সক্ষম হবে এবং যে আশেক নয় সে লজ্জিত হবে এবং জবাবও দিতে পারবেনা তখন প্রমাণিত হবে যে, সে সত্যিকারের প্রেমিক ছিলনা। এরফলে ভণ্ড আশেক আশেকদের দল হতে বিতাড়িত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, তারাই আশেকদের দলভুক্ত যারা নিঃসংকোচে বন্ধুর বাক্য শ্রবণ করে। 'আন কালবী রাব্বি' আল হাদিস। অর্থাৎ আশেকদের অন্তর স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কিছু শুনেনা। সত্যিকারের প্রেমিকদেরকে পরলোকে পৌঁছার সাথে সাথেই পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। তারপর একটা ঘটনার বর্ণনায় বললেন, জঙ্গলে পতিত এক দরবেশের লাশ দেখা গেল হাসছে ; লাশকে প্রশ্ন করা হল, তুমি মরে যাওয়ার পরও হাসছ কি করে? লাশ উত্তরে বললো, ঐশী-প্রেমে প্রেমিকদের অবস্থা এমনই হয়। পরে এরশাদ করলেন, আরিফের অন্তর স্বীয় চৈতন্য হতে মুক্ত থাকে, বন্ধু দর্শণে হয় বিভোর, এক আল্লাহ্‌তায়ালা থাকেন তার সমস্ত কাজের জিম্মাদার। স্বীয় সত্তার উপর কখনও সে নির্ভরশীল হয়না এবং আরশ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তার চৈতন্যোদয় হয়না। এ অবস্থায় চলাচলের পথকে বলে সলুকের পথ বা বন্ধুত্ব হাসিলের পথ।

মালেক বিন দিনার (রঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, ' পরওয়ার দীগারের গোলামী আদায় হবে কিভাবে "? তিনি জবাব দিলেন, এবাদতের মাধ্যমেই গোলামী হাসেল হবে এবং বন্ধুর সাথে মিলন ঘটবে। তারপর বললেন হযরত রাবিয়া বসরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমল কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, সময় মত মোরাকাবায় থাকা। যে ব্যক্তি বুজুর্গীর দাবী করে সে এখনও বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যখন তার সমস্ত বাসনা ধ্বংশ হবে তখন তার দাবী সত্যে পরিণত হতে পারে, নতুবা সে মিথ্যাবাদী। আরও বললেন, সেই পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যে তার সমস্ত বাসনাগুলিকে ধ্বংশ করে একমাত্র আল্লাহ্ প্রাপ্তির বাসনাকে অবশিষ্ট রেখেছে। (সে নামের কাঙাল নয়) নাম তার তাই হবে, যা আল্লাহ্ তায়ালা দান করবেন। একমাত্র বন্দেগী ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সমূহের সাথে সে কোন সম্বন্ধ রাখে না। আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের কোন নাম নেই, রীতি নেই, নেই কোন প্রশ্ন বা তার উত্তর। এরপর বললেন আমি খাঁজা ওসমান হারুনী (রঃ) হতে শুনেছি যে, আহ্‌লে আশেক একমাত্র বন্ধু ভিন্ন আর কারও সাথে প্রেম করে না। কেননা বন্ধু ব্যতীত যে খুশী হয় তাতে সমস্ত দুঃখ দুশ্চিন্তা নিকটে এসে পড়ে এবং সে বন্ধুর সাথে মহব্বত করে না, ভয়-ভীতি তাকে আবিষ্ট করে রাখে। সুতরাং

যার বন্ধু নেই তার কিছুই নেই। এরপর এরশাদ করলেন, —আরিফ সেই ব্যক্তি, যে সকালে উঠে রাত্রির কথা বিস্মৃত হয়। অর্থাৎ বন্ধুর খেয়ালে সে এতই মশগুল থাকে যে এক দিকে বলে অপর দিকে ভুলে যায়। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা গরীব নওয়াজের চোখে পানি দেখা দিল। তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, 'ওহে গাফেল, প্রথম পাথেয় যোগাড় কর, কেননা মৃত্যু অতি সন্নিকটে, তার জন্য প্রস্তুত থাক। তারপর বললেন, আহলে আশেক এমন একটি সম্প্রদায়, আল্লাহ ও তাঁদের মাঝে কোন পর্দা নেই। আরিফ প্রেমের ব্যাপারে কখনও গর্ব করে না, কেননা অভিবাদন বা অভিনন্দন পাবে এমন কোন সাধ তাদের জাগে না। তা'ছাড়া সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া কর্মকেই যখন তারা বিদায় করেছে তখন আর গর্বের প্রশ্ন থাকে কোথায়? এরপর এরশাদ করলেন, সবচেয়ে উত্তম সময় সেটাই হবে, যখন নফসের অভ্যাসকে পবিত্র ও সন্দেহযুক্ত সৃষ্টি হতে মুক্ত রাখবে। যার প্রেম হয় সে দারিদ্র বা অভাব অনটনকে ভয় পায়না। অবশ্য আল্লাহর পরিচয় লাভকারিগণের ভালবাসার খ্যাতি আছে।

বিশ্বাস (এক্বিন) এক নূর, মানুষের অন্তর যখন উহাতে আলোকিত হয়ে যায় তখন উহার উছিলায় সে মাহবুব ও মুত্তাক্বিনের স্তরে উপনীত হয়। এরপর এরশাদ করলেন, মানবজাতীকে প্রথমে মাটি ও পানি দ্বারা বানান হয়েছে। যার মধ্যে পানির ভাগ বেশী, সে এবাদতে অধিক মশগুল হবে এবং এর জন্যই সে মনজিলে মকছুদে পৌঁছতে পারবে। যার শরীরে মাটির ভাগ বেশী সে নেক হবে; দৃঢ়তা ও কাঠিন্যতায় তার পরিচয় মিলবে। পরে বললেন, পৃথিবীতে খাওয়ার পানি ছিল না, যার জন্য হকতায়ালা মেঘ সৃষ্টি করেন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ জমা করেন, তারপর সব উপাদান মিশ্রিত হয়ে পানিতে পরিণত হয়। পানিতে একটা স্বাদ রয়েছে, যা আজও পর্যন্ত কারও দ্বারা সঠিক নির্ধারণ হয়নি। পানি দ্বারা প্রাণী ও জীবজগতের প্রত্যেকে জীবিত আছে। এরপর উপস্থিত মজলিস হতে একজন লোক দাঁড়িয়ে হযরত খাঁজা বাবার নিকট 'মজনুন' সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। হুজুর বললেন, মজনুন (প্রেমিক উন্মাদ) ঐ ব্যক্তি যে শুরুতেই প্রেমে গোলামীর শিকল পরিধান করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে গুপ্ত থাকে। প্রশ্নকর্তা তারপর আরজ করলেন, 'কানা ও বাকা' কি জিনিস? হুজুর বললেন, 'বাকায়ে হক' অর্থাৎ হক তায়ালার জাতে বিলীন হওয়া ও অমরত্ব লাভ করা। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, "তাজরীদ" সম্বন্ধে। 'তাজরীদ' সম্বন্ধে গরীব নওয়াজ বললেন, "মাহবুবের গুণাবলীর মাঝে প্রেমিকের অন্তর বসে যাওয়া।" ফা এজা আহ্যাবতুহু কুনতু লাহু সামমান ওয়া বাছরান

(আল হাদীস) অর্থ—যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি হই তার চোখ ও কান। এরপর এরশাদ করলেন, মুলতানে এক বুজুর্গের মুখে শোনেছি, আহ্‌লে মহব্বতের (প্রেমিকদের দল) তওবা তিন প্রকারে বিভক্ত—১। নিদামত (অনুতাপ) ২। তরকে মসিয়াত (পাপ কার্য ত্যাগ করা) ৩। মযালিম ও খুসুমত (জুলুম, অত্যাচার ও বিবাদ বিসম্বাদ) হতে পবিত্র থাকা। এরপর বললেন, জ্ঞান এক পরিবেষ্টনকারী বস্ত, মা'রেফাত ঐ বেষ্টনীর একটা অংশ। পরে বুজুর্গদের শানে বয়ান করলেন—

চে নিসবত খাকে রাহ্ না আলমে পাক

অর্থ—মাটির কি তুলনা হয় আলমে পাকের সঙ্গে?

প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ্ পাকের আছে এবং আকাঙ্ক্ষা ও উপযুক্ততা অনুপাতে তাঁর পরিচিতির জ্ঞান (মা'রেফাত) মানুষকে দান করেন। এরপর বললেন, যে পর্যন্ত পবিত্র রহস্য আরিফদের হাসিল না হয় সে পর্যন্ত কোন আমলই তাদের পবিত্র হয় না। খোদাতায়ালা যাকে বন্ধু বানান, তার মাথার উপর দুঃখ-কষ্টের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর বললেন, আহ্‌লে সলুকদের তওবা তিন প্রকারের—(১) কম আহারে অভ্যস্ত থাকা, যাতে রোজা রাখতে কোন কষ্ট না হয়। (২) কম শয়নে অভ্যস্ত থাকা, যাতে বন্দেগীর ব্যাঘাত না ঘটে। (৩) কম কথা বলা, যাতে প্রার্থনার অসুবিধা না ঘটে। এ ছাড়া আরও তিনটি বিষয় আছে—(ক) খউফ (ভয়), (খ) রেজা (ভরসা), (গ) মহব্বত (প্রেম)। ভয়ের আমানত হিসাবে গোনাহ বর্জন করা, যাতে দোজখের অগ্নি হতে মুক্তি মিলে। ভরসার আমানত হিসেবে বন্দেগীতে মশগুল থাকা, যাতে কাম্যবস্তু প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত না ঘটে—এটা একটা বৃহৎ বিজয়। প্রেমের আমানাত হিসেবে রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে যত্নবান হওয়া, যাতে তাঁর সন্তুষ্টি হাসেল হয়। আরিফের মহব্বত এমনই হবে যেন সে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে বন্ধু না ভাবে। এ কথা বলার পর হুজুরের চোখে অশ্রু নেমে এল এবং ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, এখন আমি সেই স্থানে অবস্থান করছি, যেখানে আমার সমাধি হবে। একথা বলার পর আমাকে ও প্রত্যেককে দোয়া করলেন এবং পরে আমাকে এরশাদ করলেন, তুমি আমার সাথে চলো। আমি (কুতুবুদ্দিন) এবং আমার সাথে আরও কয়েকজন দরবেশ, কেবলাকে অনুসরণ করলাম। দু'মাস সফরে ছিলাম পরে আজমীরে পৌঁছলাম। হুজুর বাসস্থানে অবস্থান করলেন, এ সময়ে আজমীর হিন্দুদের আভাসভূমি ছিল, মুসলমান ছিল না। যখন হুজুরের কদম মোবারক এখানে পড়ল, তখন এত অধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করলো, যার সংখ্যা হিসেব করা দুঃসাধ্য ছিল।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

দ্বাদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার : স্থান - জামে মসজিদ, আজমীর। এটাই খাঁজা গরীব-উন-নওয়াজের শেষ মজলিস। এ অধীনের কদমবুসি হাসেল হলো। তরীকত বন্ধু, আহ্‌লে সোফফা সঙ্গীগণ এবং অনেক বুজুর্গ দরবেশ হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। 'মালেকুল মওত' সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হুজুর এরশাদ করলেন, দুনিয়া মৃত্যু ছাড়া আর কোন কাজের নয়। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন, খোদার রসুল (সঃ) বলেছেন, আল মাওতু জাসরুন ইউছেলুন হাবীবুল ইলাল হাবীব (আল হাদীস)। অর্থাৎ মৃত্যু একটা পুলের মতো, যার উপর দিয়ে বন্ধু বন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়। বন্ধুত্ব উহাই যাহা মুখ দিয়ে নয় বরং অন্তরে স্মরণ করা হয় এবং জিহ্বাকে হকতায়ালা ব্যতীত অন্য কারও সম্বন্ধে বলা বিরত রাখে। এরপর এরশাদ করলেন, প্রাণকে শুধু এ জন্যই তৈরী করা হয়েছে যেন সে আরশের চার পাশে তওয়াফ (পরিভ্রমণ) করতে পারে। এরপর এরশাদ করলেন, "মুহব্বত" পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, হক সোবহানতায়ালা বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ, আমার জেকের তোমাদের উপর জয়ী হয়েছে, আমি তোমাদের আশেক হয়েছি।" অর্থাৎ তোমাদের সাথে আমার প্রেম হয়েছে। এরপর বললেন, খোদার প্রেমিক, আরেফদেরকে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টি জগতের উপর তাঁদের জ্যোতি পতিত হয়। সকলেই তাঁদের নূরে আলোকিত। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "ওহে দরবেশগণ, আমাকে এখানে আনা হয়েছে কারণ এখানেই আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হবে। এখন বাকী ক'দিন আমি সৃষ্টির জন্য কিছু করব। শায়খ আলী সন্‌জরী, হুজুরের কাতেব (কেরানী), উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দিলেন, কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামে চিঠি লেখ, সে যেন দিল্লী যায়, খিলাফাত এবং সাজ্জাদায়ে খাজেগান (খাজেগানের গদী) আমি তাকেই দান করছি। সে দিল্লীতেই অবস্থান করবে। চিঠি লেখা শেষ হলে আমাকে দান করলেন। আমি আমার পীর ও মুর্শেদ খাঁজা গরীব নওয়াজের শুকরিয়া করলাম। হুকুম হলো, সামনে এসো। আমি কাছে গেলাম হুজুর স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা তাঁর পাগড়ি মোবারক আমার মস্তকে রাখলেন এবং আমার দাদা পীর হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সাঃ) এর আছা (লাঠি), কোরান শরীফ ও মুছল্লা (জায়নামাজ) যা তিনিও পেয়েছিলেন

তার মুর্শেদ হতে, আমাকে দান করলেন এবং বললেন, এগুলো রসূলে খোদা (সাঃ)-এর আমানত। খাজেগানে চিশ্‌ত হতে আমাকে দেওয়া হয়েছিল এবং আমি তোমার কাছে অর্পন করলাম এগুলোর হক আমি এবং অন্যান্য খাজেগান যে ভাবে আদায় করেছি তুমিও তদ্রূপ করবে; হাশরের দিন যেন আমাদের মাশায়েখগণের সামনে আমাকে লজ্জিত না হতে হয়। আমি তাঁর সমস্ত কথাকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করলাম এবং দু'রাকাত 'শুকুরানা'র নামাজ আদায় করলাম। পরে তিনি আমার হাত ধরে স্বীয় মুখ আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললেন, যাও তোমাকে খোদার হাতে সমর্পন করলাম এবং তোমাকে তোমার মন্‌জিলে পৌঁছিয়ে দিলাম। পরে এরশাদ করলেন, চারটি জিনিস মণিমুক্তার মতো উপা দয়। (১) দরবেশকে যেন ধনী ও অভিজাত মনে হয়। (২) ক্ষুধার্থকে পর্যাপ্ত অন্ন দান করা। (৩) অন্তরে বিষণ্ণ থাকা কিন্তু চেহারায় খুশী ও উৎফুল্ল ভাব বজায় রাখা। (৪) খোদার দুশমনের সাথেও দোস্তী ও দয়া দেখানো। পরে বললেন, আহ্‌লে মহব্বতের অবস্থা এমন থাকে যে, যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় চাশতের নামাজ পড়েছ? জবাব দিবে আমার অবসর নেই। মালেকুল মওতের পিছে ঘুরছি, যে জায়গায় সে অসহায় হয়, তাকে সাহায্য করি। আমি ভাবছিলাম কদমবুসি করে বিদায় নিব। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কাছে ডাকলেন, আমি কাছে গেলাম এবং কদম মোবারকে পড়ে রইলাম। হুজুর আমাকে তুলে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। পরে ফাতেহা পড়লেন এবং বললেন, তরীকার রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এ পথে বীর পুরুষের মতো থাকবে। আবার তাঁর কদম মোবারকে স্থান নিলাম। তিনি আমাকে আদর করে বুকে তুলে নিলেন। পরে আমি দিল্লী চলে এলাম এবং নির্দেশ মতো এখানেই বসবাস করতে লাগলাম। কিছু বন্ধু-বান্ধব যারা আমার সাথে এসেছিলো তারা আমার সাথেই রয়ে গেলো। আমার এখানে আসার চল্লিশ দিনের দিন এক সংবাদদাতা (কাছেদ) এসে সংবাদ দিল, "আপনার চলে আসার বিশদিন পরেই হুজুর পরলোক গমন করেছেন।" এ সংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলাম এবং ঐ অবস্থায়ই আমি জায়নামাজে শোয়ে পড়লাম। দেখলাম হযরত খাঁজা বুজুর্গ আরশের নীচে প্রেমময় ভঙ্গীতে পায়চারী করছেন। আমি কদমবুসি করলাম এবং 'হাল' (অবস্থা) জিজ্ঞেস করলাম। হুজুর উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমার ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর করুণা ও করম দ্বারা দান করেছেন তার নৈকট্য, মহান ফেরেস্তাদের সঙ্গ এবং আরশের বাসীন্দাদের। এখন আমি এখানেই থাকি।

উপরোক্ত ১২ মজলিসের যাবতীয় আলোচনা ও সলুকদের উপকারিতার যা কিছু এতে বর্ণনা করা হয়েছে এর সব কিছুই হযরত খাঁজা গরীব-নৈ-নওয়াজ শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী রহমতুল্লাহ, আলায়হে জবান মোবারক হতে নিঃসৃত অমিয়বাণী।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

দোয়া—

ইয়া এলাহি, তোমার হাবীব হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উছিলায়, তোমার বন্ধু খাঁজা গরীব নওয়াজের উছিলায়, সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের উছিলায়, শহীদানে কারবালার উছিলায়, তোমার সঠিক পথ ও নৈকট্য প্রদান কর, এ পুস্তক পাঠকারীকে এবং অনুবাদককে। আমিন—

ফাওয়ায়েদুস্ সালেকীন

হযরত খাজা

শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর

রহমতুল্লাহে আলায়হে

অনুবাদক

কফিলউদ্দিন আহমেদ চিশ্‌তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত খাজা

কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত কুতুবুল আকতাব সায়্যেদেনা খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী আউশী কুদ্দেছ সেররুহুল আজিজ হযরত সায়্যেদেনা হুসাইন রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু-এর বংশধর। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ—

১। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ কামাল উদ্দিন (রহঃ)

২। তাঁর পিতা, সৈয়দ মুহম্মদ (রহঃ)

৩। তাঁর পিতা, সৈয়দ ইসহাক (রহঃ)

৪। তাঁর পিতা, সৈয়দ মারুফ (রহঃ)

৫। তাঁর পিতা, সৈয়দ আহ্‌মদ (রহঃ)

৬। তাঁর পিতা, সৈয়দ রেজাউদ্দিন (রহঃ)

৭। তাঁর পিতা, সৈয়দ হিসামউদ্দিন (রহঃ)

৮। তাঁর পিতা, সৈয়দ রশিদউদ্দিন (রহঃ)

৯। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ মুহম্মদ যুয়াদ (রহঃ)

১০। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ আলী মুসা (রহঃ)

১১। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ মুসা কাজেম (রহঃ)

১২। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ জা'ফর সাদিক (রহঃ)

১৩। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ মুহম্মদ বাকের (রহঃ)

১৪। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (রাদি)

১৫। তাঁর পিতা, ইমাম সৈয়দ হুসাইন (আঃ)

১৬। তাঁর পিতা, আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী (কঃ)

হযরত খাজা ওরাউল নহ্‌যর-এর অন্তর্গত আউশ নামক এক প্রখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আউলিয়াদের মাঝে জন্মগত ওলী হিসেবে পরিচিত। হযরত

আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর মতো তিনিও মায়ের উদর হতে ১৫ পারা পাক কালাম (কোরান শরীফ) মুখস্ত করে ভূমিষ্ঠ হন। হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলামের মাতাও গওস পাকের মাতার ন্যায় ১৫ পারা কোরান শরীফ মুখস্ত পড়তে পারতেন, অবশ্য গাওস পাকের আম্মা ছিলেন ১৮ পারার হাফেজ। হযরত খাঁজা কুতুবের আম্মা তাঁকে গর্ভে ধারণ করার পর নিয়মিত ঐ মুখস্তকৃত কোরান শরীফ তেলাওয়াত (পাঠ) করতেন এবং হযরত খাঁজা তাঁর আম্মার জবান মোবারক হতে শোনে শোনে তা মুখস্ত করেছিলেন। (সোবহানাল্লাহ্)

শুক্রবার মধ্যরাত্রির পর তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ভূমিষ্ঠের পূর্বে তাঁর আম্মা ঘুমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ ঘর আলোকিত হয়ে যাওয়ায় তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। এ অলৌকিক দৃশ্য অবলোকনে তার মা আশ্চর্য ও ভীত হয়ে পড়লেন। এ ঐশী নূরের উৎস কোথায় তিনি তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে আল্লাহতায়ালার দরবারে হাত তুললেন, "হে এলাহি, এ নূরের কারণ সম্বন্ধে আমায় অবহিত করালে আমি তৃপ্তি পেতাম।" সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ হলো, এ নূর কুতুব উদ্দিনের, যে তোমার গর্ভে অবস্থান করছে।" এর কিছুক্ষণ পরেই খাঁজা কুতুব ভূমিষ্ঠ হলেন এবং ঘরের সমস্ত নূরে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলো এবং ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি সেজদাবনত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পর হতেই তিনি কুতুবউদ্দিন (দ্বীনের ধ্রুবতারা) নামে পরিচিত। অর্থাৎ জন্মগত ভাবেই তিনি 'ওলী' বা আল্লাহর বন্ধু ছিলেন এবং এ জন্যই তাঁকে 'মাদারজাত' ওলী বলা হয়।

হযরত খাঁজা কুতুবের মাননীয়া আম্মা বলেন, "বুজুর্গীর প্রভাব জন্মলগ্ন হতেই তার মাঝে শুরু হয়েছে। ভূমিষ্ঠকালীন অলৌকিক ঘটনা সমূহই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ছাড়াও রয়েছে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যেমন : আমি যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠতাম, তখন শিশু কুতুবও জাগ্রত হতো এবং এক ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় 'আল্লাহু আল্লাহু' জেকের করতো ; যার আওয়াজ আমার কানে স্পষ্ট ভেসে আসতো।" যখন তার বয়স ৩০ মাস তখন পিতার ছায়া তার মাথা হতে বিদায় নিলো। স্বভাবতই লালন পালনের ভার তাঁর মায়ের উপর ন্যস্ত হলো। যখন তাঁর বয়স ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিনে পদার্পণ করলো তখন খাঁজা খিজির (আঃ) দর্শন দিয়ে তাঁর মায়ের নিকট হতে তাঁকে নিয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত আবা হফস-এর নিকট সমর্পণ করলেন, যিনি ঐ সময় জমানার কুতুব ছিলেন। হযরত খাঁজা খিজির (আঃ) বললেন, "মওলানা এ ছেলে থেকে আমাকে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে, আপনি একে পবিত্র শিক্ষা দান করুন। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তিনি মওলানা খাঁজা হফ্‌স,

এর নিকট এবং পরে মাননীয় কাজী হামিদ উদ্দিনর নাগোরীর নিকট পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি আল্লাহর পথের জ্ঞানার্জনের জন্য প্রকৃত মানুষের সন্ধানে বের হলেন।

৬১২ হিজরীর ৫ই রবিউল আউয়াল, বৃহস্পতিবার বাগদাদ শরীফে ইমাম আবু লায়স সমরকন্দী (রহঃ) মসজিদে হযরত খাঁজা গরীব নওয়াজের হাতে বয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। বর্ণিত আছে যে তিনি বহু দিন পর্যন্ত খাঁজা গরীব নওয়াজ-এর সাথে থেকে রিয়াজাত (উপাসনা) শাকা ও মোজাহেদার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দুনিয়াদারীর সমস্ত কিছু হতে বিমুক্ত ছিলেন এবং খাঁজা গরীব নওয়াজের সোহবতের (সঙ্গলাভের) আশির্বাদ লাভ করেন। যখন হযরত খাঁজা বুজুর্গ (রহঃ) নবী করিম (সাঃ)-এর নির্দেশে বাগদাদ শরীফ হতে আজমীর শরীফ অভিমুখে রওনা হলেন তখন খাঁজা কুতুব (রহঃ) স্বীয় কামেল মুর্শেদের প্রেমের আকর্ষণে সঙ্গী হয়ে দিল্লী পৌঁছলেন। খাঁজা বজুর্গ (গরীব নওয়াজ) কিছুদিন দিল্লী অবস্থানের পর যখন আজমীর অভিমুখে রওয়ানা হন তখন খাঁজা কুতুবকে দিল্লীতে রেখে গেলেন। কিন্তু খাঁজা কুতুব প্রজ্বলিত প্রেমাকর্ষণে তাঁর সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, খাঁজা গরীব নওয়াজ বললেন রুহানী উন্নতির পরে কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার প্রয়োজন আছে; তাছাড়াও তোমার স্থান এ দিল্লীতেই নির্দ্ধারিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুর্শেদের ইচ্ছায় তিনি দিল্লীতেই অবস্থান করলেন। কিন্তু গোলামী লাভের জন্য বেশ কয়েকবার আজমীর শরীফ গমণ করে ছিলেন। হযরত খাঁজা বুজুর্গও ভক্তের প্রেমের আকর্ষণে দু'বার দিল্লী এসে ছিলেন। হযরত খাঁজা কুতুব মুর্শেদের বেসাল শরীফের (স্রষ্টার মিলনের মাধ্যমে দেহত্যাগ) সময় দিল্লীতে ছিলেন। ২০ দিন পূর্বে তরীকার শাসন ক্ষমতা (সাজ্জাদা নশীন খলিফা) লাভ করে রসুলে মকবুল (সাঃ)-এর অভিজ্ঞান ও আমানত পীরের মাধ্যমে লাভ করে সঙ্গে নিয়ে পীর ও মুর্শেদের নির্দেশানুযায়ী আজমীর শরীফ হতে দিল্লীতে ফিরে আসেন। খিলাফত প্রদান করে হযরত খাঁজা বুজুর্গ হযরত খাঁজা কুতুবকে বললেন, ''হে কুতুব তুমি বড় পবিত্র ও সৌভাগ্যবান'' অবশ্য কথাটা এ জন্য বলছি যে আজ ৪০ দিন হতে ক্রমান্বয়ে হযরত রসুলে খোদা (সাঃ) স্বপ্নে আমাকে এরশাদ করতেন যে, ''কুতুবউদ্দিন আমার এবং আল্লাহতায়ালার উভয়েরই বন্ধু, তাকে তোমার খিলাফত দান কর এবং আমার খিরকা যা তোমার কাছে মওজুদ আছে তাকে পরাও। অদ্য রাতে আমি আল্লাহতায়ালাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনিও আমাকে নির্দেশ দিলেন, কুতুবউদ্দিন আমার বন্ধু, যে নিয়ামত তোমার কাছে রয়েছে তাকে তা দান করে তোমার পরবর্তী খলিফা মনোনীত করো।

হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহঃ)-এর বিভিন্ন অবস্থা, কাশফ ও কারামতের অনেক ঘটনা তাঁর জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সাগরের বর্ণনার অবকাশ কোথায়? তার সামান্য বর্ণনা করলেও একটা পূর্ণ কিতাবের প্রয়োজন।

হযরতের বেছাল শরীফ সামার হালতে (সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়ায়) ঘটেছিলো, যার জন্য তাঁকে শহীদুল মহব্বত বলা হয়। এ ঘটনাটি "কুতুবে দেও'র" কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে খানকায়ে আলীয়ায় হযরত রসূলে মকবুল (দঃ)-এর প্রেমের শানে (মর্যাদায়) সামা (বিশুদ্ধ গান) হচ্ছিলো। হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ সূফি ও আরিফগণ ঐ সামার মজলিসে সামা শ্রবণ করতে করতে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। কাওয়ালগণ গাইতে ছিলেন।

আশেকে কইয়ত কোজা বিনাদ বকাস
বস্তায়ে মুইয়ত নাম্বি ইয়াবদ খালাস ॥
অর্থ—প্রেমিক তোমাকে ছাড়া কিছুই দেখে না
তোমার দর্শনেই মুক্তি পায় ॥

এই পংক্তি দু'টো গীত হওয়ার পর হযরত খাজা কুতুবের ক্রন্দন শুরু হলো এবং প্রেমোন্মত্ততা এতো বাড়লো যে আয়ত্বের সীমা অতিক্রম করে চলে গেলো। অবস্থা সংগীন পরিদৃষ্ট হওয়ায় কাওয়ালগণ ঐ গান ছেড়ে এ গজল (গান) গাওয়া শুরু করলো।

মনজিলে ইশ্‌কাত মাকানে দিগারাস্ত,
মরদে'ইঁ রাহ রানে নিশানে দিগারাস্ত
কুশতাগানে খঞ্জরে তসলিমে রা,
হর জমাঁ আয গায়েবে জানে দিগারাস্ত।

অর্থ—প্রেমিকের গন্তব্যস্থল পৃথক
এ পথের পথিকদের চিহ্নই পৃথক
আনুগত্যের তরবারিতে যে কর্তিত হয়েছে
প্রতি মুহূর্তেই তারা অদৃশ্যলোক হতে নবজীবন লাভ করে।

এ গজল গীত হওয়ায় হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ)-এর 'ওজদ' (আত্মিক উম্মাদনা) পূর্বের অবস্থাকে অতিক্রম করে চলে গেলো। বাহ্যিক অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে 'মাছকে পানি হতে তুললে যেরূপ হয়, ঠিক তদ্রূপ।' তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত এ অবস্থার মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। নামাজের সময় হলে জ্ঞান ফিরে পেতেন এবং নামাজ শেষে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা

এমন দাঁড়ালো যে, ৬৭৩ হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়াল দিল্লীতে মহামহিমের সাথে মহামিলন (বেছাল-মোবারক) ঘটলো। অর্থাৎ ইহলোক ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের জাতের নৈকট্য লাভ করেন।

তিনি কত বছর হায়াত (আয়ু) পেয়েছিলেন তাঁর সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না বললেই চলে। হযরত দারাশিকো (রহঃ) তার "শফিনাতুল আউলিয়া" কিতাবে লিখেছেন হযরত খাজা কুতুবুল ইসলাম যখন মু'রীদ হন তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৬ বছর এবং "রওজা" কিতাবে সাহেবজাদা মোঃ বোলাক লিখেছেন বয়েত গ্রহণের ২০ বৎসর পরে তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন। দেহত্যাগের সময়ে তাঁর বয়স কত ছিলো, তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় গরীব নওয়াজের ২০ বৎসর পর তিনি দেহত্যাগ করেন অর্থাৎ খেলাফত প্রাপ্তির ২০ বৎসর পর তিনি দেহত্যাগ করেন তাহলে ১৬ বৎসর বয়সে যদি তিনি বয়েত গ্রহণ করে থাকেন এবং ২০ বৎসর পর যদি খেলাফত প্রাপ্তি হয়ে থাকে এবং এর ২০ বৎসর পর যদি দেহত্যাগ করে থাকেন তাহলে পরিস্কার বুঝা যায় তার বয়স ছিলো তখন ৫৬ বৎসর।

—০—

সূচনা

প্রথম মজলিস

প্রেমের জলজ্যান্ত নিদর্শন হযরত খাঁজা শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর আজুধনী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ অধম-বান্দার যখন হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দীন (রহঃ)-এর কদমবুচির সৌভাগ্য অর্জন হলো তখন তিনি কুল্লাহ চাহার তর্কী আমার মাথার উপর রাখলেন এবং অত্যন্ত দয়া দান করলেন। সেদিন আমি, কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী, মওলানা আলাউদ্দিন কিরমানী, সৈয়দ নুরউদ্দিন মোবারক, শায়খ নিজাম উদ্দিন আবুল মুয়িদ, মওলানা শামসউদ্দিন তুর্ক, শায়খ মাহমুদ মোয়াযনা এবং আরও অনেক আসহাবে আহলে সোফ্‌ফা খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। খাঁজা কুতুবউদ্দীন (রহঃ) এরশাদ করলেন, পীর বা মুর্শেদকে এমন শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হতে হয়, যখন কোন শিক্ষার্থী বয়াত গ্রহণ বা মুরীদ হওয়ার জন্য তার নিকট আসে, তখন তার জন্য ওয়াজেব হয়ে যায় যে—সে একটি মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে জমাকৃত দুনিয়া প্রেম, লোভ লালসা, ঘৃণা-অহংকার সব এমনভাবে বিদূরিত করবে যার কণামাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর তাকে বয়াত করে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকারী হিসেবে মনোনীত করবে। যদি পীরের মাঝে এ রকম ক্ষমতা না থাকে তা হলে অবশ্যই বুঝবে যে পীর এবং মুরিদ উভয়েই পথভ্রষ্ট।

এরপর বললেন "এসরারুল আরেফীন" কিতাবে খাঁজা আবুবকর শিবলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন বদখ্‌শান দেশে এক বুজুর্গের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো যার প্রশংসা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। তিনি অত্যন্ত প্রেমোন্মাদ প্রেমিক ও প্রচেষ্টার উৎকর্ষতায় নজীরবিহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং সমস্ত কিছুই সুন্নতের বিধান অনুযায়ী করতেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, বসো। আমি তাঁর নির্দেশানুযায়ী বসে পড়লাম এবং কয়েকদিন তার সোহবতে (সঙ্গে) কাটালাম। তিনি সব সময় রোজাব্রত পালন করতেন। ইফতারের সময় অদৃশ্যলোক হতে দু'টো রুটী আসতো, তিনি সেই রুটী দ্বারা ইফতার করতেন এবং পাথর নিঃসৃত

পানি পান করতেন। শহরবাসী তাঁর শিফার্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দরজায় ভীড় জমাতো। এ অবস্থায় তিনি সেখানকার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিলেন একটা খানকা তৈরী করতে। বাদশাহ তাঁর আদেশকে নিজের সৌভাগ্য মনে করে খানকা তৈরী আরম্ভ করলেন। খানকা তৈরী হওয়ার পর তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। হযরত খানকায় তাঁর বাসস্থান স্থানান্তর করলেন এবং হুকুম দিলেন প্রত্যেকদিন বাজার হতে একটা করে কুকুর ক্রয় করে নিয়ে আসতে। হুকুম অনুযায়ী প্রত্যেকদিন বাজার হতে কুকুর ক্রয় করে আনা হলে তিনি সেই কুকুরের হাত (সামনের পা) ধরে সেজদায় বসাতেন এবং বলতেন আল্লাহর নিকট অর্পণ করলাম। পরিশেষে ঐ কুকুরগুলো এমন হয়ে গেলো যে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে পানির উপর দিয়ে চলতে পারতো এবং যদি কাউকে কামড় দিতো সে ভালো হয়ে যেতো। খাজা আবুবকর শিবলী (রহঃ) বলেছেন যে, আমি ঐ সব কুকুরের কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা) দেখে আশ্চর্য ও বিস্মিত হয়ে পড়লাম। ঐ বুযুর্গ আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন। "হে শিবলী সেজদার উপর এরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজদার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, যাকে 'সাহেবে সেজদা' বলা হয়, তিনি কারও হাত ধরলে সেও সাহেবে সেজদা হয়ে এমন ক্ষমতাবান হয় যে, যদি সেও কারও হাত ধরে তাহলে সেও তাকে সাহেবে সেজদাতে পরিণত করে দেয়। যদি এমন ক্ষমতা তাঁর না থাকে তাহলে 'সলুকে'র পথে তার দাবী খাদপূর্ণ বা ভেজালযুক্ত। এরপর এরশাদ করলেন, কামালিয়াত চার জিনিসে সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অল্প শয়ন করা, দ্বিতীয়তঃ কম কথা বলা, তৃতীয়তঃ সামান্য আহার করা, চতুর্থতঃ মানুষের সঙ্গে কম সম্পর্ক রাখা। এরপর এরশাদ করলেন, গজনী'তে এক বুযুর্গ ছিলেন যিনি চিরকুমার ব্রত পালন করে একাকী আল্লাহর ধ্যানে অত্যন্ত বিভোর থাকতেন। যা কিছু তাঁর কাছে ফতুহাত-এর মাধ্যমে আসতো, কিছুই নিজের কাছে রাখতেন না। দিনের মধ্যে যা কিছু পেতেন সন্ধ্যার মধ্যে তা বিলিয়ে দিতেন এবং রাত্রে যা পেতেন তা সকাল পর্যন্ত রাখতেন না- বিলিয়ে দিতেন। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র বা দরবেশ যে কেউ তাঁর খানকাহ (ফকির দরবেশদের আশ্রম) হতে খালি যেতো না। ক্ষুধার্থকে আহার দিতেন, ভিক্ষুককে বস্ত্র দিতেন, অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে আল্লাহ তায়ালার আশীর্বাদ পুষ্ট (সাহেবে নি'মত) দরবেশ ছিলেন। আমি তাঁর মুখে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, "আমি ৪০ বৎসর মোজাহেদা করেছি, কিন্তু হাছেল হয়নি, সামান্য পরিমাণ আলোও নিজের জাতে (অস্তিত্ব)-এর মাঝে অনুভব করিনি। যখন থেকে (উপরে বর্ণিত) এ চার জিনিস গ্রহণ করেছি তখন হতে এমন আলো পয়দা হয়েছে যে ই তুলে উপরে তাকালে আরশ এবং হিজাবে

আজমত পর্যন্ত কোন জিনিসই দৃষ্টির বাইরে গোপন থাকে না এবং যখন মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন মাটির তলার মৃত্তিকার শেষ স্তরের জিনিস পর্যন্তও দেখতে পাই। এ অবস্থা আমার ৩০ বছর যাবৎ,—যার জন্য চোখ বন্ধ করে রাখি। এরপর আমার প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, "হে দরবেশ, যে পর্যন্ত কম আহার করা, কম শোয়া, কম কথা এবং মানুষের সঙ্গ-করা না কমাবে সে পর্যন্ত দরবেশীর মহাত্ম লাভ হবে না। তরাই দরবেশের দলভুক্ত, যারা শয়ন করাকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং সৃষ্টি বা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাকে বিষধর সর্পের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করেছে। যে দরবেশ দুনিয়াকে দেখবার জন্য উত্তম পোষাক পরিধান করে, মনে করবে সে দরবেশ নয়, সলুকের পথের ডাকাত, সে মানুষের ঈমান হরণ করে। অর্থাৎ তাকে দেখে মানুষ সঠিক দরবেশ ভেবে নিজের ঈমান নষ্ট করে। যে দরবেশ নফসের ইচ্ছায় পেট ভরে আহার করে সে দরবেশ নয় নফসের গোলাম। এরপর এরশাদ করলেন, নদীপথে ভ্রমণের সময় এক দরবেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার এক অনন্ত দান। সাধনার কাঠিন্যে তার অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, দেহে শুধু হাড় ক'খানাই অবশিষ্ট ছিলো। তাঁর নিয়ম ছিলো, চাশতের নামাজ সমাধা করে লঙ্গর খানায় চলে যেতেন, প্রতিদিন হাজারমণ গমের লঙ্গর হতো, পরবর্তী নামাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত লঙ্গর বন্টনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। হাজার হাজার লোক যারা আসতো তাদেরকে আহার করাতেন এবং বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত লঙ্গর থাকতো বন্টন করতেন। লঙ্গর শেষ হয়ে গেলে জায়নামাজে যেয়ে বসতেন এবং প্রত্যেক দর্শনপ্রার্থীকে জায়নামাজের তলা হতে যা তাঁর ভাগ্যে থাকতো বের করে দান করতেন। আমি কয়েক দিন তাঁর সোহবতে ছিলাম, তিনি সব সময় রোজা ব্রত পালন করতেন। ইফতারের সময় তাঁর নিকট আলমে গায়েব (অদৃশ্যলোক) হতে ৪টি খোড়মা আসতো, দু'টো আমাকে দিতেন, দু'টো তিনি নিজে খেতেন। আমাকে বলতেন যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া, দুনিয়ার মানুষ ও জিনিসের বন্ধুত্ব হতে মুক্ত না হবে, অল্প আহার না করবে, এবং অল্প শয়ন না করবে, ততদিন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ স্তর বা সোপান (দর্জা-Stage) লাভ করতে পারবেনা। এরপর হযরত কুতুবউদ্দিন (রহঃ) এরশাদ করলেন, হযরত মূসা (আঃ) উপাসনা, একাগ্রতা ও নির্জনবাসে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিলেন। যখন তাঁকে আসমান নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আওয়াজ এলো "একে পৃথক রাখ, কারণ এর সঙ্গে দুনিয়ার আবর্জনা রয়েছে।" হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এবং

পার্থিব বস্তুর জিনিস নিজের কাপড়ে দেখতে পেলেন, একটা সুই ও কাসাচুরি (এক ধরনের পাত্র) তার সাথে রয়েছে। তিনি নিবেদন করলেন, "ইয়া বারে এলাহি, এগুলো কি করবো?" ওহি এলো, "ফেলে দাও।" হে দরবেশ, যখন এ সামান্য ও নগন্য জিনিসের জন্য একজন পয়গম্বর (আঃ) বাধা পেলেন, তাহলে যারা পার্থিব বস্তুর নিকট নিজেকে উৎসর্গ করেছে তাদের উপায় কি হবে? এরপর এরশাদ করলেন, দরবেশদেরকে একা থাকা উচিত কেননা, তাতে তাদের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। এরপর আরও একজন দরবেশের কথা বললেন, তিনি বড় বুজুর্গ ছিলেন, তাঁর নিকট প্রতি দিন একটা করে রহস্য প্রকাশ পেতো। এমনি করে প্রতি দিন ভিন্ন ভিন্ন রহস্য প্রকাশ পাওয়াতে এক সময় আল্লাহ্‌র অগনিত রহস্যের দ্বার তাঁর নিকট উম্মুক্ত হয়ে গেলো। পরে খাঁজা কুতুব হায়! হায়! করে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন আমি ঐ বুজুর্গের মুখেই নিম্নোক্ত কথাই শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম।

মসনবী: হর আঁ মুলকে কে মিগুজারম
দু সদ মুলকে দিগর দর পেশ দারম॥
অর্থ: প্রত্যেকবার একটি দেশ ভ্রমণ করে আসি
আমার সম্মুখে দু'শ দেশ উপস্থিত হয়॥

এরপর এরশাদ করলেন, আহলে সলুক এবং মুতহ্‌ইয়রান (ঐশী রহস্যালোকে বিচরণে বিস্ময়াভিভূত ব্যক্তি) বলেন তারাই দরবেশ, যারা সব সময় ভ্রমণে বিভিন্ন দেশ অতিক্রম করেছে এবং সম্মুখে যে দেশ ভ্রমণের প্রস্তুতি নেয় সে দেশের কোন্ মহামূল্য রত্নটি (বুজর্গানে দীন) কোথায় কি ভাবে অবস্থান করছে তা অবগত থাকে। কিন্তু সে জগতের সংবাদ হতে যে অজ্ঞ সে অবশ্যই দরবেশ নয়। এরপর এরশাদ করলেন, কিছু সংখ্যক ওলীআল্লাহ্, যারা আল্লাহর গোপন রহস্য প্রকাশ করেছে তা তাদের অত্যাধিক প্রেমে ও অজ্ঞানতার মাধ্যমে ঘটেছে। অনেকে আবার প্রেমের উম্মত্ততায় কোন গোপন রহস্য 'ফাশ' (ব্যক্ত) করে ফেলেছে। কিন্তু যারা পরিপূর্ণতার স্তরে অবস্থান করছেন তাদের নিকট হতে কোন গোপন রহস্য ফাশ হয় না। সুতরাং বন্ধুত্ব অর্জনের পথে উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে রহস্য গ্রহণ করতে থাকবে কিন্তু প্রকাশ হতে দিবে না। কেননা, রহস্য হলো বন্ধুর গোপন ভেদ, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে সে কখনও বন্ধুর গোপন রহস্য প্রকাশ করে না। এরপর এরশাদ করলেন আমি বহুদিন পর্যন্ত আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাঁজা মুঈন উদ্দিন হাসান চিশতী (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তেও

কোন দিন তাঁকে বন্ধুর কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করতে দেখিনি। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফরীদ পরিপূর্ণ কামেল এমনি হয় যে, তাঁর নিকট হতে কোন অবস্থাতেই বন্ধুর কোন ভেদ প্রকাশ তো হয়ই না বরং নতুন রহস্যের দ্বার উদঘাটন করে নিজের মাঝে গোপন রাখে। এরপর এরশাদ করলেন, "হে ফরীদ, যদি মনসুর কামেল হতো তাহলে অবশ্যই বন্ধুর রহস্য প্রকাশ করতেন না।" সুতরাং মনসুর কামেল ছিলো না বরং এক ফোটাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো এবং বন্ধুর রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছে। প্রতি ফল তার এই হয়েছে যে অবশেষে তাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে। [খাঁজা গরীব নওয়াজের মনসুর সম্বন্ধে উক্তিটি নিম্নরূপ: মনসুর যে প্রেম-সমুদ্রের এক কাতরা (ফোঁটা) পানি পান করে নিজেকে আনাল হক (আমি খোদা) বলেছিলো, তেমনি হাজারো সমুদ্র আমার মাঝে প্রতিনিয়ত বয়ে যাচ্ছে কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছে না। (এই অংশটুকু খাঁজা গরীব নওয়াজের জীবনী হতে সংগৃহীত)] এরপর এরশাদ করলেন, হযরত জোনায়েদ বোগদাদী যখন প্রেমসুধা পান করে শান্তির জগতে অবস্থান করতেন, তখন বলতেন, "হাজারো আফসোস ঐ প্রেমিকদের জন্য যারা (মুখে) বন্ধুত্বের দাবী করে অথচ বন্ধুর নিকট হতে কোন রহস্য উন্মোচিত হলে সাথে সাথে তা প্রকাশ করে দেয়।" এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি এক বুযুর্গ দীর্ঘকাল যাবত এবাদত করেছেন এবং অনেক মুজাহিদা (সাধনা) করেছেন। এবাদত ও রিয়াজতের মাধ্যমে তার নিকট একটি রহস্য উদ্ঘাটন হয়, কিন্তু আফসোস তার ধারণ ক্ষমতা প্রশস্ত ছিলো না, যার ফলে সে ঐ রহস্যকে নিরাপদে রাখতে পারেনি বরং সাথে সাথে সেই প্রেমের রহস্যকে প্রকাশ করে দেয় এবং প্রকাশ মাত্রই তার নিকট হতে সমস্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়। সে এই নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার দুঃখে সে পাগল হয়ে গেলো, তখন গায়েবী আওয়াজ হলো 'হে বান্দা, যদি তুমি এ রহস্যকে প্রকাশ না করতে তাহলে দ্বিতীয় রহস্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে। কিন্তু তোমার মাঝে সে যোগ্যতা ছিলো না, যার জন্য তোমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেয়া হয়েছে।" এরপর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম 'ফতেহ' (দয়া)-এর ব্যাখ্যায় বললেন, "হে ফরীদ, সলুকের পথে এমন এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যারা হাজার হাজার রহস্য-নদীর পানি পান করে শান্ত হয়ে বসে আছে। এরপর এরশাদ করলেন এক বুযুর্গ-অন্য এক বুযুর্গকে চিঠি লিখেছেন, আপনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেন, "যে এক কাতরা প্রেমের ঝলকে ঝলসে উঠে? দ্বিতীয় বুযুর্গ উত্তরে লিখেছিলেন, দুঃখ হয়

তার কম সাহস ও অপ্রসস্ত উৎসাহের জন্য। আসলে লোক এরূপ হওয়া দরকার, যেনো হাজার-হাজার এলাহীর মারেফাতের দরিয়ার পানি পান করেও হজম করে ফেলে এবং আরও বৃদ্ধির জন্য দোয়া প্রার্থনা করে। আমার এমনই ঘটেছে যে, পঞ্চাশ বছর যাবৎ উপরোক্ত অবস্থায় অবস্থান করছি এবং আরও বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমি তোমাকে নিষেধ করছি, কোন অশুভ চক্রান্তের শিকার হয়ো না। যে বন্ধুর রহস্য প্রকাশ করে দেয় সে দুর্ভাগা। এরপর এরশাদ করলেন, যে পর্যন্ত দরবেশ সব এগানা (আত্মীয়) হতে বেগানা (অনাত্মীয়) না হয় এবং কঠিন সাধনায় লিপ্ত না থাকে তাহলে দুনিয়ার অপবিত্রতার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যায়। কখনও নৈকট্যের স্তর বা মোকাম হাসেল হয় না। এরপর এরশাদ করলেন, ৭ বছর এবাদত বন্দেগীর পর যখন হযরত খাঁজা বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)-কে নৈকট্যের স্তরে নিয়ে যাওয়া হলো, নির্দেশ এলো, "একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, সে দুনিয়ার আবর্জনা সঙ্গে এনেছে।" তখন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটি মাটির পেয়ালা ও একটুকরা চামড়া তাঁর খিরকার মধ্যে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি এগুলো ফেলে দিলেন। তারপর তিনি নৈকট্যের স্তরে স্থান পেলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন "হে ভাইগণ লক্ষ্য করুন যে বায়েজীদের মতো বুজুর্গের যদি এমন তুচ্ছ জিনিসের জন্য জবাবদিহি হতে হয় এবং নৈকট্যের স্তরে স্থান পেতে বাধা প্রাপ্ত হতে হয়, তাহলে যারা দুনিয়ার অসংখ্য আবর্জনার মাঝে গ্রেফতার হয়ে আছে তারা কি করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে। সলুকের পথ এক জিনিস আর দুনিয়াদারী আর এক জিনিস, এ দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন, একে অপরের শত্রু, তাই এ দু' বস্তুকে একত্র করা যায় না। এরপর এরশাদ করলেন, দরবেশ যখন কামেল হয়ে যায় তখন যা কিছু আদেশ করে তাই হয়ে যায়, এর সামান্যতম ব্যতিক্রমও ঘটেনা। এরপর এরশাদ করলেন আমি এবং কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী, যিনি আমার প্রকৃত বন্ধু, নদী পথে ভ্রমণ করছিলাম, সেখানে কুদরতে এলাহীর এক অত্যাশ্চার্য জিনিস অবলোকন করলাম, যা বর্ণনা করা কঠিন। নদীর নিকটবর্তী একটা বাড়ী ছিলো, আমি এবং কাজী হামিদউদ্দিন দু'জনে এক সঙ্গে সেখানে বসে ছিলাম। একটু গরম অনুভব হলো, হঠাৎ একটা ছাগল দু'টো রুটী মুখে করে এনে আমাদের সম্মুখে রেখে চলে গেলো। আমরা দু'জনে খেলাম এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম, এটা প্রকৃত ছাগল ছিলো না, ফেরেস্তাদের মধ্য হতে কেউ ছিলো। কথার মাঝখানে একটা বৃহৎ আকারের বিচ্ছু নজরে পড়লো, সে

নদীর দিকে যাচ্ছিলো। নদীর তীরে পৌঁছে নিজের শরীর পানিতে নিক্ষেপ করে সাঁতরিয়ে ওপারে চললো। আমরা এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম, কাজী সাহেবকে বললাম নিশ্চয়ই এর মধ্যে এলাহির রহস্য লুকায়িত রয়েছে। ব্যাপারটা দেখার জন্য উঠে পরলাম এবং নদীর দিকে চলতে লাগলাম। নদীর কিনারায় পৌঁছে দেখি, নদীতে অত্যধিক স্রোত কিন্তু পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা বা অন্য কোন প্রকার জিনিস নেই, যার মাধ্যমে ওপারে যেতে পারি। আমরা অসহায় ছিলাম, তাই এলাহীর দরবারে দোয়া করলাম, 'হে খোদা যদি আমরা আপন কর্মে কামেল হয়ে থাকি তা হলে নদীর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য রাস্তা দাও। হঠাৎ নদীর মাঝখানে পানির মধ্যে ফাটল ধরলো এবং পথ তৈরী হয়ে গেলো। আমরা সেই পথ দিয়ে নদী অতিক্রম করলাম। বিচ্ছু আমাদের আগে আগে চলতে ছিলো এবং একটা গাছের নীচে যেয়ে থামলো। সেখানে একজন লোক শোয়ে ছিলো এবং একটা বৃহৎ অজগর লোকটিকে দংশন করার জন্য গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। বিচ্ছু সাপটার কাছে পৌঁছেই তাকে ছোবল মারলো। দংশনের সাথে সাথে সাপটা মারা গেলো এবং বিচ্ছুও অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমরা দু'জন সাপটার কাছে যেয়ে দেখলাম এবং অনুমান করলাম সাপটার ওজন প্রায় হাজারমন হবে। আমরা লোকটার জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম,—ইচ্ছা আলাপ করবো। তার উঠতে দেরী দেখে আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। দেখে মনে হলো লোকটা মদখোর, মদ্যপানের জন্য বমি করে বেহুশ হয়ে পড়েছিলো। আমাদের দুঃখ হলো অযথা কষ্ট করলাম এবং আশ্চর্য হলাম এই ভেবে, এমন নাফরমান লোকের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এমন করুণা করলেন যে, তাকে এতো বড় বিপদ হতে রক্ষা করলেন? এ চিন্তা যখন মনের মধ্যে ঘোর পাক খাচ্ছিলো তখন গায়েবী আওয়াজ হলো, "আমি প্রতিপালক হয়ে যদি শুধু ভালোর প্রতি মনোযোগ দেই তাহলে গরীবের বন্ধু কে হবে?" আমরা যখন এই কথা শোনার জন্য নিবিষ্ট ছিলাম তখন লোকটি জাগ্রত হলো। নিজের কাছাকাছি মৃত অজগরকে দেখে সে অত্যন্ত ভীত ও অবাক হয়ে গেলো। আমরা তাকে সাপ ও বিচ্ছুর সকল কাহিনী বর্ণনা করে শোনালাম। সে স্বীয় কর্মের জন্য অত্যান্তদুঃখিত হলো এবং সাথে সাথে তওবা করলো। আমরা চলে এলাম এবং অনতিকাল পরেই শোনতে পেলাম যে উক্ত লোকটি বেশ উঁচু দরের বুজুর্গ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বে স্থান পেয়েছে। খালি পায়ে হেটে সে ৭ বার হজ্বব্রত পালন করেছে। এরপর এরশাদ করলেন, যখন ভালো হওয়ার সময় হয় তখন আল্লাহ্‌র দানও সঙ্গলাভ করে।

বাতাসের সাথেও তখন প্রেমের পরশ চলতে থাকে। তিনি মহা ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে অগ্নিপূজারী, মদ্যপায়ী বা যাকে খুশী তাকে এক মূহুর্তে সেজদাকারীদের দলে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। আবার যখন দূর্ভাগ্য সঙ্গে অবস্থান করে তখন সুগন্ধযুক্ত মৃদু হাওয়াও প্রচুর শাস্তি বহন করে চলতে থাকে, হাজারো সেজদাকারী নষ্ট হয়ে যায়। হে ভাতৃবৃন্দ, স্মরণ রেখো আল্লাহতায়ালার নিকট কখনও নির্ভীক হতে নেই। কেননা, পরিণাম বা ভবিষ্যৎ কারো জানা নেই এবং কেউ জানতেও পারে না। এরপর এরশাদ করলেন, ইবলীস যদি তার কর্মের পরিণাম জানতো তা হলে নিঃসন্দেহে সে আদম (আঃ)-কে সেজদা করতো। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে তার পরিণাম জানা ছিল না। সে তার নিজের সাধনার কথা চিন্তা করে অহংকারী হয়েছিলো, তাই মাটিকে (আদমকে) সেজদা করা সম্মানের হানি বলে বিবেচনা করেছে এবং সেজদা না করার জন্য অর্থাৎ হুকুম পালন না করার জন্য তার সমস্ত সাধনা তার দিকে ছোড়ে মারা হয়েছে। যার ফলে আল্লাহতায়ালার দরবারে সে অভিশপ্ত হয়েছে। এরপর এরশাদ করলেন, আমি কোন এক শহরে দেখে-ছিলাম যে কোথাও দশজন কোথাও বিশজন লোক একত্রে দাঁড়িয়ে রহস্যলোকের রহস্যে স্তম্ভিত ও অচৈতন্য হয়ে আছে, কিন্তু নামাজের সময় হলে তাঁরা চেতনার জগতে ফিরে আসতো আবার নামাজ শেষ হলেই মত্ততার জগতে ফিরে যেতো। আমি তাঁদের খেদমতে বহুদিন ছিলাম। একদিন তাঁদের দলের কয়েকজন লোকের চেতনা ফিরে এলো। আমি তাঁদের নিকট আবেদন (আরজ) করলাম, আপনাদের এমন অবস্থা কত দিন যাবৎ? তাঁরা জানালেন, ৬০/৭০ বছর হবে, যেদিন আল্লাহ্র দরবারে ইবলিসের অভিশপ্ত হওয়ার 'কিচ্ছা' শুনেছিলাম সে দিন হতেই আমাদের এ অবস্থা। এরপর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম হায়, হায়, করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, কামেলগণ এর চেয়েও অধিক 'ফয়জ' লাভ করে থাকেন। ঐ লোক-গুলো নিজেদের 'হালে'-ই নিজেরা বিভোর রয়েছে। আমি যানি না যে আমি কোন দলের অন্তর্ভূক্ত! এরপর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম আদামাল্লাহ বাকা'হু দাঁড়িয়ে গেলেন। মজলিস সমাপ্ত হলো। হযরত খাঁজা সাধনার জগতে তন্ময় হলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

রোজ বৃহস্পতিবার, তারিখ-৪, মাস—শওয়াল, সন—৬৪৮ হিঃ। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী, মওলানা শামসুদ্দিন তুর্ক ও অনেক প্রখ্যাত সুফি খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা 'আহ্‌লে সলুক' সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম এরশাদ করলেন, সলুকের পন্থ তাকেই বলে, যে পথে দৃঢ় থাকলে সালেকের পা হতে মাথা পর্যন্ত প্রেম-দরিয়ায় নিমজ্জিত থাকে, তার নিকট এমন একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না যে, অদৃশ্য-লোক হতে ইশ্‌ক্‌ ও মহব্বত তার সত্তাকে আকর্ষিত না করে। এরপর বললেন, সদা সর্বদা হাজারো অভূতপূর্ব অবস্থা যার উপর প্রকাশ পায় সেই আরিফ। সে প্রেম-জগতের অতল তলে এমন ভাবে বিলীন হয়ে থাকে যে বিশ্বের সমস্ত কিছু তার বুকের উপর সংস্থাপন করলেও সেগুলো ফেলে দেওয়ার অনুভূতিও উপলব্ধি করবে না। এরপর এরশাদ করলেন, সমরকন্দে এক বুজুর্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো তিনি ঐশী-বিস্ময়ালোকে বিস্ময়াবিষ্ট ছিলেন। আমি সেখানকার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, উনার এ বিলীন অবস্থা কত দিন যাবৎ? তারা উত্তর দিলো, আমরা ২০ বছর যাবত উনাকে এ অবস্থায় দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন কাটালাম। একদিন তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন যাবৎ আপনি বস্তুজগতের খবর হতে মুক্ত? উত্তরে বললেন, "ওহে নাদান (নির্বোধ), দরবেশ যখন প্রেম সাগরে নিমজ্জিত থাকে তখন তাঁর উপরে হাজারো জগৎ হতে যদি হাজারো বস্তুও নিপতিত হয়, সেগুলোর সংবাদ রাখার তার অবকাশ কোথায়? এমনকি এ অবস্থায় তাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করলেও তাঁর চৈতন্যোদয় হবে না। হে দরবেশ এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে এটা ইশ্‌ক্‌-এর পথে বাজী খেলা। যে ব্যক্তি এ পথে পা রেখেছে সে নিজের জানকে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে না। এরপর এরশাদ করলেন, যখন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর গলার উপর শত্রু ছুরি বসিয়ে কাটতে আরম্ভ করলো তখন তীব্র ও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইচ্ছা করলেন যে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে, সাথে সাথে জিব্রাইল (আঃ) তাঁর কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দেশ করেছেন যদি আপনি উঃ শব্দটিও করেন তাহলে কিতাব হতে আপনার 'নবী' নাম মুছে ফেলা হবে। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) এ নির্দেশ

পাওয়ার পর তাঁরা আর কোন প্রকার শব্দই করেননি এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে 'জান', জানের মালিকের নিকট সমর্পণ করলেন। এরপর এরশাদ করলেন, অনুরূপ ভাবেই হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে চিরে ফেলার জন্য তাঁর মাথার উপর করাত সংস্থাপন করে যখন চিরে ফেলতে লাগলো, তিনিও তখন বর্ণনাতীত অসহ্য যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে চাইলেন, কিন্তু পূর্বের ঘটনার মতোই হযরত জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হয়ে আল্লাহতায়ালার ফরমান (আদেশ) শোনালেন। তিনি হুকুম অনুযায়ী ততক্ষণ পর্যন্ত নীরব রইলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত করাত তাঁর পবিত্র দেহকে দ্বিখণ্ডিত না করলো। এ ঘটনা বলার পর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ)-এর পবিত্র চোখে অশ্রু দেখা দিলো। পুনরায় বললেন, যে ব্যক্তি বন্ধু-প্রেমের দাবী করে এবং কষ্টের সময় ফরিয়াদ করে, সে প্রকৃত প্রেমিক নয় বরং মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। কেননা, বন্ধুত্ব গ্রহণ করার অর্থই হলো যে বন্ধুর নিকট হতে যা কিছুই আসবে তাকে নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং মনে করতে হবে, যে কোন উপলক্ষেই হোক আল্লাহ আমায় স্মরণ করেছেন। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ)-এর রীতি ছিলো, যেদিন তাঁর উপর কোন দুঃখ-কষ্ট নাজেল হতো সেদিন অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতেন এবং বলতেন বন্ধু আমায় স্মরণ করেছেন। যেদিন বালা নাজেল হতো না সেদিন দুঃখে কাতর হয়ে বলতেন, কি কারণে আল্লাহ্ আজ আমাকে স্মরণ করলেন না? এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা বুযুর্গ মুঈনউদ্দিন হাসান সনজরী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি যে, প্রেম তারই করা উচিত যে বন্ধুর দেয়া দুঃখ-কষ্টে সবুর করতে পারে। বন্ধু প্রদত্ত দুঃখ বন্ধুর জন্যই হয়ে থাকে। সলুকের পথে বন্ধুর হতে আসা বালা নিয়ামত স্বরূপ; যেদিন কারও প্রতি তা নাজেল না হয়, বুঝতে হবে যে তার উপর হতে সে নেয়ামত তুলে নেয়া হয়েছে।

মা বালা বর কাসে কাযা নাকুনেম,
নামে আওর অযে আউলিয়া নাকুনেম॥
ইঁ বালা গাওহারে খাজানায়ে মাস্‌ত,
গাওহারে খোদ বকাস আতা নাকুনেম॥

অর্থ—আমরা কোন বিপদ মুসিবতকে এড়িয়ে যাইনা
তাদের নাম বন্ধুত্বে অস্বীকার করিনা
এ বিপদ আমাদের সম্পদ-ভাণ্ডার
নিজের সম্পদ অন্যকে দান করি না॥

হযরত খাঁজা এরপর একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন 'মরদানে গায়েব' (অদৃশ্য ব্যক্তি বা ফেরেস্তা) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, মানুষ যখন ফেরেস্তাদের মতো পরিপূর্ণ পবিত্রতার অধিকারী হয় তখন ফেরেস্তা তাকে আহ্বান করে। তিনি সে শব্দ শ্রবণ করে তাদের দিকে চলতে থাকে এবং কাছে যেয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর এরশাদ করলেন, শায়খ ওসমান সনজরী নামে আমার এক বন্ধু এবং পীর ভাই ছিলেন, এবাদত, বন্দেগী ও রোজা পালনে তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। তিনি তাঁর কর্মে যখন পরিপূর্ণতা বা কামালিয়াতের স্তরে সুদৃঢ় হলেন তখন ফেরেস্তা তাঁর সাথে দেখা করে দলভুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। তিনি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। একদিন আমার সঙ্গে বন্ধুদের মজলিসে বসেছিলেন, ফেরেস্তা আহ্বান করলো, শায়খ ওসমান এস আমরা যাই। তিনি 'লাব্বায়েক' বললেন এবং আমার নিকট হতে তাদের দিকে চলে গেলেন। কিন্তু কোথায় গেলেন তা জানি না। এরপর এরশাদ করলেন, আমি এবং কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী কাবা শরীফ তাওয়াফে রত ছিলাম আমাদের সম্মুখে ছিলেন হযরত শায়খ ওসমান (রহঃ), যিনি হযরত শায়খ আবুবকর শিবলী (রহঃ)-এর বংশধর ছিলেন এবং বড় বুজুর্গ ছিলেন। আমরা তাঁর সামান্য পিছনে থেকে তাঁর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলছিলাম। তিনি তাঁর স্বচ্ছ হৃদয় দ্বারা আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, আমার প্রকাশ্য অনুকরণ করে লাভ কি? যদি পার তো আমার বাতেনী (অপ্রকাশ্য) অনুসরণ কর। আমরা নিবেদন করলাম, আপনার বাতেনী অনুসরণ কি প্রকারের? তিনি বললেন, 'প্রতিদিন একহাজার বার কোরান শরীফ খতম করা'। আমি এবং কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী উভয়ে তাজ্জব হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, এ কাজ কোন মানব সন্তানের দ্বারা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই মনে হয় প্রত্যেক সূরায় প্রথম আয়াতটা পাঠ করে থাকেন। আমরা যখন এই চিন্তা করলাম তখন তিনি মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যা মনে করলে সেটা ভুল। কারণ, আমি প্রতিদিন একহাজার বার কোরান শরীফের প্রতিটি অক্ষর একটার পর একটা পাঠ করে থাকি। যখন এ ঘটনা বর্ণিত হচ্ছিলো তখন মওলানা আলাউদ্দিন কিরমাণী বললেন, তাঁর উত্তর আমার জ্ঞানের ধারন ক্ষমতার বাইরে। এটা হয়তো কোন কারামত হবে, কারণ কারামতের ব্যাপারে জ্ঞান কোন কাজ করে না। এ কথা শোনার পর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ) এর চোখে অশ্রু দেখা দিলো এবং বললেন যে ব্যক্তি মাকামে আলীয়াতে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর স্তরে পৌঁচেছে সে নিজের নেক আমল দ্বারাই পৌঁচেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত, কেউ গ্রহণ করে, কেউ করে না। চেষ্টা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে অনুগ্রহকে সম্বল করে শ্রেষ্ঠ-স্তরে পৌঁছতে হয়।

পরবর্তী আলোচনা মজলিসের আদাব সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন, হযরত খাঁজা কুতুব (রহঃ) এরশাদ করলেন, মজলিসে প্রবেশ করে যেখানে জায়গা খালি পাবে সেখানেই বসে পড়বে, কেননা আগতদের জন্য শূন্যস্থানই নির্দিষ্ট থাকে। এরপর এরশাদ করলেন, আমি অধম আজমীর শরীফে মওলানা সালাহউদ্দিন (রহঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, আমার মুর্শেদ হুজুর (রহঃ)-ও উক্ত মজলিসে ছিলেন। "বালা" সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো, মওলানা সালাহ্উদ্দিন (আলায়হে আর-রহমতান) এরশাদ করলেন, একবার পয়গম্বর (আঃ) কোথাও গিয়েছিলেন, সেখানে সাহাবীগণ ঘরের মধ্যে তাঁকে বেষ্টন করে বসে ছিলেন। পরে আরও তিনজন লোক আসলো তাদের মধ্যে হতে একজন রসূলে মকবুল (দঃ)-এর বেষ্টনীর মধ্যে স্থান পেলেন, অপর দু'জনের বসার মতো যায়গা ঐ বেষ্টনীতে ছিল না, তাদের মধ্যে একজন বেষ্টনীর বাইরে বসলো অপরজন চলে গেলো। তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন, হে নবী, আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, যারা এই বেষ্টনীর মধ্যে বসে আছে, তাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং যে ব্যক্তি বেষ্টনীর বাইরে বসে আছে তাকেও আল্লাহ্, তাঁর করুণা ও দয়া দ্বারা ক্ষমা করেছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি চলে গেছে সে দুর্ভাগা। সে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ্র রহমতও তার নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এরপর এরশাদ করলেন যে, আবু লায়ছা লিখিত 'তম্বীহ' কিতাবে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি মজলিস পাবে অথচ বসবে না সে অভিশপ্ত (মালউন)।

পরবর্তী আলোচনা "পদক্ষেপ" সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ) এরশাদ করলেন পদক্ষেপ দুই প্রকার (১) 'নফ্‌সে নেক' বা পবিত্র বাসনা, (২) 'নফসে বদ' বা অন্যায় বাসনা। খোদা যেন কারো জন্য 'নফসে বদ' বা অন্যায় বাসনা নির্দ্ধারণ না করেন। এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি তিনি বলছিলেন, "একদিন আমি এবং হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ) এক জায়গায় বসেছিলাম, এমন সময় আমার পীর ভাই শায়খ বুরহানউদ্দিন চিশ্‌তী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তার চেহারায় অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিলো। হযরত খাঁজা ওসমান হারুনী (কুঃ সেঃ) এরশাদ করলেন, হে বোরহান, আজ তোমার মন এতো খারাপ কেন? সে আরজ করলো, আমি আমার এক প্রতিবেশীর ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছি, সে নিজের বাড়ীকে এমন ভাবে দু'তলায় পরিবর্তন করেছে, যার ফলে আমার মেয়ে মহলের পর্দা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ) জিজ্ঞেস

করলেন, সে কি জানে যে তুমি আমার মুরীদ? বোরহানউদ্দিন বললো, আমি যে আপনার মুরীদ সে তা জানে। হুজুর একথা শোনার পর বললেন তাহলে সে এখনও দ্বিতল হতে ভূপতিত হয় না কেন? এ সময়ে বোরহান উদ্দিনের বাড়ীর এক লোক মজলিস হতে তার প্রয়োজনে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। সে পথিমধ্যে শুনতে পেল যে, দ্বিতল হতে ভূপতিত হয়ে ঐ পরশীর ঘার ভেঙ্গে গেছে। এরপর খাঁজা কুতুব এরশাদ করলেন, আমি আজমীর শরীফে হযরত বুজুর্গের খেদমতে হাজির ছিলাম, সে সময় রাজা পৃথ্বিরাজের রাজত্ব ছিলো। রাজা সব সময় খাঁজা বুজুর্গের ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত থাকতো এবং চাইতো যে, এমন কিছু ঘটুক যার কারণে হুজুর আজমীর ত্যাগ করে চলে যান। সব সময়ই সে সবার সাথে ষড়যন্ত্র করতো। এ খবর যখন হযরত খাঁজা বুজুর্গের পবিত্র কানে পৌঁছালো তখন তিনি মোরাকাবায় ছিলেন। মোরাকাবা হতে অবসর হয়ে এরশাদ করলেন, আমি পৃথ্বিরাজকে মুসলমানদের হাতে জীবিত বন্দী অবস্থায় অর্পণ করলাম। এ ঘটনার কয়েক দিন পরেই সুলতান শিহাবউদ্দিন ঘোরীর সৈন্যগণ পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ করলো এবং যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ পরাজিত হয়ে জীবিত বন্দী হলো। সুতরাং বুঝতে হবে যে দরবেশের একটি কথায় আগুন জ্বলে উঠে এবং অপর কথায় আগুন নিভে পানি হয়ে যায়।

মালেক ইখতিয়ারউদ্দিন আইবেক একটা ছোট শহরের শাসনকর্তা ছিলো। সে বাদশাহের নির্দেশে হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কদমবুচি করলো এবং হযরত খাঁজা যেখানে বাস করতেন অনুরূপ কয়েকটি নিকর গ্রাম উপঢৌকন (নজরানা) দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করলো। হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এ ধরনের কাজ আমাদের পীরগণের রীতি-বিরুদ্ধ। কোন নিকর জায়গা অথবা কোন প্রকার নজর গ্রহণ করলে দুনিয়াতে তার সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়, সেটা আমাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ। এরপর তিনি স্বীয় জায়নামাজের একটা কোণা উত্তোলন করে মালেক এখতিয়ারউদ্দিনকে ডেকে এরশাদ করলেন, এদিকে তাকাও এবং উপস্থিত অন্যান্যদেরকেও বললেন, তোমরাও এদিকে দেখ। প্রত্যেকে জায়নামাজের নীচে তাকিয়ে দেখলেন, আল্লাহ্‌র রত্ন ভাণ্ডারের নহর (খাল), তাঁর জায়নামাজের তলা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি মালেক এখতিয়ারউদ্দিন আইবেকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'হে আইবেক, যার নিকট আল্লাহ্‌র রত্নভাণ্ডারের নদী মওজুদ রয়েছে তার এ ক'টি গ্রাম উপঢৌকন নিয়ে কি হবে? এ উপহার ফেরৎ নিয়ে যাও এবং বাদশাহ্‌কে বলে দিও, যেন ভবিষ্যতে দরবেশদের

সঙ্গে এমন ধৃষ্টতা ও অভদ্রোচিত ব্যবহার না করে, তা না হলে এমন কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সন্‌জরী কাদ্দাসাল্লাহু সাররাহু, শায়খ আহাদউদ্দিন কিরমানী (রহঃ), শায়খ শিহাবউদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী (রহঃ) এবং আমি একত্রে উপবিষ্ট ছিলাম। আম্বিয়া আলায়হেস্‌সালাম সম্বন্ধে কথা চলছিলো, এমন সময় সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হঠাৎ আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো, বুজুর্গদের দৃষ্টি তার প্রতি নিপতিত হলো। খাঁজা বুজুর্গ বললেন, এ ছেলে একদিন দিল্লীর বাদশাহ হবে এবং যে পর্যন্ত সে দিল্লীর ক্ষমতা হস্তগত না করবে সে পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। পরবর্তীকালে খাঁজা বুজুর্গের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর এরশাদ করলেন যে, আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত (বুজুর্গ) ব্যক্তিদের বাক্যের মর্যাদা আল্লাহ্‌তায়ালা এমনিভাবেই দিয়ে থাকেন।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো বয়াত সম্বন্ধে। তিনি এরশাদ করলেন, দ্বিতীয়বার বয়াত গ্রহণ করা জায়েজ (সিদ্ধ) আছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পীরের নিকট হতে চলে আসে অথবা তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অথবা তার তওবা যদি নির্ভেজাল বা সন্দেহমুক্ত না হয়, তাহলে সে দ্বিতীয়বার বয়াত গ্রহণ করতে পারে এবং করতে হয়। যদি না করে তাহলে প্রথম বয়াত বাতিল হয়ে যায়। এরপর এরশাদ করলেন, শায়খ সায়ফুল ইসলাম বোরহানউদ্দিন (রহঃ) বিরচিত 'রওজা" কেতাবে বর্ণিত আছে যে হযরত খাঁজা হাসান বসরী (রহঃ) রওয়ায়েত করেছেন, হযরত রসূলে খোদা সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন দূত হিসেবে প্রথমে হযরত ওসমান (রাদিঃ)-কে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পরপরই শত্রুপক্ষ গুজব ছড়াতে লাগলো হযরত ওসমান (রাদিঃ)-কে মক্কা শরীফে শহীদ করা হয়েছে। রসূলে মকবুল (সঃ) যখন এ সংবাদ শ্রবণ করলেন তখন সমস্ত সাহাবীদেরকে (রাদিঃ) একত্রিত করে নির্দেশ দিলেন, মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নতুনভাবে বয়াত গ্রহণ করো। সকলেই হুজুর পাক (সাঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করলেন। এ সময় হুজুর করিম (সাঃ) একটা গাছের গুঁড়ির সাথে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন, যে জন্য এ বয়াতকে বয়াতে শাজারা (গাছ) বা বয়াতে রেদওয়ান বলা হয়। এরপর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম আদামাল্লাহু বাকাহু এরশাদ করলেন, তাহলে বুঝতে পারলে তো যে, প্রয়োজনে সাহাবা (রাদিঃ)-গণও নতুনভাবে বয়াত গ্রহণ

করতেন। এরপর আমি (শায়খ ফরিদ) আবেদন করলাম যে যদি পীরকে উপস্থিত না পাওয়া যায় এবং তওবার মধ্যেও সন্দেহ দেখা দেয় তখন কি করা ওয়াজেব (কর্তব্য)? হযরত খাঁজা কুতুবল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন এরশাদ করলেন যে, নিজের পীরের কাপড় সামনে রেখে ঐ কাপড় হতে বয়াত গ্রহণ করতে হবে। এরপর বললেন, আমি আমার মুর্শেদিকে কয়েকবার এরূপ করতে দেখেছি এবং কখনও কখনও আমি নিজেও করেছি। এরপর মুরীদের বিশুদ্ধ বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন, বাগদাদ শরীফে এক দরবেশকে সন্দেহ করে ধরে কাজীর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। কাজী সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করার পর দরবেশকে হত্যা করার আদেশ দিলো। জল্লাদ কতলের হুকুম পাওয়ার পর দরবেশকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে গেলো। নিয়ম অনুযায়ী দরবেশকে কেবলামুখী করে হত্যা করতে উদ্ধত হতেই দরবেশ মুখ ঘুরিয়ে স্বীয় পীরের আস্তানার দিকে করে নিলো। জল্লাদ বললো, মৃত্যুর সময় মুখ কেবলার দিকে করা দরকার। দরবেশ বললো, তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও; আমি আমার মুখ, আমার কেবলার দিকে করে নিয়েছি। উভয়ে এ বাক-বিতণ্ডায় নিয়োজিত ছিলো, এমন সময় দূত খলিফার আদেশ নিয়ে এলো যে, আমি দরবেশের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি, তাকে মুক্ত করে দাও। খাঁজা কুতুব (রহঃ) এ ঘটনা বলার পর বললেন, দেখ তার বিশুদ্ধ আকিদা (বিশ্বাস) তার অবধারিত মৃত্যু হতে তাকে উদ্ধার করালো। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী (রহঃ) সুফিদের মধ্যে বসেছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা চলছিলো। যখন তার মুখ এক বিশেষ দিকে ঘুরে যেতো তিনি তখনই দাঁড়িয়ে যেতেন। অবশেষে দেখা গেলো যে তিনি সেই মজলিসে ১১০ বার এ ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। সব আসহাবে সুফ্‌ফা এ কারণে বিস্মিত ও কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলো। তাদের সকলেই বুঝতে পেরেছিলো যে এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন গুরুরহস্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু আদবের খেলাফ হবে, এ কথা চিন্তা করে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারেনি। যখন তিনি মজলিস হতে চলে গেলেন তখন আমি তাঁর এক বিশেষ খাদেমকে বললাম উপযুক্ত সময় বুঝে হুজুরের নিকট হতে এর কারণটা জেনে নিবেন। পরে তিনি একদিন সময় বুঝে হযরত খাঁজা বুজুর্গকে উক্ত ঘটনার রহস্য উন্মোচন করার জন্য আরজ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন ঐ দিকে আমার মুর্শেদের হাজার পবিত্রতা বিজড়িত রয়েছে, যখন আমার দৃষ্টি ঐ দিকে নিবদ্ধ হতো আমি তাঁর সম্মান প্রদর্শনে দাঁড়িয়ে পড়তাম। এরপর এরশাদ করলেন, পীরের উপস্থিতি ও স্মরণে মুরীদকে সম্মান

প্রদর্শন করা উচিত এবং যখন পীর পরলোকগমন করবেন সে সময় আরও বেশী আদব করা উচিত।

পরবর্তী আলোচনা 'সামা' (বিশুদ্ধ গান)-কে কেন্দ্র করে শুরু হলো। এর-'শাদ' করলেন সামার যে মজা আছে তা অন্য কোন বস্তুতে নেই এবং সে অবস্থা এমন যে, সামা ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে হাসেল করা সম্ভব নয়। এরপর এরশাদ করলেন যে, আমি এবং কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী, শায়খ আলী সনজরী (রহঃ)-এর খানকায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে সামার মজলিস বসলো, কাওয়াল-গণ নিম্নোক্ত শায়ের (কবিতা) গাইতে শুরু করলো—

কুশতাগানে খনজরে তসলীমে রা
হর জমা' আয গায়েবে জানে দীগারাস্ত ॥
অর্থ—প্রেমের তরবারীতে যারা খণ্ড বিখণ্ড হয়েছে
তারা প্রতি মূহূর্তে অদৃশ্য হতে নবজীবন লাভ করে।

এ গানে কাজী হামিউদ্দিন ও আমার ওজ্‌দ্‌ (ঐশী প্রেমাকর্ষনে মূর্ছাগত হওয়া) এমন বৃদ্ধি পেলো যে তিনরাত ও তিনদিন এ অবস্থাতেই বিভোর ছিলাম। অচৈতন্য ও বিবশতায় নিমজ্জিত হয়ে যাই আমরা এ গানের কথা ও সুরের মূর্চ্ছনায়। যখন আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো তখন আমরা কাওয়ালদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজ আবাসে ফিরে এলাম। কাওয়ালদেরকে বললাম ঐ গান পুনরায় গাইতে, তারা ঐ গান গাইতেই আমরা জাগতিক যেতনা হতে বিমুক্ত হয়ে অচৈতন্যলোকে গমন করলাম। একাধারে চার অহরাত্র এ অবস্থায় পড়েছিলাম। নামাজের সময় হলে চেতনা ফিরে পেতাম এবং নামাজ পাঠ শেষ হলেই পুনরায় আলমে বেহু-শীতে প্রবেশ করতাম। এভাবে ৭ দিন সামার মাঝে বিভোর ছিলাম প্রত্যেক দিন ঐশী-প্রেমাকর্ষণের একটা করে নতুন মত্ততা উপভোগ করতাম। এপরূপ এর-শাদ করলেন, আমি এবং কাজী হামিদউদ্দীন নাগোরী এক শহরে পৌঁছে দেখলাম, ১২ জনের একটা দল আকর্ষিত হয়ে নিজ নিজ সত্তা হতে বিমুক্ত হয়ে অত্যাশ্চর্যের জগতে অবস্থান করছেন। আমরা এদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম প্রত্যেকে সাহেবে কামাল বা পরিপূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর আমাকে এরশাদ করলেন, হে ফরিদ, আম্বিয়া আলাহেস সালামগণ মাসুম (নিষ্পাপ) এবং আওলিয়া কেরামগণ মাহ্‌ফুজ (সুরক্ষিত বা নিরাপদ)। কারণ, উন্মত্ততার জগতেও তাঁদের দ্বারা কোন শরীয়ত বিরোধী ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন হয় না। এরপর এরশাদ করলেন,

আমি আমার মুর্শিদ হযরত খাঁজা বুজুর্গের সাথে হজ্বের পালনের জন্য গিয়ে-ছিলাম, ফেরার পথে এক শহরে অবস্থান করছিলাম ; শহরটির নাম স্মরণ নেই। সেখানে এক বুজুর্গের সাথে দেখা হলো, তিনি অত্যন্ত মহিমান্বিত ছিলেন। তিনি একটা গুহায় বাস করতেন। আল্লাহর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ততার কারণে তাঁর দেহে মাংস অবশিষ্ট ছিল না। তাঁকে দেখলে মনে হয় একখণ্ড শুকনো কাঠ। খাঁজা বুজুর্গ আমার দিকে খেয়াল করে বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে কয়েকদিন এখানে অপেক্ষা করতে পার। আমি বললাম, হুজুর আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আপনি যে নির্দেশ দিবেন তাই করবো। অবশেষে আমি এবং খাঁজা বুজুর্গ উভয়ে এক মাসের বেশী সময় তাঁর সঙ্গে কাটালাম। এ সময়ের মধ্যে তিনি শুধু একদিন মাত্র চেতনার জগতে ফিরে এসেছিলেন, মাত্র সামান্য সময়ের জন্য। একটু পরেই আবার অচৈতন্যলোকে প্রবেশ করেছিলেন। আমরা তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় পেয়ে সালাম জানালাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'হে বন্ধুদ্বয় তোমাদের এখানে কষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রতিদানে সৌভাগ্য হাসেল হবে। কেননা আহলে সলুকগণ বলেছেন, যে দরবেশদের খেদমত করে সে অবশ্যই মনজিলে মকসুদে পৌঁছে যায়। পরে বললেন, 'বসো'। আমরা বসে পড়লাম। নিজের কথা বলতে লাগলেন, আমি মুহম্মদ আসলাম তৌসী (রহঃ)-এর বংশধর। আমি অলৌকিক জগতে পদার্পণ করেছি ৩০ বছর হলো। দিন বা রাতের কোন সংবাদ রাখিনা, হক-তায়ালা শুধু আজ আমাকে তোমাদের জন্য চেতনার জগতে ফিরিয়ে এনেছেন। হে বন্ধুগণ, এখন তোমরা বিদায় নিতে পার। তোমরা এখানে যে কষ্টসাধনা করেছ তার প্রতিদানে আল্লাহ তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু একটা কথা স্মরণ রেখো, "দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ো না এবং মানব সমাজ ও বস্তুবান থেকে দূরে থেকো, যা কিছু তোমরা নজর-নিয়াজ হিসাবে পাবে তা অপরের প্রাপ্য মনে করে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিবে। নিজের কাছে কিছুই রাখবে না, তা না হলে দরবেশের মাথারমণি হতে পারবে না। আমার সর্বশেষ উপদেশ হচ্ছে প্রভুর ধ্যান-মগ্নতা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি অকৃষ্ট হবে না। এ অমূল্য উপদেশ দান করার পর তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যানে মগ্ন হয়ে ঐশী-অচৈতন্যলোকে গমন করলেন। আমি এবং খাঁজা বুজুর্গ সেখান হতে যাত্রা করে বাগদাদ ফিরে এলাম। যখন হযরত খাঁজা এ অমূল্য বাণী শেষ করলেন, তখন গভীর ধ্যানে অচৈতন্যলোকে গমন করলেন। মজলিস এখানেই সমাপ্ত হলো। দোয়াপ্রার্থীগণ নিজ নিজ আবাসে যেয়ে স্বীয় কাজে মশগুল হলো।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

৬৫৮ হিজরী নববী (দঃ) সানের পবিত্র শওয়াল মাসের তিন তারিখে রবিবার দিন পবিত্র কদম মোবারক চুম্বনের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। আলোচনা 'সলুক' সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম আদমাল্লাহু বাকাউহু এরশাদ করলেন, অনেক শায়খ (পীর) ও তরীকতের আউলিয়া সলুকের ১৮০টি স্তর বা সোপান নির্দ্ধারন করেছেন। জোনায়দিয়া/কাদরিয়া তরীকার পীরগণ এই স্তরের সংখ্যা নির্দ্ধারন করেছেন ১০০টি। জুন্নুন তরীকার ওলীগণ বলেছেন এই স্তরের সংখ্যা ৭০টি। তবকাতিয়া, ইব্রাহীম এবং নশ্রেহানী তরীকাওয়ালার মাশায়েখ এই স্তরের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করেছেন ৫০টি। খাঁজা বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ), হযরত আবদল্লাহ মোবারক (রহঃ) এবং হযরত খাঁজা সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেন সলুকের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে ৪৫টি। শাহ্‌সোজা কিরমানী (রহঃ), সামনুন মুহেব্ব (রহঃ) এবং খাঁজা মীরয়াতিশ (রহঃ)-এর তরীকায় সলুকের স্তরের সংখ্যা ২০টি, কিন্তু আমাদের মাশায়েখ রেদওয়ানআল্লাহআনহু আজমাইন, বলেছেন, সলুকের সর্বমোট স্তরের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ১৫টি। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, এই স্তরগুলোর মাঝে একটা স্তর আছে কাশফ ও কারামতের। প্রত্যেকের উচিত ঐ স্তরে নিজকে গোপন রাখা। যে ব্যক্তি কাশফ ও কারামতের স্তরে নিজকে প্রকাশ করবে সে সম্মুখের স্তর হতে বঞ্চিত হবে। কাশফ ও কারামতের স্তর বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। যে সব তরীকায় মোট স্তরের সংখ্যা ১৮০টি তাঁদের নিকট কাশফ ও কারামতের স্তরটি হচ্ছে ৮০। জোনায়দিয়া তরীকায় এ স্তরটি হচ্ছে ৭০। বসরিয়ায় ৩০-এর স্তরটি হচ্ছে কাশফ ও কারামতের। জুন্নুন মিস্‌রী তরীকায় এ স্তরটি হচ্ছে ২৫-এর। শাহ্‌সোজা কিরমানীর নিকট এ স্তরটি হলো ১০-এর। সর্বশেষে খাঁজেগানে চিশ্‌ত এর নিকট ৫ম স্তর হচ্ছে কাশফ ও কারামতের। সুতরাং সেই হবে সফলকাম যে কাশফ ও কারামতের স্তরে নিজেকে প্রকাশ না করে সমস্ত স্তরগুলো অর্জন করে নেবে। এই স্তরে কাশফ ও কারামত প্রকাশ করলে অবশিষ্ট স্তর হতে বঞ্চিত হতে হবে। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, আহলে সলুকগণ এসব স্তর এ জন্য রেখেছেন যাতে সলুকের পথের পথিকদের পথ চলতে সহজ হয়। তাছাড়া সে তার অবস্থা দ্বারা কোন স্তরে অবস্থান করে তাও যেন বুঝতে পারে এবং সেই অনুসারে চেষ্টা করতে পারে। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ)-এর চোখ অশ্রুতে

পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তারপর বলতে লাগলেন, উম্মতে মুহম্মদীর (দঃ) মধ্যে এমন অসাধারণ ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিলো যাদের মধ্যে অনেকে গত হয়ে গেছেন এবং অনেকে এখনও বর্তমান আছেন, যারা সলুকের ঐ নির্দ্ধারিত স্তর অতিক্রম করার পরও আরো হাজারো উর্ধ্বের স্তর অতিক্রম করেছেন। কিন্তু কোন দিনও বন্ধুর রহস্য বাইরে প্রকাশ করেননি এবং তাঁরা এটাও কোনদিন খেয়াল করেননি যে, আমি কে এবং কি। হে ফরিদ, কোন ব্যক্তি এ নির্দ্ধারিত স্তরসমূহ অতিক্রম করার পর আরও সম্মুখের উচ্চতর স্তর সমূহ লাভ করে খোদার 'ধ্যান-মগ্ন' অলৌকিক অচৈতন্য-লোকে চলে যান এবং তাঁর বিরহ-বিচ্ছেদ মিলনে পরিবর্তন হয়। হযরত খাঁজা কুতুবউদ্দিন (রহঃ) এ পর্যন্ত বলা শেষ করে ঐশীঅচৈতন্য লোকে গমন করলেন। দোয়াপ্রার্থীগণ স্ব স্ব স্থানে যেয়ে মশগুল হলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

চতুর্থ মজলিস

সোমবার, ১৫ই জিলকদ ৬৪৮ হিঃ। প্রথমে কদমবুচি, সৌভাগ্য অর্জন করলাম। মজলিসে মওলানা আলাউদ্দিন কিরমানী, শায়খ মাহমুদ ও অনেক সুফি দরবেশগণ খেদমতে হাজির ছিলেন। 'তকবীর' বলা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। প্রশ্ন উঠলো দরবেশগণ যে, অলি-গলিতে তকবীর (আল্লাহু আকবর) বলে তার অর্থ কি? হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ) এরশাদ করলেন যে, এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে প্রত্যেক গলিতে তকবীর বলা হবে এবং এ অভ্যাস ভালোও নয়। কিন্তু তকবীর সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে নেয়ামতের (আল্লাহর দান) শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তকবীর বললে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। এরপর এরশাদ করলেন, তকবীরের অর্থ হামদ (প্রশংসা) এবং নেয়ামত বা দানের জন্য শু র, বা কৃতজ্ঞতা করা উচিত। তকবীর বা প্রশংসাই হচ্ছে দানের কৃতজ্ঞতা। এরপর বললেন, একবার আমি যখন শায়খ শিহাবউদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, তিনি বাগদাদ থাকতেন, সঙ্গলাভের সুযোগ আমার প্রায়ই ঘটতো, তিনি প্রকৃতই জাহেদ, আবেদ ও বুজুর্গ হিসেবে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি তাঁর মত বুজুর্গ খুব কমই দেখেছি। একদিন এক দরবেশ তাঁর খেদমতে এসে সালাম করে হস্ত মোবারক ধরতেই তসবীহ ও তকবীর বলে উঠলেন। হযরত তার কর্ম দেখে অত্যন্ত কঠোর হলেন এবং বলতে লাগলেন, একবার রসূলে খোদা (সাঃ) এর পাশে সাহাবীগণ বসা ছিলেন। হুজুর করিম (সাঃ) এরশাদ করলেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মত দ্বারা বেহেস্তের এক চতুর্থাংশ পূর্ণ হবে এবং অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য নবীর উম্মত দ্বারা পূর্ণ হবে। এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত আমিরুল মুমেনীন আবুবকর সিদ্দিক দাঁড়িয়ে বললেন এসো, এ নিয়ামতের শুক্‌রিয়ায় তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলি। হযরত আবুবকর (রাদিঃ)-এর জবান মোবারক হতে একথা বেরুতেই সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তকবীর বললেন। এরপর হযরত রসূলে খোদা (সাঃ -এর নিকট ওহি এলো, "আপনার উম্মত দ্বারা বেহেস্তের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে এবং দুই তৃতীয়াংশ অন্যান্য নবীর উম্মত দ্বারা পূর্ণ হবে। যখন হুজুর পাক (সাঃ) এ সুসংবাদ সাহাবীদের শোনালেন, তখন হযরত আমিরুল মুমেনীন ওমর বিন খাত্তাব (রাদিঃ) দাঁড়িয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাদিঃ)-এর অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাহাবী (রাদিঃ)-গণ হযরত ওমর ফারুক (রাদিঃ)-এর ইচ্ছার প্রতি সাড়া দিয়ে তকবীর

বললেন। এরপর হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) আরও খুশীর খবর শুনিয়ে বললেন, হাশরের দিন আমার উম্মত দ্বারাই বেহেশ্তের অর্দ্ধেক পূর্ণ হবে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অন্যান্য নবীর উম্মতদের মধ্য হতে হবে। এ সুখবরে হযরত আমিরুল মুমেনীন ওসমান এবনে আফ্ফান (রাদিঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজে পূর্বোক্ত দু'বন্ধুর মতো ইচ্ছা প্রকাশ করায় সাহাবী (রাদিঃ) গণ দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন। এরপর হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করলেন, যে পর্যন্ত আমার উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশ না করবে সে পর্যন্ত অন্যান্য নবীর উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত আমিরুল মুমেনীন আলি এবনে আবু তালিব (রাদিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন সুসংবাদের শুকুর আদায় করার জন্যও তকবীর বলা প্রয়োজন। প্রত্যেক সাহাবী (রাদিঃ) দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন। এরপর হযরত শায়খ শিহাবউদ্দিন ওমর সোহ্রাওয়ার্দী (রহঃ) বললেন দরবেশগণ যে চার তকবীরের কথা বর্ণনা করেছেন সেগুলো এই তকবীর। সুতরাং সব সময় তকবীর বলা উচিত না।

এরপর আলোচনা শুরু হলো পীরের উপস্থিতিতে নফল নামাজ পাঠ করা সম্বন্ধে। প্রশ্ন হলো, মুরীদ নফল নামাজে রত থাকা অবস্থায় যদি পীর তাকে ডাকে এবং সে নামাজ ত্যাগ করে চলে আসে তাহলে তার ফল কি হবে? হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ) এরশাদ করলেন, নফল নামাজ ত্যাগ করে পীরের ডাকে সাড়া দেয়া কল্যাণকর। এর সওয়াব অনেক বেশী কিন্তু নফল নামাজের সওয়াব তত বেশী নয়। একবার আমি নফল নামাজে রত থাকাকালীন অবস্থায় আমার মুর্শেদ হযরত খাঁজা বুজুর্গ আমাকে ডাক দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে নামাজ ছেড়ে দিয়ে উত্তর দিলাম। তিনি বললেন এসো, আমি পবিত্র খেদমতে হাজির হলাম। তিনি এরশাদ করলেন, কি করছিলে? আমি বললাম নফল নামাজে ব্যস্ত ছিলাম, আপনি ডাকলেন তাই খেদমতে হাজির হলাম। তিনি শুনে বললেন খুব ভালো করেছো। নিজের পীরের আদেশ পালন নফল নামাজ হতে উৎকৃষ্ট। এরপর এরশাদ করলেন, আমি হযরত খাঁজা নাসিরউদ্দিন আবি ইউসুফ চিশ্তী (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, অনেক সুফি বুজুর্গানে চিশ্ত পবিত্র খেদমতে হাজির ছিলেন। আউলিয়া আল্লাহর কারামত সম্বন্ধে বর্ণনা চলছিলো। একজন আল্লাহর পথের শিক্ষার্থী পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে বয়াত হওয়ার জন্য আরজ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন বসো; সে বসে পড়লো এবং দ্বিতীয়বার আবেদন করলো যে, আমি বাসনা নিয়ে এসেছি, হযরতের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবো। তিনি তখন অত্যন্ত খুশী ছিলেন, বললেন, যদি তুমি আমার নির্দেশ পালন কর তাহলে তোমাকে আমার

মুরীদ করতে কোন আপত্তি নেই। সে আরজ করলো, নির্দেশ পালনে বান্দা প্রস্তুত আছে। হযরত আবু ইউসুফ চিশ্‌তী (রহঃ) এরশাদ করলেন, তুমি কলেমা লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নিশ্চয়ই পাঠ কর কিন্তু আজ এ কলেমার পরিবর্তে লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ ইউসুফ চিশ্‌তী রাসূলুল্লাহ পাঠ কর। ঐ ব্যক্তি বলার সাথে সাথেই বিনা দ্বিধায় তাঁর নির্দেশ পালন করলো। তিনিও তাকে সঙ্গে সঙ্গে বয়াত করে নিলেন এবং অত্যন্ত দয়া পরশ হয়ে নিজের বিশেষ পরিচ্ছদ দান করলেন। এরপর বললেন, আমি নিজেই হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর গোলাম। অতএব আমার কি ক্ষমতা আছে তাঁর সম পর্যায়ের মর্যাদার দাবী করা, এটা শুধু তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য করা হয়েছে। তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তোমাকে মুরীদ করা হলো। এবার এসো, আমরা তওবা করে নেই। এরপর এরশাদ করলেন, যখন কোন ব্যক্তি তওবা করে তার উচিত যে, সে যাদের সাথে উঠাবসা করায় নিষিদ্ধ কর্মে প্ররোচিত হয়েছিলো তাদেরকে ত্যাগ করা এবং কোন সময়ের জন্যই তাদের সঙ্গে উঠাবসা না করা। কেননা, এতে ভয়ের কারণ রয়েছে যদি সে প্রথম বারের মতো আবার কোন অন্যায় করে বসে। এরপর এরশাদ করলেন, খাঁজা হামিদউদ্দিন সোহানী অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। যখন তিনি হযরত খাঁজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সনজরী (রহঃ)-এর হাতে হাত রেখে তওবা করলেন এবং খানকা শরীফে অবস্থান করলেন তখন তাঁর পুরানো আরিফ বন্ধুগন এসে ইচ্ছা পোষণ করলো যে সে যেন তাদের সঙ্গ ত্যাগ না করে পুরাণো প্রক্রিয়া। (জওক শওক) উপর দৃঢ় থাকে। খাঁজা হামিদউদ্দিন তাদেরকে কটাক্ষ করে বললেন, আমার নিকট হতে তোমরা চলে যাও, বেশী বকবক করো না। আমি পাজামার ফিতা এতো মজবুত করে বেধেছি যে হাশরের দিন বেহেস্তের হুরদেরকে দেখেও খুলবো না। খাঁজা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি (রহঃ) বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় খাবার সামনে হাজির হলো, তিনি আহারে মনোনিবেশ করলেন। খাওয়া শেষ না হতেই হযরত শায়খ নিজামউদ্দিন আবুল মুঈদ উপস্থিত হয়ে সালাম দিলেন কিন্তু খাঁজা কুতুব (রহঃ) সালামের উত্তর দিলেন না, এমনকি তার সাথে কোন কথাও বললেন না। এ জন্য হযরত শায়খ নিজামউদ্দিন আবুল মুঈদ (রহঃ) অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন। যখন খাঁজা কুতুবে (রহঃ) আহার শেষ করে মজলিসে উপস্থিত হলেন তখন খাঁজা নিজামউদ্দিন আবুল মুঈদ জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি যখন আহার করছিলেন তখন আমি উপস্থিত হয়ে সালাম

আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু আপনি ছালামের উত্তর না দেয়ার কারণ কি? হযরত খাঁজা কুতুব (রহঃ) এরশাদ করলেন, আমি আহারে ব্যস্ত ছিলাম তখন সালামের জবাব দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, দরবেশ এবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য আহার করে থাকেন। যখন তার এ নিয়ত হয় তখন সে আইন অনুযায়ী এবাদতে নিমগ্ন থাকে তাই সে জবাব দিতে পারে না। সুতরাং উচিত হলো যদি কেউ আহারে রত থাকে তবে তাকে সালাম না দেয়া। আহার শেষ হলে ছালাম দেয়া উচিত। ইমামুল হারামাইন এরশাদ করলেন যে, এ কথা, যা তিনি বর্ণনা করলেন, তা কি, স্বীয় জ্ঞান দ্বারা না কোন উদ্ধৃতি? হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম এরশাদ করলেন, এ কথা আমার জ্ঞানের মধ্য হতে বর্ণনা করেছি। এখানেই তার বক্তব্য শেষ করে তিনি আল্লাহ্‌তে মশগুল হলেন। মজলিস শেষ হলো। দোয়া প্রার্থীগণ যার যার নির্দিষ্ট স্থানে যেয়ে মশগুল হলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

পঞ্চম মজলিস

বৃহস্পতিবার ২ই জিলহজ্ব ৬৪৮ হিজরী। প্রথমে কদমবুসি অর্জিত হলো। বহু দরবেশ ও আহ্‌লে সোফ্‌ফা ছাড়াও ছিলেন কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী, মওলানা আলাউদ্দিন কিরমানী। সৈয়দ নূরউদ্দিন মোবারক, সৈয়দ শরফউদ্দিন, মওলানা আলীমউদ্দিন, মওলনা শরফউদ্দিন, শায়খ আবুল হাই, শায়খ মাহমুদ মোজাদজ ও মওলানা যাকিয়া। এদের প্রত্যেকে এক একজন অত্যন্তঅসাধরণ, কারও সাথে কারও তুলনা হয় না। জমিন হতে আরশ পর্যন্ত তাঁদেরকে এক বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী বলে মনে হচ্ছিলো, প্রত্যেকেই পবিত্র খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হজ্ব এবং কাবা শরীফ পরিভ্রমন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম (রহঃ) এরশাদ করলেন যে, খোদাতায়ালার এমন বান্দাও আছেন যাদের সম্মানে খানা কাবার প্রতি নির্দেশ হয় আপন যায়গা হতে সেই বুজুর্গের নিকট যেয়ে উপস্থিত হওয়ার। যাতে তিনি সেখান হতেই তওয়াফ করতে পারেন। হযরত খাঁজা কুতুব (রহঃ) বলছিলেন যে, হযরত খাঁজা বুজুর্গ এবং আমরা সব আহ্‌লে সোফফা দাঁড়িয়ে ঐশী অত্যাশ্চর্যের জগতে বিলীন ছিলাম। আমার নিজের অস্তিত্বের কোন চেতনা ছিল না। আমি প্রেম পরিতৃপ্তির জগতের মজলিসে বিলীন ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত খাঁজা ও আমি উচ্চস্বরে তকবীর বললাম, যে রকম কাবা তওয়াফের সময়ে বলতে হয়। প্রেম-পরিতৃপ্তির উম্মত্ততায় প্রত্যেকের শরীর হতে রক্ত ঝরতে লাগলো। রক্তের ফোটা যেখানেই পড়ছিলো সেখানেই তকবীর-সমূহ প্রকাশ পাচ্ছিলো। এরপর আমাদের জ্ঞান ফিরে এলে আমরা কাবা শরীফ তওয়াফ করার অনুরূপে রক্তে লিখিতে তকবীরের চারদিকে চারবার পরিভ্রমণ করলাম। সাথে সাথে আওয়াজ হলো, খাঁজা বুজুর্গ ও অন্যান্য আহ্‌লে সোফ্‌ফাদের হজ্ব কবুল করা হলো। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা গরীব নওয়াজের নিয়ম ছিলো প্রত্যেক বছর আজমীর শরীফ হতে কাবা ঘর জেয়ারতের (দর্শনের) জন্য যেতেন। যখন তার কর্ম পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করলো অর্থাৎ তিনি কামালিয়াতের (পরিপূর্ণতার) সর্বশেষ ধাপটি অতিক্রম করলেন তখন কাবা ঘরের যেয়ারতকারিগণ হযরত খাঁজা গরীব নওয়াজকে যেয়ারতের সময় মক্কা শরীফে উপস্থিত পেতেন। কিন্তু তিনি আজমীরেই নিজের আবাসে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। অবশেষে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে তিনি প্রত্যেক রাতে কাবা

ঘর যেয়ারতে যেতেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরে এসে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে সমাধা করতেন। আরও বললেন যে, তিনি বলতেন আমি খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ)-এর মুখে শুনেছি তিনি বলেছেন হযরত খাঁজা মওদূদ চিশ্‌তী যখন কাবা ঘর যেয়ারতের বাসনা করতেন তখন ফেরেস্তাগন কাবাঘর তাঁর সন্নিকটে নিয়ে যেতেন এবং তিনি যেয়ারত কারীর মর্যাদা অর্জন করতেন। এ অবস্থা যদি নামাজের সময় ঘটতো তাহলে তিনি কাবাঘরের সম্মুখে নামাজ পড়তেন এবং যেয়ারত শেষ হলে ফেরেস্তাগণ কাবাঘরকে পুনরায় তার নির্দ্ধারিত স্থানে নিয়ে স্থাপন করতেন। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত খাঁজা হোজায়ফা মির'অশী (কুঃ সেঃ) উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গ ছিলেন, ৭০ বছর তিনি সেজদাহ হতে হাত পা তুলেননি। হজের দিন উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাকে কাবা ঘরে দেখতে পেতেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় বলতেন আমরা হযরতের কাবা ঘর ও বায়তুল মোকাদ্দস (যেগুলো তিনি যেয়ারত করতেন) যেয়ারাত কারীদের অন্তর্ভূক্ত।

এরপর কোরান মজিদ ও ফোরকানে হামিদ সম্বন্ধে অমিয়বাণী পেশ করলেন। বললেন প্রথম দিকে আমি সম্পুর্ণ কোরান শরীফ হেফ্‌জ্‌ করতে পারতাম না যার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এক রাতে স্বপ্নে হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ)-কে দর্শনের সৌভাগ্য হলো। আমি তাঁর কদম (পা) মোবারকে চুমু খেলাম। তিনি আমাকে মাথা উত্তোলন করার নির্দেশ দিলেন। আমি নির্দেশানুযায়ী মাথা উত্তোলন করলাম তিনি এরশাদ করলেন, স্বরা ইউসুফ মুখস্থ করো। আমি স্বপ্ন হতে জাগ্রত হলাম এবং কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় স্বরা ইউসুফ মুখস্ত করে ফেললাম। এরপর আল্লাহতায়ালা সম্পুর্ণ কোরান শরীফ হেফ্‌জ্‌ করার সৌভাগ্য দান করলেন। এরপর এরশাদ করলেন যে ব্যক্তি কোরান শরীফ মুখস্থ করতে চায় তার উচিত স্বরা ইউসুফ খুব ভাল ভাবে মুখস্থ করা ইন্‌শাল্লাহ্‌তায়ালা খুব তাড়াতাড়ি কোরান শরীফ মুখস্থ হয়ে যাবে। এরপর এরশাদ করলেন, আমি আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাঁজা বুজুর্গের মুখে শোনেছি, তিনি বলতেন আমি আমার মুর্শেদ খাঁজা ওসমান হারুনী (রহঃ)-এর মুখে শোনেছি যে হযরত খাঁজা আবু ইউসুফ চিশ্‌তী (রহঃ) কোরান শরীফ মুখস্থ করতে পারতেন না, এজন্য সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নে তাঁর পীর ও মুর্শেদ দেখা দিয়ে বললেন, এতো চিন্তিত কেন? যদি কোরান শরীফ মুখস্থ না হয় তাহলে প্রত্যেক দিন স্বরা এখলাস ১০০ বার কোরান শরীফ মনে থাকার জন্য পাঠ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা কোরান শরীফ মুখস্থ করায়ে দিবেন। জাগ্রত হয়ে তিনি পীরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং

[illegible] দিনের মধ্যেই কোরান শরীফ মুখস্থ করে ফেললেন। এরপর তিনি প্রতি-দিন ৫ বার করে কোরান শরীফ খতম করতেন, তারপর অন্যান্য এবাদতে মশগুল হতেন। এ পর্যন্ত বলার পর হযরত খাঁজা কুতুব (রহঃ) ধ্যানমগ্ন হয়ে ঐশী-অচৈতন্য-লোকে গমন করলেন। মজলিস শেষ হলো। দোয়াপ্রার্থীগণ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

ষষ্ঠ মজলিস

শনিবার, ২০শে জিলহজ ৬৫৮ হিঃ। মজলিসের শুরুতে কদমবুসি লাভ করলাম। মাননীয়, সুফি-দরবেশগণ ও আল্লাহর করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মহতি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। 'শামস্'-এর জলাধার প্রস্তুতের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাঁজা কুতুবুল ইসলাম এরশাদ করলেন, যখন সুলতান শামসুদ্দিন আল-তামাস কিংবদন্তী-জলাধার স্থাপন করতে চাইলো তখন তার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে প্রত্যেক দিন মন্ত্রীবর্গকে সাথে নিয়ে বেরুতেন। যখন তারা বর্তমান জলাধারের নিকট পৌঁছলো তখন সেখানকার জমি দেখে সুলতানের অত্যধিক পছন্দ হলো। সে তার মন্ত্রীদেরকে বললো প্রস্তাবিত জলাধারের জন্য স্থানটি অত্যন্ত উপযোগী। মন্ত্রীগণও স্থানটি পছন্দ করলো। সুলতান আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকারীও ছিলো। প্রাসাদে পৌঁছে নির্ধারিত সময়ে শুয়ে পড়লো। রাতে স্বপ্নে দেখলো জলাধারের নির্বাচিত স্থানের সন্নিকটে মধ্যাকৃতির লম্বা কেশ বিশিষ্ট এক অনিন্দ্য পুরুষ, যার রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনাতীত —কয়েকজন পরিচারক ও বন্ধু সঙ্গী-সাথী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার সুলতান তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করছে আবার তারা সুলতানকে দেখছেন, এ সময় তাদের মধ্য হতে একজন লোক সুলতানের নিকট এসে বললো এসো তোমাকে রসুলে খোদা (সাঃ)-এর যেয়ারত করিয়ে দিচ্ছি। সে তার সাথে গেলো। আগন্তুক ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট মহামানবকে দেখিয়ে বললেন হে শামস্, উনিই হচ্ছেন হুজুর পাক (সাঃ), তোমার যা কিছু আরজ করার আরজ কর। সুলতান তাঁর কদম মোবারকে পড়ে গেলো এবং যে জলাধার (হা'ওজ) তৈরীর বাসনা তার অন্তরে ছিলো আবেদন করলো। তিনি ঘোড়াকে স্বীয় গোড়ালী দ্বারা আঘাত করলেন। ঘোড়া লাফিয়ে

উঠলো এবং পায়ের আঘাত মাটিতে পড়তেই সেখান থেকে পানি বেরিয়ে আসলো। তিনি এরশাদ করলেন, 'হে শামস্, এই জায়গায় হাওজ তৈরী কর, কেননা এখানকার মতো সুস্বাদু ও মিষ্টি পানীয় পানি দুনিয়ার কোথাও নেই। সুলতান নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে উজিরদেরকে সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে যেয়ে দেখলেন ঘোড়ার পায়ের দাগ ও পানীর নহর বর্তমান রয়েছে। শামসুদ্দিন ঘোড়া হতে অবতরণ করে পানী পান করলো এবং মন্ত্রীগণও পান করলো। পানীর প্রশংসায় সবাই বললো, এমন সুস্বাদু পানী দুনিয়ায় কোথাও পাওয়া যাবে না। এরপর খাঁজা কুতুবুল ইসলাম এরশাদ করলেন তোমার পানীতে যে সুস্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করো সে সবই হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ)-এর কদম মোবারকের সদকা এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যে এসব হাওজের নিকটে ও আশে পাশে সর্বদা খোদার প্রেমিকগণ পরিতৃপ্ত হন এবং জানি না কেয়ামত পর্যন্ত তাঁরা কিরূপ পরিতৃপ্ত হবেন। এরপর হযরত খাজা কুতুবুল ইসলামের চোখ অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো! পুনরায় তিনি সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাসের অবস্থা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন যে, সে অত্যন্ত দৃঢ় ও সুশীল মুরীদ ছিলো। প্রায় রাতই সে জেগে কাটাতো এবং নাম মাত্র ঘুমাতো, যখন ঘুম থেকে জাগতো প্রথমেই পানির কলস ভরে নিতো। চাকর নকরদের ডাকতোনা বলতো যে ওরা আরামে শুয়ে আছে ওদেরকে কেন কষ্ট দিব? এরপর এরশাদ করলেন, শামস্, প্রায় রাতেই ছদ্মবেশে শহরে ঘোরে বেড়াতো যাতে প্রজাদের অবস্থা জানতে ও অবলোকন করতে পারে। গরীব মোসল-মানদের বাড়ীতে যেতো এবং টাকা পয়সা দান করতো। প্রত্যেকের অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার পর মসজিদ ও বাসের অনুপযোগী স্থানে যেয়ে সেখানকার লোকজনের খোঁজ খবর নিতো এবং তাদের সকল অভিযোগ শ্রবন করতো, তারপর তাদেরকে বলতো আমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে কিছু বলবে না। সকালে দরবারে বসতো এবং রাতে যাদের অভিযোগ শ্রবণ করতো তাদেরকে ডেকে পাঠাতো। তাদের সাথে অত্যন্ত অমিয় ব্যবহার করতো এবং প্রয়োজন অনুপাতে প্রত্যেককে সাহায্য করতো। তারপর প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে বলতো কেউ যদি তোমদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দিবে। এখন আমি ক্ষমতায় অধিষ্টিত, যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি বা মিমাংসা যা করতে হয় এখন করে নাও। কেননা, হাশরের দিন তোমাদের কোন ব্যাপারের মিমাংসা করার শক্তি আমার থাকবে না। এরপর হযরত খাঁজা কুতুব (রহঃ) এরশাদ করলেন, এ ধরনের কথা সে এজন্য বলতো যেন অত্যাচারীদের দাবী তার উপর থেকে চলে যায় এবং এ কথা যেন বলার অবকাশ

থাকে যে, 'আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম কিন্তু তোমরা আস নাই। এরপর এরশাদ করলেন, এক রাতে সে হঠাৎ এসে আমার পায়ে পড়ে গেলো। আমি তাকে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম অতো ভীত সন্ত্রস্ত কেন? সে আরজ করলো, হুজুরের দয়ায় এ রক্ষণা-বেক্ষন ও লালন পালনের বাদশাহী আমি পেয়েছিলাম, আজ আমার বাসনা হাশরের দিনে লজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া। যেভাবে এখানে আপনি আমার দামন ধরে রেখেছেন, কথা দিন সেখানেও এমনিভাবে ধরে রাখবেন। আমি তার কথায় রাজি হওয়ার পর সে আমাকে ছাড়লো এবং সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিলো। এরপর এরশাদ করলেন, একবার আমি সফরে বাদাউন ছিলাম, তখন এ সামসুদ্দিনও সেখানে এক ময়দানে পলো খেলার জন্য উপস্থিত ছিলো, এক বৃদ্ধ বয়সের লোক এসে তার নিকট কিছু প্রার্থনা করায় সে কোন উত্তর দিলো না। একটু পরে এক যুবক এসে কিছু প্রার্থনা করায় তাকে এক মুঠো টাকা দিলো। উপস্থিত লোকজন সুলতানের ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলো। সে তাদের মনের কৌতুহল দূর করার জন্য বললো, হে বন্ধুগণ প্রত্যেককে দেয়ার মালিক হলেন আল্লাহতায়ালা, আমি কেউ নই। তিনি যাকে দেওয়ান তাকেই দেই। এরপর শায়খ নিজামউদ্দিন জোগরা, শায়খুল ইসলাম দেহেলবী এবং শায়খ জালালউদ্দিন তিবরীজি (রহঃ)-এর একটা ঝগড়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন। শায়খুল ইসলাম দেহেলবী, শায়খ জালালউদ্দিন তিবরীজি (রহঃ)-এর প্রতি অপবাদ রটালো যে, সে কিশোরদের সঙ্গে সোহবত (সঙ্গ) করে। যখন এ ঝগড়া সুলতান শামসুদ্দিনের নিকট পেশ করা হলো তখন সে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলো। অভিযোগ-পত্র তৈয়ার করায় তাতে মোহর লাগানো হলো। বাদশাহ হুকুম দিলো, শায়খ জালালউদ্দিন তিবরীজিকে উপস্থিত করো। আমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শায়খ জালালউদ্দিন সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলেন, সুলতান তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলো তিনি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন এবং বললেন এ মামলায় একজন মুফেক নিযুক্ত করা উচিত। শায়খুল ইসলামকে এ প্রস্তাবের উপর তার মতামত জিজ্ঞেস করায় সেও সম্মতি দিলো যে, শায়খ জালালউদ্দিন যাকে মুফেক নির্দ্ধারণ করবে তার প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। শায়খ জালালউদ্দিন বললেন, আমি শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়াকে মফেক নির্দ্ধারন করলাম। কিন্তু বাহাউদ্দিন যাকারিয়া দিল্লী উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন মুলতানে অবস্থান করছিলেন। শায়খুল ইসলাম প্রতিবাদ করে বললো, সে কখন এখানে আসে তার কোন ঠিক নেই, তাই অন্য মুফেক ঠিক করা উচিত। শায়খ জালালউদ্দিন তিবরীজি (রহঃ) বললেন কাল তিনি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য তসরিফ আনবেন। সবাই শোনে অবাক হয়ে গেলো। সুতরাং

পরের দিন দিল্লীর সমস্ত লোক হৈচৈ করতে করতে দরবারে উপস্থিত হলো। বিচার শুরু হলো শায়খ জালালউদ্দিন তিবরীজিও হাজির ছিলেন। সে তাঁর পরিকার জুতোর উপর উপবিষ্ট হলেন। সবাই অনুরোধ করলো, আপনি উপরে নিজের যায়গায় বসুন। তিনি উত্তর দিলেন, এসময়ে আমার স্থান এখানেই। এরপর মোকাদ্দমা শুরু হলো, প্রত্যেকেই যার যার মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু একটু পরেই শোনা গেল খাঁজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী আসছেন। সবাই তাজ্জব হয়ে গেলো যে, তাঁকে কে খবর দিলো এবং কবে সে মূলতান থেকে রওয়ানা হয়ে আজ এখানে আসছে? সকলের সকল ভাবনা চিন্তা ছিন্ন করে হযরত খাঁজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া (রহঃ) দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। সমস্ত লোক এ বুজুর্গের সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি দরবারে প্রবেশ করেই প্রথমে হযরত শায়খ জালালউদ্দিন তিবরীজি (রহঃ)-এর জুতা মোবারক হাত নিলেন এবং চুমু খেলেন ও চোখে লাগালেন। প্রত্যেকের কাছে জালালউদ্দিনের বুজুর্গী প্রকাশ হয়ে গেলো। সবাই তাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হলো। প্রত্যেকের চোখের পর্দা উম্মোচিত হয়ে গেলো এবং যার যার অফরাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সুলতান শামসুদ্দিনও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চাইলো। হযরত শায়খ জালালউদ্দিন প্রত্যেককে ক্ষমা করে দিলেন। খাঁজা বাহাউদ্দিন দরবার কক্ষ ত্যাগ করে সকলের সাথেই বেরিয়ে গেলেন। রাতে যমুনা নদীর তীরে অবস্থান করলেন। সকালে যে যার গন্তব্যস্থলে চলে গেলো। খাঁজা কুতুব (রহঃ) তাঁর বক্তব্য এখানেই শেষ করলেন।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

খা'জা গরীব নওয়াজ বলেছেন—

- যে ব্যক্তি তরীকতের পথে চলতে চায়, তার উচিত প্রথম দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল বস্তুকে ত্যাগ করে, তারপর নিজের নফসকে তালাক দেয়, তারপর আহলে সলুকের পথে পা রাখে। তা না হলে সব কিছুই মিথ্যা।

- মানুষ যখন আমিত্বের খোলস ত্যাগ করে তখন নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করলে দেখবে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ সবই এক।

- আরিফের নিম্নতম স্তর হলো সৃষ্টি জগৎকে নিজের দু' আঙুলের ফাঁকের মাঝে অবলোকন করা।

- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমিক সে দুনিয়াদারীকে ঘৃণা করে। দুনিয়ার ঐশ্বর্য বন্ধুর প্রেম হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যার মাঝে অর্থের মোহ আছে সে আল্লাহর প্রেমিক নয়।

- মৃত্যু বন্ধুর সাথে মিলনসেতু।